গণিত রমণা

জয়দেব মুখোপাধ্যায়

নবপত্র প্রকাশন । কলিকাতা-৭০০০৭৩

লন্ডনের প্রবাসী বাঙালিদের নানান কাজকর্মের মধ্যেও একটি ডিউটি অবশ্যই করে যেতে হয়। দিনদিন তাদের অর্থ ও সমৃদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ডিউটিটাও উত্তর-উত্তর বেড়ে চলেছে।

দেশের মানুষ ভাবে, বিলেত মানেই লন্ডন; আর লন্ডন মানেই বিলেত। এটা যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের চেয়েও বড়—সেটা তারা বোঝালেও বোঝে না। শুধু তাই কি, এখানকার কাজ যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলে এবং আগে থেকে না জানালে যে চট করে ছুটি পাওয়া শক্ত—এটা তারা কল্পনাও করে না। ফলে, কেউ বিলেতে যাচ্ছে শুনলেই, '·· ওহ্ আপনি বিলেতে যাচ্ছেন! তা আর অসুবিধের কী আছে। আমার মাসতুতো ভাইয়ের মেয়ে সেখানে বহু বছর ধরে আছে। স্বামী-স্ত্রী আর দুই ছেলে মেয়ের সংসার। বিরাট অবস্থাপন্ন। বাড়ি-গাড়ি, ফ্রিজ-ফ্রীজার, ওয়াশিং-মেশিন, ড্রাইং-মেশিন, সেন্ট্রাল হিটিং-কার্পেট—সে এক এলাহী ব্যাপার মশাই···দিন কলমটা দিন, এখুনি ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি। একটা চিঠিও দিয়ে দেবখন। আপনার জন্য এ তো কিছুই নয়। তাছাড়া তাঁরা বাঙালি পেলে হাতে ভগবান পায়। আদরে আপ্যায়নে···ওই তো আমাদের অফিসের বড়বাবু অজিতেশ গেলেন; ফিরে এসে বললেন, এমন মানুষ বিরল।···কাজেই কোথায় কষ্ট করে আর বিদেশে থাকবেন। অনামিকা ও অপরেশের কাছে গেলে আপনি দারুন যত্ন পাবেন। দিন দেখি···কলমটা—লিখে দিই দু'লাইন···

প্রবাসী বাঙালিদের নানান কাজকর্মের মধ্যেও একটি ডিউটি অবশ্যই করে যেতে হয়। দিন দিন তাদের অর্থ ও সমৃদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ডিউটিটাও উত্তর উত্তর বেড়ে চলেছে। দেশের মানুষ ভাবে বিলেত মানেই লন্ডন, আর লন্ডন মানেই বিলেত। এটা যে ওয়েস্ট বেঙ্গলেব চেয়েও বড় সেটা তারা বোঝা-লেও বোঝে না। এখানকার কাজ যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলে এবং আগে থেকে না জানালে যে চট করে ছুটি পাওয়া শক্ত, এটা তারা কল্পনাও করে না। ফলে—না! "ওঃ আপনি বিলেতে যাচ্ছেন? তা আর অসুবিধের কী আছে? আমার মাসতুতো ভাইয়ের মেয়ের বর সেখানে বহু বছর ধরে আছে। বাড়ি গাড়ি, শুনেছি সে কি এলাহী ব্যাপার—তারা বিরাট ধনীলোক। বাড়িতে ফ্রিজ-ফ্রীজার, ওয়াশিং মেশিন, ড্রাই-মেশিন, সেন্ট্রাল হিটিং কার্পেট—তারা ইন্দ্র-পুরীতে আছে মশাই। দিন কলমটা দিন এক্ষুনি ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি। একটা চিঠিও দিয়ে দেবখন—আপনার জন্য এতো কিছুই নয়। তাছাড়া তারা বাঙালি পেলে একেবারে ভগবান পায়। আদরে আপ্যায়নে···এইতো আমাদের অফিসের বড়বাবু অজিতেশ গেলেন—ফিরে এসে বললেন, এমন মানুষ বিরল। কোথায় কষ্ট করে বিদেশ বিভুঁইএ থাকবেন! অপরেশ ও অনামিকার কাছে গেলে আপনি দারুণ আদর যত্ন পাবেন।

অতএব অনামিকা আর অপরেশ তার আত্মীয়ের চিঠি পেল, ওমুক দিন অতটায় তার বন্ধু ফ্যামিলি নিয়ে হিথ্রো বিমান বন্দরে নামছে। ওদের ব্যবস্থা করলে বড় খুশি হব।

অপরেশের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। সেদিন তার অসংখ্য আরজেন্ট সব কাজ। তার ওপর বন্ধুর ছেলের বার্থ-ডে পার্টি। বাড়িতে অলরেডি অন্য একদল বেড়াতে এসেছে, অন্য আত্মীয়ের তরফ থেকে। অনামিকা তো রেগে আগুন। মুখ বন্ধ করেও রাখতে পারল না, এটা কি ভারত সেবাশ্রম পেয়েছে নাকি সবাই? এখানে আর লোক এলে কাউন্সিল থেকে আমাদেরই

ইন্ডিয়া পাঠিয়ে দেবে। জানোই তো ওভার ক্রাউডিং এরা ভীষণ অপছন্দ করে। পাশের বাড়ির মিস্টার মিলার তো গতকালই কটাক্ষ করে বলেছেন, 'তোমাদের তো রিলেটিভের শেষ নেই দেখছি। আর দিন দিন এই আসা যাওয়াটা বেড়েই যাচ্ছে। আসলে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টকে পাউন্ড দিয়ে দিয়ে আমরাই এই সাঁকোটা গড়ে দিয়েছি। এখন আর টুরিস্টের শেষ নেই। রামা শ্যামা সব বিলেত দেখতে আসছে। যত ঝামেলা আমাদের।'

কথাগুলো একটুও মিথ্যে নয়। সেদিন তাদের বাড়িতে আমিও ছিলাম। নিতান্তই এক বন্ধুর বাবাকে হিথ্রো থেকে তুলে লিভারপুলে পৌঁছে দেবার জন্য। সেই উইকএন্ড-এ তার 'অনকল' ছিল। শত চেষ্টায়ও পাল্টাতে না পেরে আমার পা ধরেছে প্রায়। অগত্যা মধুসূদন। অপরেশকে ফোন করে গেলাম তার বাড়ি। গেলাম—তবে রাত কাটাতে হয়েছে বসার ঘরে। স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে। আর সেই রাত্রেই অপরেশ ও অনামিকার দুর্ভাগ্যের সব আলাপ আলোচনা শুনতে হয়েছে আমাকে। সত্যিই খুব দুঃখের। তখনই দু'দুটো ফ্যামিলি তাদের বাড়িতে মালপত্র রেখে কন্টিনেন্টে বেড়াতে গেছে। আবার কয়েকদিন পরে ফিরে এসে তাদের বাড়িতে থেকে লন্ডন শহর ঘুরে দেখবে। তারা কোন দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের জানাশুনা লোক। অবশ্যই ব্যবসায়ী।

এখন বুঝুন অবস্থা। এটা যে লন্ডনের প্রবাসী বাঙালিদেরই দুশ্চিন্তার কারণ তা নয়—আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন শহরেই এই স্বদেশীদের আত্মীয়তার নির্যাতন দিন দিন বাড়ছে। কেননা অনেকেই হোটেলে থাকাটা অর্থের অপচয় মনে করেন। আর সঙ্গীপ্রীতি তো আমাদের জন্মগত রোগ। কিন্তু ব্যস্ত জীবনে প্রায়ই এই অত্যাচার অনেকেরই সহ্য হয় না। এ একটা জুলুমই বলা চলে।

আমার অবশ্য অতটা ঝামেলা নেই। কেননা আমার স্ত্রী ইংরেজ বলে অনেকেই আমাকে এড়িয়ে চলে। দেশে আত্মীয় স্বজনরা ভয় পায়। ভাবে মেমসাহেব বউ। গেলে ঝাটাপেটা না করলেও কী যে অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়াবে আর দিনরাত ইংরেজীর কচকচানি শুনতে হবে তার ইয়ত্তা নেই। দু একজনকে যেচে আসতে লিখেও তারা ওই একই উত্তর দিয়েছে। বলেছে, 'তোর মেমসাহেব

বউ···না বাবা, আমি গেলেও আমার মামাতো ভাইয়ের শ্যালকের কাছেই লন্ডনে উঠব। হয়ত দেখা করতে একবার যাব তোর কাছে।' অথচ তারা জানে না আমার ওয়াইফ ইংরেজ রমণী হলেও মুড়িঘন্ট ও মাছের মাথা দিয়ে মুগডাল কী দারুণ রান্না করে। আর সর্ষে দিয়ে ইলিশ মাছ ভাতে করলে তো ঠিক মনে হবে পদ্মার ওপর জেলেদের নৌকোয় বসে দুলতে দুলতে খাচ্ছি। আর যাদের বাড়ি গিয়ে আমার আত্মীয়টি উঠবেন বলেছেন, তারা কৌটো, নয়তো সসেজ, নয়ত বা ফিস অ্যান্ড চিপস খেয়েই প্রায় কাটায়। আমরাও যে খাই না তা নয়। তবে বাঙালি কেউ এলে পুরো ভেতো বাঙালি হয়ে যাই। ওটাই তখন আমাদের স্পেশাল-ডে।

সে কথা থাক। লন্ডনে যারা আছেন, অর্থাৎ সেটেলড্ ফ্যামিলি, তাদের এই ডিউটিটা খুবই বেড়ে গেছে। হিথ্রো থেকে তোলা, বাড়িতে প্রচন্ডভাবে আদর আপ্যায়ন করা, বেড়িয়ে ঘুরিয়ে বিলেত দেখানো, শপিং করা, পাউন্ড ধার দেয়া (এই ধার অবশ্য তাবা কলকাতার আত্মীয়কে টাকায় দিয়ে দেবে) ইত্যাদি। অবশ্য তাতে তাদের অভিজ্ঞতাও হয় কম না। যেমন আমাকে মাত্র কয়েকটিবার হিথ্রো যাতায়াত করতে হয়েছে, অবশ্য নিজের প্রয়োজনেই বেশি। কেননা অন্যান্যদের বিচ্ছিন্ন কয়েকজনেব মধ্যে কোনো গল্প বা নাটক খুঁজে পাইনি। কিন্তু শ্যামলকে তুলে দেয়া থেকে সুলেখাকে তুলে দেয়া এই বছর দেড়েকের ঘটনাগুলো সময়ের চুম্বকে পর পর আকর্ষিত হয়ে যেন কেমন একটা মালা গাঁথা হয়ে গেল নিজে নিজেই। আমি কান দিয়ে শুনলাম, চোখ দিয়ে দেখলাম ও তারপর বিলেতের কি ঝকঝকে আকাশের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। ভাবলাম, দেখার চোখ থাকলেই দেখা যায় কত হাজার হাজার নাটক হয়ে যাচ্ছে এই পৃথিবীতে। সময়ের স্রোতে ভেসে চলেছে সে নাটকের ঘটনা প্রবাহ। যেন হাজার হাজার মাছ নদীতে ভেসে চলেছে নিজের নিজের সংসারের ইতিহাস লিখে। জেলে তারই দু-একটি নমুনা তুলে মনের আনন্দে বাজারে নিয়ে যায়। বা বড়শি ফেলে মাছ ধরে আনন্দ পায় কেউ কেউ। আমারও ইচ্ছে হলো এমনি কয়েকটি মানুষ, যাদের হিথ্রো এয়ার পোর্ট থেকে নিয়ে এসেছি বা পৌঁছে দিয়ে এসেছি, তাদের কথাও আমি লিখব।

ঘটনাগুলো কলকাতায় ঘটেছে। এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে। তাই একই সঙ্গে তা জড়ো করা সম্ভব নয়। একটি সরল রেখা দিয়ে বিশ্বব্রহ্মান্ড আঁকা যেমন অসম্ভব তেমনই একটি ঘটনা দিয়ে কয়েকটি জীবন প্রকাশ করাও বাতুলতা মাত্র।

যাই হোক হিথ্রো এয়ার পোর্টে আমার ক্লাসমেট ও অত্যন্ত বন্ধু শ্যামলকে তুলে দিয়ে তিন নম্বর টার্মিনালের কারপার্কের পাঁচতলায় আমি অনেকক্ষণ কেঁদেছিলাম। শ্যামল কলকাতায় পাঁচ-ছ বছর পর ফিরে গেল। অথচ আমি ইংলন্ডে রয়ে গেলাম। আমার পকেটেই যা টাকা ছিল তা দিয়ে দু'তিনবার না হলেও একবার কলকাতায় হলিডে কাটিয়ে আসা যায়। কিন্তু সে যাওয়া তো আর যাওয়া নয়! কয়েদী হয়েও ছুটি পাওয়া যায়, আবার ফিরে আসতেও হয় কয়েদে। সে মুক্তি তো আর মুক্তির স্বাদ দেয় না। আমি যে ইংলণ্ডের পিঞ্জরে আবদ্ধ ডানাকাটা ভারতীয় ময়না। তেমনটিই মনে হয়েছিল। সেসব পরে বলছি। আপাতত আমার মনটা বরং শ্যামলের সঙ্গেই কলকাতার আকাশে কিছুদিন ঘুরে বেড়াক। অবশ্য সে সব ঘটনা সবই শোনা ও তার সঙ্গে কিছু আমার কল্পনার আঁচর।

শহর কলকাতা।

প্রতিষ্ঠিত গর্বিত প্রফেশন্যালদের পাড়া।

সেদিন পার্টির উদোক্তা ছিলেন ডাঃ অজয় সরকার। বিলেত থেকে বছর তিনেক আগে ফিরেছেন তিনি। মেম্বারশিপটা ঝটপটই করেছেন। আর যারা ঝটপট করেন তারা অন্য কলিগদের বড্ড বিপদে ফেলেন। কারণ অনেকেরই মেম্বারশিপ ফেলোশিপ করতে জান কয়লা হয়ে যায়। কেউ ডিসক্রিমিনেশন, কেউ কালার, কেউ বা ভাগ্যের দোষ দিয়ে মাদার ইণ্ডিয়াকে ছোট করে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। আসলে সব পরীক্ষাই ভাগ্য। দেশে হলে হয়ত একজামিনারকে ধরে করে পাশের চান্সটা বাড়িয়ে নেয়া যায়; কিন্তু রয়াল কলেজে মামাও নেই শ্বশুরও নেই। তাই তারা বাজিয়ে নেয়।

তবে এই যাওয়া-আসা করতে করতে বেশির ভাগকেই আর রিটার্ন টিকিট কাটতে হবে না বলে সার্টিফিকেট দিয়ে দেয় রয়াল কলেজ। অবশ্য সার্টিফিকেটের সঙ্গে সঙ্গে একটা অমসৃণ বাঁশও অদৃশ্যভাবে আসে—তাহলে এবার তো ফিরতে হবে, ব্যাক টু ইণ্ডিয়া বাঁশ মানে মেম্বারশিপ বা ফেলোশিপের বাঁশের চেয়েও নোড্ ইণ্টার নোডে ভরা। আসার মধু আর তার গায়ে লেপটে নেই। আছে ফিরে যাবার দুশ্চিন্তার আলকাত্রা। দেশে যার মামা বা শ্বশুর উচ্চস্তরে আছেন, তিনি হয়ত অতটা দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়বেন না। কেউ কেউ হয়তো চাকরি রেখেই এসেছিলেন, শুধু তদ্বির করে একস্টেনশনটা করে যাচ্ছেন, তারাও জলে পড়লেও একেবারে মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের দিঘিতে আছাড় খেয়ে পড়বেন না—কিন্তু এর কোনোটাই যাদের নেই তাদের টিমটিমে কেরোসিনের লম্ফর মতো প্রদীপ ছাড়া দশদিকই অন্ধকার। সে মিনমিনে শিখাটি ভারত সরকারের বিদেশ প্রত্যাগত রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন স্কিম—ভদ্র কথায় সাইণ্টিফিক পুল। তাতে একটি হাসপাতালে অ্যাটাচমেণ্টের ব্যবস্থা করে কিছু টাকা বেকার ভাতার মতো দেওয়া হয়। তাতে প্রাকটিস অ্যালাউ নয়—অতএব কেরোসিন ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যে অন্য মোমবাতি জ্বালাবে তা হবে না। যদিও সবাই তাই করেন। একবছর বা বাড়িয়ে দু'বছর পুল অফিসার থাকার মধ্যে রুটির ব্যবস্থা করো। বিলেত আমেরিকায় মাসে বিশহাজার কি চল্লিশ হাজার আয় হয়েছে, সো হোয়াট। এটা ইণ্ডিয়া—এখানে সহজ সরল পথে আয়টা গাড়ির পেট্রল কেনার জন্য, বাকিটা ধান্দাবাজি বা প্রাকটিস।

হুইস্কির প্রথম রাউণ্ড পরিবেশনের পর হাতের ঘড়ির দিকে তাকালেন ডাঃ সরকার। এক সিপ মুখে নিয়ে উঁচু গলায় বলে উঠলেন, কোয়াএট প্লিজ। চশমার মধ্য দিয়ে চারদিকে স্মিতহাস্যে তাকিয়ে সিগারেটে একটা টান দিলেন। সবাইকে তার দিকে তাকাবার চান্স ও টাইম দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, বললেন গুড ইভ্নিং মাই ফ্রেণ্ডস্ অ্যাণ্ড মাই গার্লফ্রেণ্ডস্।—চারদিকে তাকিয়ে আবার নিজের কথায় হাসলেন একটু। তারই মধ্যে কল্যাণ ব্যানার্জী বলে উঠলেন, থামলি কেন, বল না শালা—তুই ভাবছিস শিকাগোতে

ধরম শোনাচ্ছিস যে গার্লফ্রেন্ড বলতেই তিনমিনিট করতালি শুনবি ?

একটা সুশ্রাব্য গালাগাল দিয়ে অজয় আবার শুরু করলেন।

—আজ আমাদের খুব আনন্দের দিন। কেননা আর একটা স্যামন জন্মস্থানে ফিরে এসেছে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে স্যামন মাছ যেখানে জন্মায় হাজার হাজার মাইল সমুদ্র পরিক্রমা করে ডিম পাড়ার সময় আবার অনেক দুর্গম জলপথ ধরে সেখানেই ফিরে আসে। তাদের ফার্টিলাইজেশন হয়—তারা মরে যায়। এরকম বহু প্রাণীর লাইফ-সাইকেলে 'যথা হইতে আসিয়াছি আবার তথায়ই ফিরিয়া যাই' কথাটি সত্যি। মানুষেরও যারা স্বদেশে না ফিরে আসতে পারে তাদের আত্মগ্লানি থাকবেই। সে স্বীকার করুক আর নাই করুক। অর্থের ও স্বার্থের জন্য যারা বিদেশে পড়ে থাকবে তারা একদিন পস্তাবেই। আজ আমাদের বন্ধু শ্যামল আমাদের মধ্যে আবার ফিরে এসেছে। ওর আর কখনই মনে হবে না আমি বিদেশী—আমার কালো চামড়া-আমি নীচু। আর যতই গালাগাল খাক, মার খাক-কালারড বা ব্লাকি শুনতে হবে না—'পাকীবাসী' শুনতে হবে না। এখন তার আকাশ সুনীল অন্তহীন অসীম। এখানে ডিসক্রিমিনেশন থাকলেও সেটা রাজাপ্রজা বা সাদাকালোর নয়। নিজেকে ছোট ভাবতে হবে না। তবে হ্যাঁ, প্রবলেম অনেক আছে এই শহর কলকাতায়—কিন্তু তা নিতান্তই নিজের। এখানে এসে তোমরা অনেকেই জানো আমাকেও প্রায় ফিরে যাবার ডিসিসন নিতে হয়েছিল। ঝড় যাবেই শুরুতে। আমি বলব ধৈর্য ও শক্তি থাকলে এই কলকাতার রাবিশে ব্লাক ডায়মন্ড আছে, পরশ পাথর আছে। লাক, ইনটেলিজেন্স ও অনেস্টি এসবই দরকার। এটা সত্যি, বিলেতে সহজে টাকা আয় হয়, বিলেতে সিকিউরিটি আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা নির্ঝঞ্ঝাট—সেখানে মিশলে বন্ধু পাবে, না মিশলে শত্রু পাবে না। কিন্তু এখানে শত্রু-মিত্র দুইই আছে। ও চারদিকে চিটেগুড়ের মত লেগে থাকবে। ইচ্ছে থাকলেও তা ছাড়াতে পারবে না। তবে মানুষের জীবনে যদি মন্দ দিকগুলো না থাকে তবেও তো জীবন গতিহীন ও শ্লথ হয়ে পড়ে। বিদেশে সর্বক্ষণই মনে হবে মিলিটারী ক্যাম্পে আছি—একদিন না একদিন ঘরে ফিরে নিজের তক্তপোষে শান্তি নিদ্রা দেব। সে যাক ভালমন্দ বিদেশে

থাকার সবই আছে তাই নিয়ে ডিবেট না করাই ভাল। আমরা শ্যামলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মধ্যে এবং আমরা সবাই তাকে সেটেল করতে সাহায্য করব। সবচেয়ে বড় কথা সে এখনও ব্যাচেলর। আমরা পাত্র-পাত্রী কলমে বিজ্ঞাপন দেব 'দীর্ঘাঙ্গী, সুদীর্ঘনয়না, স্বর্ণবরণা, কামবাণে বিভূষিতা এক অপরূপা চাই'। হাসিতে আছড়ে পড়ে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ অল অ্যাণ্ড এনজয় ইওর পার্টি। শ্যামলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওয়েলকাম হোম। শ্যামল কিছু বলবে নাকি? শ্যামলের দিকে হাত ইসারা করে প্রশ্ন করলেন ডাঃ সরকার।

ডাঃ শ্যামল কান্তি সেন হাতে হুইস্কির গ্লাসটা তুলে একটা সিপ নিয়ে উঠে দাঁড়াল। চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল একবার। বেশির ভাগই চেনা মুখ ও জোড়ায় জোড়ায়। সকলেই সুসজ্জিত।

শ্যামল বলতে শুরু করল। ইতিমধ্যে অনেকেই আবার গলাটা ভিজিয়ে নিয়েছেন। কেউ কেউ পটেটো চিপ্‌স্ বা বাদাম চিবোতে শুরু করল। চোখগুলো শ্যামলের দিকেই। যেন সে সবে সাঁতার শিখতে এসে জলের কিনারায় দাঁড়িয়েছে। আর সবাই দক্ষ সাঁতারুর মতো ঠাট্টার দৃষ্টি মেলে মজা দেখছে তার দিকে তাকিয়ে।

—বন্ধুগণ ও বন্ধুস্ত্রীগণ—ও সরি, সবার আগে অজয় ও অজন্তা-তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই পার্টির আয়োজনের জন্য। যেখানে যেভাবেই থাকি বা থাকব তোমাদের সঙ্গে আমার এ মধুর সম্পর্ক চিরদিনই থাকবে। একসঙ্গে যারা পড়ে তারা জানে, এ বন্ধুত্ব আত্মীয়তার চেয়েও অনেক বড়। আমি ফিরে এসেছি বলেই মহান কিছু করেছি বা আবার বিদেশে যাব না তা বলব না। পৃথিবীটা খুব ছোট হয়ে গেছে। এখন বারো ঘণ্টায় কলকাতা থেকে লণ্ডন। এক সময় আমার গ্রাম থেকে কলেজে পৌঁছাতে বা এখনও হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাতে এখান থেকে প্রায় ওরকমই সময় লাগে। আর রোজগার যাদের ভাল বা বিদেশে কাজ করে তাদের একমাসের আয়ে সারাটা পৃথিবীই আজকাল ঘুরে বেড়ানো যায়। অতএব দূরত্ব ও অর্থ দুটোই সংকোচিত হয়েছে প্রচণ্ড। এবার কালচার—সত্যি বলতে কি—ইংরেজ ও ইংরেজীর ওপর

শ্রদ্ধায় ইণ্ডিয়া যত টগবগ করছে বরং বিদেশে সেটা কম। শুধু তাই নয়, কয়েক-বছর পর রবীন্দ্রসংগীত ও ভারতীয় নাচে গানেও মনে হয়, বিদেশী বাঙালি আমাদের দেশের বাঙালিকে পিছিয়ে ফেলবে। তাছাড়া নতুন কোন দেশে সেটেল করতে একটা জেনারেশনে সম্ভব নয়। একদিন আমরাও কান্বকুব্জ, তারও আগে আরও উত্তর থেকে এসেছি। এরকম মাইগ্রেশন আদি যুগ থেকে ছিল আছে ও থাকবে। অতএব যেখানে সুযোগ সুবিধা যে বেশি পাবে সে তার মায়া কাটিয়ে শুধু সেণ্টিমেন্টাল রিজেনে ভারতে ফিরে আসবে এটা যুক্তিপূর্ণ নয়। মায়ের কোলে বসেই বরং নিজের ও মায়ের ক্ষতি করছে অনেকেই। আমরা বিদেশে থাকাকালীন ইন্ডিয়াকে যত ভালবাসি—ততটা দেশের মানুষ করলে ইণ্ডিয়া আরও অনেক এগিয়ে যেত। দূরে থেকে সাহায্য করলে সেটা পুরোটাই সাহায্য করা।

আবার হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে শ্যামল বলল, 'অতএব যে যেখানে খুশি সেখানে থাকাই ভালো। ভালোমন্দ দুদেশেই আছে ও থাকবে। তবে আমরা গরিব বলে পাঁজরার দাগ দেখা যায়—যারা বড়লোক তাদের ঢাকার সুযোগ থাকে। নয়ত চুরি, ডাকাতি, খুন, রেপ, ড্রাগ প্রবলেম ইত্যাদি কোনটাই পশ্চিমদেশে কম নেই। ঘুস, স্বজন-পোষণ, চিটিং, শপলিফটিং সবই বাড়ছে ছাড়া কমছে না। আবার ডিসক্রিমিনেশন থাকলেও আমাদের দেশের চেয়ে অনেক কম। এখানে আসামে, বিহারে, উড়িষ্যায় এবং সুযোগ পেলে সর্বভারতেই ডিস্ক্রিমিনেশন। সেটা বোঝা যায় না, যেহেতু তাকে আমরা সহজে মেনে নিয়েছি। তাই সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই বা বারুজীবী পাত্রী চাই বললে তা বেমালুম হজম করে নি। আমাদের নিজেদের মধ্যেই এত ডিসক্রিমিনেশন যে এক কলেজের ছেলে অন্য কলেজে পরীক্ষা হলে 'সব ফেল' —আর নিজের কলেজে হলে 'সব পাশ'। যাক সে সব পুরোন কাসুন্দি না ঘাঁটাই ভাল। তবে আমার অনুরোধ আমরা যেন এসব দোষ থেকে মুক্ত থাকতে পারি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ফাইট করতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, বেদনা—এক কথায় বিদ্রোহ আছে। শুধু নিজেরটা হাসিল করার জন্য যেন এই দুর্বলতাকে সুযোগ না দিই। থ্যাঙ্ক ইউ অ্যাগেইন'

বলে বসল শ্যামল।

পাখার নিচেও সে বেশ ঘেমে গেছে। সবাই হাতে হাত ঠুকে বাহবা দিল তাকে।

অজয় পাশে এসে-বসলেন।

যাদের আসার কথা এখনও সবাই আসেনি। সব শালা পয়সার ধান্ধা। শনিবারেও চেম্বার করে—পেসেণ্ট না এলে বসে মশামাছি মারে। আমি ঠিক করেছি ও বিলেতের মতো স্যাটারডে সানডে নো চেম্বার। কল হলে যাব নয়ত নয়। এরা বোঝে না নিজের দাম নিজে না দিলে কেউ দেবে না। শ্যামল সায় দিয়ে বললেন,"তা ঠিক। তবে মুস্কিল নতুন শুরু করলে একটু বেশি সময় তো চেম্বারে থাকতেই হয়। তুই নাকি—একবার অ্যাটাচ্‌মেণ্ট পেয়ে গেছিস, আর কি হু-হু করে প্রাকটিস জমে গেছে।" "আরে লাক্‌টা কি এমনি গাছ থেকে পড়েছে নাকি? এসে, প্রথমেই ভাল চেম্বার নিয়েছি। গাড়ি কিনেছি। ড্রাইভার রেখেছি। প্রথমে খরচ করে টোপ ফেলতে হয়। তুই যদি মিনি বাসে রুগী দেখতে যাস—আর পরের দিন তোকে ডাকবে নাকি? এটা ক্যালকাটা সিটি। প্রথম থেকে ঠমক দেখিয়ে টনক নড়াতে নয়। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ছাড়তে হয়। প্রথম থেকে মুরগী কেটে খেলে আর সোনার আণ্ডা জুটবে না। পেসেন্স থাকলে পেসেণ্ট পাবে। বড়লোক হলে দামী ওষুধ আর নাম না জানা ব্রাণ্ড লিখবে, বিলেতি কোম্পানির। কখনও বন্ধু লাগিয়ে জানতে হবে কোন বিলেতি ড্রাগটা আউট অফ্‌ মার্কেট অথবা এখনও ইম্পোরটেড হয়নি সেটা। লিখে ঘোরাবে। আমাদের দেশে একবারে যদি ভাল হয় তো গেলে, সে আর আসবে না। আমরা কৃচ্ছ্রসাধনে বিশ্বাসী। একটু থামলেন অজয়। হুইস্কিতে চুমুক দিচ্ছেন।

শ্যামল বললেন, তাই তো আমাদের ধর্মস্থান সব পাহাড় পর্বতের ওপর। বিলেতে পাড়ায় পাড়ায় চার্চ যাতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সহজে যেতে পারে আর আমাদের সবই বাবা হিমালয়ের কোলে।

এবার কথার সূত্র ধরল পাশে বসা প্রসাদ ওণ্ডিমেতা। সে সব শুনছিল এতক্ষণ আর মিটিমিটি হাসছিল। বলল, তুই কি বোঝাচ্ছিস এ ঘুঘুকে—এ

শালা দেখবি একবছরে তোকে ধরবে আর দুবছরে তোকে টপকে আমায় ধরবে।

তুই থাম বলে একটা চাল্ খিস্তি দিয়ে অজয় বলল, আমার সমান হতে হলে আবার তোকে বাংলায় জন্মাতে হবে। তুই শালা মহীশূরের চন্দন আর সুপারীর পয়সায় বড়লোক। জিপি করে পাঁচ টাকা করে গুনতে হলে আর গাড়ি চড়তে পারতি না।

—কথাটা হাফ্ ট্রু অজয়। গাড়িটা আমি আমার ইনকামেই চালাই। তবে হ্যাঁ বাড়িটা মাইসোরের পয়সায় বাপ করে গেছে। তবে তার আবার ড্র ব্যাকও আছে। তোরা বিলেত ফেরৎ। আর মায়ের জন্য আমি কূপ-মন্ডুক হয়েই রইলাম।

বলতে বলতে গলাটা একটু বুজে এল প্রসাদের। আবলুশ কালো ভুঁড়িটা ওর ঝুলে পড়েছে। জন্মাবার কিছুদিন পরেই কলকাতায়। প্রথম প্রথম ইংরেজীতেই কথা বলত। পরে যখন বুঝল এদলে না মিশলে চলবে না তখন ভাঙাভাঙা বাংলা থেকে এখন কে বলবে সে মহীশূর থেকে এসেছিল একদিন বাবার লোটা কম্বলের সঙ্গে। আর সত্যিই স্যাণ্ডালউড ধূপ আর সুপারীর ব্যবসা করে বড়লোক বনে গেছে। প্রসাদ প্রায়ই আফশোস করে বলত, এই ডাক্তারী পড়তে যত বছর যত পরিশ্রম করলাম, ড্যাডির ব্যবসা দেখলে সে বছরগুলোর মধ্যেই বাড়ি গাড়ি হয়ে যেত। দু'এক বার অ্যানাটমিতে ফেল করে সে পড়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল, কিন্তু বাবার অদম্য উৎসাহে আবার ফিরে এসেছে।

অজয়ের স্ত্রী ডালিয়া এতক্ষণ একমনে শুনছিল। এবার ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সোফার পেছন থেকেই শ্যামলের কাঁধে টোকা মেরে জিজ্ঞেস করল, কি দেব তোমাকে? আজ তুমিই তো ভি আই পি। চিফ্ গেস্ট বলে কথা।

—থাম সুন্দরী। তোমাকে আর ছুটতে হবে না, এস পাশে বোস—দেখি তোমায় ক্ষণকাল। সত্যি তুমি বিলেতের শীতে যা চুপসে ছিলে। রূপই বোঝা যেত না। কলকাতার গরমে ডালিয়ার মতোই গাছ আলো করে ফুটে আছো। দেখতে যা হয়েছো না?

মাথায় চাঁটি খেয়ে আরক্ত মুখে ডালিয়া বলে উঠল, যাঃ—ফাজলামো

আর গেল না। বয়েস যত বাড়ছে নিজের রূপখানাও তো ফুটছে দেখছি। বল কি দেব ?

জানো না ব্যাচেলারের কি প্রয়োজন ? ঠাট্টা করে বলল শ্যামল।

—তা বল্‌না মুখ ফুটে একবার। বাংলাদেশে মেয়ের অভাব। সারা পৃথিবীতেই চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু বাংলার মেয়ের মূল্য যা ছিল তাই আছে। শরৎবাবুর সময়ও যা, আজও তাই। সেখানে তুমি তো রাজপুত্তুর। একবার শুধু হুঁ কর না—দু'শ অ্যাপ্লিকেশন পড়ে যাবে।

কথাগুলো বলতে নিজেকে একটুও ছোট মনে হলো না ডালিয়ার। বরং মেয়ের দাম যে কম সেটাই তাকে আনন্দ দিচ্ছে, বিষণ্ণ হওয়ার চেয়েও।

প্রসাদ পাশে বসেই শুনছিল। ব্যাটা শুনে শুনে বাংলায় উত্তর ঠিক করে যেন ধানী পট্‌কা ছাড়ে। বলে বসল, হ্যাঁ. ভালো মাল সব আগেই উঠে গেছে বাবু। শুধু ঝড়তি পড়তি পড়ে আছে। বহুলোক ঘাঁটাঘাঁটি করেছে তো তাই ফ্রেসনেসটা কমে গেছে। কি আর করি বসে বসে কানকোয় অন্য মাছের রক্ত মাখাচ্ছি। লাও বাবু লিয়ে যাও—ওজন আর কোরব নি! যে দামে চাও তাতেই দিয়ে দেব। কাজেই তুই সেই ঝড়তি পড়তি ছাড়া এ বয়সে কিছু পাবি না।

উচ্ছ্বসিত হাসিতে গমগম করে উঠল ডালিয়ার সুসজ্জিত বসার হল ঘরটা।

ডালিয়াও হাসিতে ঢলে পড়েছে। হাসতে হাসতে উছলে পড়ে অন্য রমণীদের উদ্দেশে বলল, শোনো শোনো প্রসাদ বলছে আমরা নাকি ঝড়তি পড়তি মাল।

প্রসাদও উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিবাদ করে বলল, মাইরি বলছি, আমি সে কথা বলিনি। বলেছি, এই বয়সেও যারা ব্যাচেলার তারা তাদের মতোই অনেক হাত ঘোরা নয়ত কাটপিস ছাড়া কিছু পাবে না। সময় কালে বাজার না করলে মহাষ্টমীর দিন কি আর দোকানে ভাল শাড়ি পড়ে থাকে ? বলে রসিক বিজ্ঞের ভাবে বসে পড়ল প্রসাদ।

ডাক্তারদের যেমন বদনাম, তারা ডাক্তারীপৃথিবী ছাড়া অন্য পৃথিবীর

খবর রাখে না ; তা নিয়ে আলোচনাও করে না, তেমনি তারই একটা বিলেত ফেরৎ দল সুযোগ পেলেই বিলেতি বাইলেনে আলোচনা চালিয়ে তৃপ্তি পায়।

ডালিয়া বলল, ভাগ্যিস সময় মতো জাল ফেলেছিলাম, নয়ত আমরাও দয়াদাক্ষিণ্যের শিকার হয়ে পড়তাম।

একটু থেমে আবার বিষণ্ণভাবে বলল, আশ্চর্য তাও বাবা-মাকে সুখী করতে পারলাম কই। অজয়ের বাড়ির লোক দুবেলা অভিসম্পাত দিয়ে যাচ্ছে। এদেশ পাল্টাবে—তা হলেই হয়েছে।

বলতে বলতে ডালিয়া প্রসঙ্গ পাল্টালো।

তোমার মনে আছে শ্যামলদা, সেই ধনেপাতা আনতে আমরা একশ মাইল ড্রাইভ করে ব্রাড-ফোর্ড যেতাম ? ওঃ কত কষ্ট করে পাবদা মাছ বেগুন আর ধনেপাতা জোগাড় হত। অবশ্য এখন বিলাতের সাহেব দোকানেও ধনেপাতা কাঁচালঙ্কা আদা রসুন পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথম প্রথম আমাদের খুব অসুবিধা হত।

—হ্যাঁ, মুরগী খেয়ে খেয়ে তো চিকেনে ঘেন্না ধরে গেল। পরে অবশ্য রান্নাগুলোও শিখলাম। চিলি চিকেন, তন্দুরী চিকেন সেগুলো খেতে খারাপ নয়—বললেন অজন্তা ব্যানার্জী।

সেও তখন যোগ দিয়েছে ওখানে। তার স্বামী কল্যাণ তখন বোতল থেকে ভদকা ঢালতে ব্যস্ত। শ্যামল সেন শ্রোতা হয়েই বসেছিল। এবার বলে উঠল, সেদিন আর নেই ডালিয়া মেমসাব। এখন জ্যাকফ্রুটও বিক্রি হচ্ছে। অবরজিন তো সব দোকানে পাওয়া যায়। আর সে বেগুনগুলো সুন্দরী যুবতীর মতো মোলায়েম ও চকচকে।

ও বাব্বা, তাহলে সুন্দরের ওপর ঝোঁক আছে খুব। তা বাছা সাদামেয়েরা তো তোমায় মোহন করত। একটি ননীর পুতুল তুললেই তো পারতে !

ঠাট্টা করে বলল ডালিয়া।

মোমের পুতুল নিয়ে বিলেতে খেলা করা যায়, কলকাতার গরমে ওরা গলে যাবে। সারাজীবন তার দাসত্ব করার ইচ্ছা আমার নেই। তারপর ওর সামনে মাছের মাথা চিবিয়ে খাওয়া, হুস হুস শব্দ করে চা খাওয়া, প্রচন্ড শব্দ করে

হাঁচি দেয়া—এ সম্ভব নয়।

বলল শ্যামল সেন।

অজন্তা জানায়, ওগুলো কোনো প্রব্লেমই নয়। আমার মনে হয় ছেলে-মেয়ে হলে তারা বড় হয়ে গালাগাল দেবে নয়ত তাদের জীবনযাত্রা দেখে নিজের কষ্ট হবে। হয়ত সেটাই প্রব্লেম।

অজন্তা সত্যিই অজন্তা। রঙটা ময়লা হলেও লাবণ্যে যেন ফেটে পড়ছে। সারা দেহে একটা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছাপ। এ রূপে গাম্ভীর্য থাকলেও গর্ব কোথাও নেই। তুলনায় কল্যাণী ব্যানার্জী একটু অন্যরকম। শ্যামল গভীর দৃষ্টিতে ক্লাসমেট কল্যাণীকে দেখছিল। ঠোঁট দুটো ভারী ও বেশ ঘন। বাদামী রঙ হলেও যেন দুটুকরো চুম্বক। লম্বাটে মুখে টানা টানা দুটো নেশা ভরা চোখ। এককথায় বেশ আকর্ষণীয়া।

মনে মনে ভাবল শ্যামল, বন্ধুগুলো বেশ বউগুলো বাগিয়ে নিয়েছে। সময় থাকতে বিয়ে না করায় হয়ত ভুলই করেছে। ব্যাচেলার আরও একজন ছিল। তিনিও এতক্ষণ অজয়, শংকর, মিলন ও মৃন্ময়ের সঙ্গে প্র্যাকটিস, হাসপাতাল ও পেসেন্ট নিয়ে ডিসকাশনে হাঁপিয়ে উঠে এখন এসে শ্যামলের কাছে দাঁড়ালেন।

কি ব্যাপার! এ যে দেখছি জামাইকে নিয়ে সখীরা সব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমি কি কেউ নই? আমিও তো ওয়ান অফ দা ক্যানডিডেট ফর দা ব্রাইড—বলে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল দীপক দাস।

হ্যাঁ হ্যাঁ জানা আছে। চরিত্রহীনের দলে নাম লিখিয়ে সতী সেজে এসেছেন। কেন বাবা ঝুলিয়ে রাখা! সাত পাকে না ঘোরো, রেজিস্ট্রিটা তো করতে পারো! তা না, ফুর্তি করব বিয়ে করব না। শাসনের সুরে ঝাঁঝিয়ে উঠল ডালিয়া। তার পেটে স্কটল্যান্ডের হোলিওয়াটার পড়েছে কম নয় তাই হগমেনির রাতের মতো 'এসো আমায় লুট কর'-ভাবে খোলামেলা হয়ে পড়েছে।

বেশ চলছিল। হঠাৎই এমন সময় অজয় সরকারের ফোন এল।

এই যে অজয়—টেলিফোন। চেঁচিয়ে বলল ডালিয়া। অভিযোগের

সুর গলায়, আবার গর্বেরও। সেই মিশ্রিত ভাবাবেগেই একটা গালাগালি দিয়ে ফোনটা ধরলেন ডাঃ সরকার। চেঁচিয়ে যা বলল তাতে সবাই বুঝল এখুনি তাকে উডল্যান্ডে যেতে হবে বৌবি রিসার্সসেট করতে। ডাঃ ব্যানার্জী নিজে রিকোয়েস্ট করছেন। ইমপরট্যান্ট বৌবি, সেকসন করে ডেলিভারী করেছেন কলকাতার নামকরা গায়নাকোলজিস্ট। মিস্টার ঝুনঝুনওয়ালার প্রথম নাতি। অজয় টাইটা বাঁধতে বাঁধতে বলল, স্যরি—তোমরা ফুর্তি করো আমি এখুনি আসছি। কাল সকালে ওর সেকসন হবার কথা ছিল—আমার ঠিক দশটায় ওখানে যাবার কথা কিন্তু এমন মেয়েছেলে রাতটাও সবুর সইল না।

—যা শালা! দুশো তো হয়ে গেল—ঠাট্টা করে মৃন্ময় বলে উঠল।

গর্বের হাসি টেনে অজয় বলল, উডল্যান্ড বলে কথা! তোরা তো ওর ধার কাছ দিয়েও যেতে পারলি না।

কথাটা বেশ গায়ে লাগল মৃন্ময় চ্যাটার্জীর। সে ফোঁস করে উঠল, তুই তো পরের গোলাম হয়ে যাচ্ছিস। আমি যেদিন যাব, সেদিন রাজার মতো যাব, মন্ত্রী বা গোলাম হয়ে নয়।

অজয় হেসে বলল, টিম ওয়ার্ক বুঝলি—টিম ওয়ার্ক! এখন কি সে যুগ আছে!

মুখে গর্বিত হাসি ও সাফল্যের ইংগিত জানিয়ে অজয় বেরিয়ে গেলেন। ততক্ষণে বাড়ির ঝি ড্রাইভারকে ডেকে দিয়েছে। সেই এসে অ্যাটাচি কেসটা নিচে নিয়ে গেল।

একটু শান্ত থেকে পার্টি আবার গরম হয়ে উঠল।

ডালিয়া বলল, এবার তাহলে একটু গান বাজনা হোক।

লাফিয়ে উঠে প্রতাপ জানাল, হ্যাঁ ঠিক বলেছো। রবীন্দ্র সংগীত—বেশ ভালো দেখে একখানা রবীন্দ্র সংগীত ধর তো!

—না-না—কীর্তন হোক, কীর্তন। কই হারমোনিয়ামটা নিয়ে এসো তো! সঙ্গে তবলাও এনো—বলল প্রসাদ।

প্রসাদ গিন্নি প্রসাদের আশেপাশে কোথাও ছিল। কথাটা কানে যেতেই কাছে এল।

—তুমি কীর্তন শুনবে।

মুখে হাত চাপা দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল প্রসাদ-গিন্নী।

ডালিয়া বলল, দাঁড়াও তো অত হেসো না। ঠিক আছে না হয় কীর্তনই হবে। কিন্তু কে গাইবে, কে?

—কে আবার তুমি?

আমি! না-না আমার ওসব কীর্তন-টির্তন আসে না। রবীন্দ্র-সংগীত বল গাইছি।

সুললিত কন্ঠে কথাগুলো আলতো করে ছুঁড়ে দিল ডালিয়া।

ডালিয়ার পাশেই ছিল ডাঃ মিলন রায়ের স্ত্রী স্বপ্না। হঠাৎই লাফিয়ে উঠে সে জানাল, কেন শ্যামল দা-ই তো আছে! শ্যামলদাকে বল না কিছু গাইতে। ও শ্যামলদা শুরু কর না বাবা—

কথায় কথায় বেশ জমে উঠেছিল, এমন সময় একটু ছন্দপতন ঘটল। হঠাৎই দরজা ঠেলে যেন এক উর্বশী ঢুকল পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে।

—বাব্বা মহুয়ার এই সময় হলো! রাত দশটা বাজতে চলল—পার্টি তো প্রায় শেষ। অনুযোগ করে বলে উঠল ডালিয়া।

সবাই সেইদিকে তাকাল।

মহুয়া বলে উঠল, কেন তোমরা কি বালিকা নাকি যে দশটায় পার্টি শেষ। এই নাকি বিলেত ফেরৎ ডাক্তারের মেমসাব। পার্টি তো শুরুই হয় রাত বারটার পর। না বাবা এ নাবালক পার্টির মধ্যে আমি নেই।

বলতে বলতে একগুচ্ছ ফুল ও একটা বোতল হাতে ধরিয়ে দিল ডালিয়ার। ইতস্তত করে ডালিয়া বলল, এটা কি বটল পার্টি নাকি? যার জন্য পার্টি তাকেই বরং ওই দিয়ে আবাহন জানাও।

ডালিয়া আঙুল নির্দেশ করল শ্যামলের দিকে।

তাকিয়ে চমকে উঠল মহুয়া। যেন হাজার পাওয়ারের একটা আলো দপ করে ওর মুখের ওপরেই নিভে গেল। কিন্তু মহুয়া বুদ্ধিমতী। মুখ ঘুরিয়ে চটপট নিজেকে সহজ করে ফেলল। ভেতরের প্রচন্ড উত্তেজনার ঢাকনাটা সরিয়ে কপট অভিমানের সুরে বলল, ওর জন্য পার্টি—! কই, তা তো বলোনি

ও কবে ফিরবে। অমন ছোটলোক ক্লাসমেটের মুখ দেখাও পাপ।

একটু পরে গলার স্বরটা চড়িয়ে জানাল, বিলেত গিয়ে একটা চিঠি পর্যন্ত নেই। ভীষণ সেলফিস অ্যাণ্ড মীন।

—কি এত খচে গেলে কেন মহুয়া? টিটকিরি দিয়ে বললেন মৃন্ময়।

—খচবো না! একে আবার অভ্যর্থনা। বিলেত গিয়ে থেকে কারও সাথে কোনো সম্পর্ক রেখেছে নাকি? আবার ফেয়ারওয়েল দিয়ে দাও ওকে পার্টির শেষে—

মুচকি মুচকি হাসছিল শ্যামল। অনেকদিন বিলেতে কাটিয়ে এখানকার অনেকের মুখই একটু আবছা আবছা হয়ে গেছে। তবুও মহুয়ার উপস্থিতি বিদ্যুতের চাবুক মারল ওর বুকে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ওসব পরে হবে—এখন বোসো। পার তো একটা গান গাও, তাহলে মান-অভিমান সব কেটে যাবে।

তোমার ওপর মান অভিমান কিছুই নেই আমার, শুধু চাবুক আছে একখানা। পেটাবার জন্য—একঝলক হাসি টেনে রাগ সামলাল মহুয়া।

ততক্ষণে হাতে এসে গেছে জিন অ্যাণ্ড টনিক। উইথ প্লেন্টি আইস। দু'তিন ঢোকে সেটা গলাধঃকরণ করে নিজেই আবার ঢেলে নিল মহুয়া।

—'মহুয়া-মৌ'-এতবছর পরেও রূপ যেন তার ধরে না। যৌবনের ভারে ঈষৎ নম্র হলেও চওড়া বুক ফেটে উষ্ণ প্রস্রবণ উছলে পড়ছে। মহুয়ার মধুর ছটায় মধুর পরিবেশ আরও সুমধুর হয়ে উঠল। মহুয়া ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। কে বলবে মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি বরং কুড়ির পরেই তারা নায়েগ্রার মতো যৌবনে আছড়ে পড়ে।

জিন অ্যাণ্ড টনিক-এ টনটনে হয়ে উঠল মহুয়া। হার্মোনিয়াম টেনে নিয়ে শ্যামলের দিকে তাকিয়ে বলল, শুরু কর শ্যামলদা—

—আমারটা থাক। তুমিই গাও না? অনেকদিন তোমার গান শুনিনি —গলাটা খাদে নামিয়ে আদুরে সুরে বলল শ্যামল।

শোনার কি আর তোমার সময় ছিল শ্যামলদা। তাহলে আর পালিয়ে যেতে না—অনুযোগ করে বড় বড় চোখে তাকাল মহুয়া। ধবধবে ফর্সা চকচকে

মুখখানায়, ড্যাগর দুটো চোখে তরল বিদ্যুতের রোশনাই ঝলকে পড়ছে।

আবার মান অভিমান—যা হবে গানের মধ্যে। 'কথা আর শুনতে ভাল লাগছে না—শংকর বলে উঠল।

'তোমরা না গাইলে আমি গাইব'—বলে ঝুপ করে বসে পড়ল ডালিয়া। সামান্য চোখ বুজে একটা গান ধরল। রবীন্দ্রসংগীত। বেশ মধুর শান্তিনিকেতনী কণ্ঠে।

গান শেষ হতেই সবাই উচ্ছ্বসিত।

মাইরি দারুণ গেয়েছ গানখানি—কপট নেশাবরা গলায় বলল শংকর।

এবার তোর বৌকে একখানা ছাড়তে বল—বলল অজয়। ততক্ষণে ও ফিরে এসেছে। সবাই ওর দিকে তাকাল। অজয় প্রাকটিসে এস্ট্যাবলিশড্ হয়েছে ভালই।

না না এবার মহুয়া—বলল ডালিয়া।

ছাড়ো ছাড়ো মহুয়া তোমার মধু ছাড় এবার—বেশ ভরাট গলায় বলল মৃন্ময়।

—হ্যাঁ, আজ রাতে যখন নতুন গেস্ট মধু তো একটু ছাড়তেই হবে—গলায় মিষ্টি সুর ভাজতে ভাজতে বলল মহুয়া। কলেজ লাইফ থেকেই গানে নাম ছিল ওর। আসলে তার রূপের সঙ্গে তালের গান এমন মানিয়ে যে৺ যে সবাই মুগ্ধ. হয়ে চেয়ে থাকত। যেমন তার সাজগোজ তেমনি তার চপলতা। সবাই সম্মোহিত হয়ে যেত। আবার ভয়ও পেত সহপাঠীদের অনেকেই। কেননা হাত মুখ এমনকি প্রয়োজনে চটি নিয়েও ছুটত মহুয়া। কথার লাগাম ছিল না। ঝটপট কাঁচাখিস্তি দিত। তবুও কলেজে মহুয়ার সুনামের কারণ—পড়াশুনায় সে ছিল সবার ওপরে। কলেজের শিক্ষকরাও এজন্য তাকে ভালবাসত।

তবে ভালো সে কাউকেই বাসেনি এক শ্যামলদাকে ছাড়া। তাও কলেজ লাইফের শেষে।

আস্তে আস্তে গানের ভেতরেই ডুবে গেল মহুয়া।

গান যখন শেষ হলো তখন হাত তালির ঢেউ উঠেছে। সবাই মহুয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইতিমধ্যে ডালিয়া হঠাৎ এদিক ওদিকে তাকিয়ে কি

আবিষ্কার করে জিজ্ঞেস করল, কি রে ছবিটিকে কার কাছে দিয়ে এলি ?

মহুয়া চোখ পাকাল।

—ওকে বেবি সিটারের কাছে রেখে এসেছি। আমারও তো বিশ্রামের দরকার। এই মরদগুলো কি একটা রাতও রেহাই দেয়।

রসিকতার চূড়ান্ত। তবে মিথ্যেই বলল মহুয়া। আর এ-ব্যাপারে মুখ যেন তার তৈরিই হয়ে আছে।

কেন ভগবান তো পাঁচদিন চেস্টিটি বেলট পড়িয়েই রাখে তোদের—বাপ করে মুখ খারাপ করল মৃন্ময় চ্যাটার্জী।

একটু লালচে হলো মেয়েদের মুখগুলো। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে মহুয়া বলল, না ওরও একটা পার্টি ছিল। মুস্কিল ওর বিজনেস পার্টিতে আমি বোরড হয়ে যাই আর আমাদের পার্টিতে ও ব্যাচারা বোর হয়ে যায়। বলতে বলতে মহুয়া নিখুঁত দৃষ্টিতে শ্যামলের দিকে তাকাল। শ্যামলও বেশ কয়েকবার চোরাদৃষ্টি হেনে দেখে নিয়েছে তাকে। যেন তেমন কিছুই জানা-শোনা নেই। কিন্তু দুজনের মনের মধ্যেই ততক্ষণে চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। মেমরির রিলটা বারবারই রিওয়াইন্ড হয়ে চার বছর আগেকার বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে তড়িৎগতির মতো ছুটছিল। তবু নিজেদের সংযত রেখেছিল দুজনেই। মহুয়ার বরাবারই ইচ্ছে হচ্ছিল ওর মার্কস্ স্পেন্সারের সামার ভেস্টটা টিপে ছিঁড়ে ফেলে। মুখে একথা সেকথা বলে গেলেও ওর দৃষ্টিতে যেন আগুন ঝড়ছিল। মান অভিমান অনুরাগ গোঁসা উল্টে পাল্টে ঘুরলেও তা আবছা হয়ে ছিল শ্যামলদার স্মৃতিতে। ক্ষোভ থাকলেও ব্যথা ছিল না।

সেকেন্ড রাউন্ড খাওয়া ও ফিফথ্ রাউন্ড ড্রিঙ্ক এর পর সবাই সম্মোহিত। প্রায় সকলেই স্ত্রীর ঘাড়ে মাথা রেখে অর্ধবিশ্রাম করছে। পরপর গান চলল আরও। হিন্দী বাংলা আধুনিক কীর্তন পল্লীগীতি রবীন্দ্রসংগীত—সবই। তার ফাঁকে ফাঁকে হাসি ঠাট্টা খিস্তি জোকস কি নেই !

ততক্ষণে রাত দুটো বেজে গেছে। মহুয়া উঠি উঠি করে জিজ্ঞেস করল, শ্যামলদা এখন কোথায় আছ ? শ্যামলদা নতুন বিলেত ফেরৎ। তার পকেটে চকচকে নাম ঠিকানা ছাপা কার্ড। তারই একটা চট্ করে পকেট

থেকে বার করে হাতে দিয়ে বলল, এই নাও।

হাতে নিয়ে মহুয়া বলল, বেশ তাহলে দেখা হবে। এবার আমাকে উঠতে হয়।

কি করে যাবে ? জিজ্ঞেস করল শঙ্কর।

ট্যাক্সি পেয়ে যাব।

এত রাত্রে—ইউ মাস্ট বি ম্যাড—চল আমি নামিয়ে দিয়ে আসি—অজয় অফার করল।

এতক্ষণে শ্যামল জিজ্ঞেস করল। তুমি কোথায় থাক ?

হিন্দুস্থান ভিলা।

সে আবার কোথায় ?

গড়িয়া হাটের মোড়ে।

তবে চল আমি নামিয়ে দিয়ে আমার ফ্লাটে চলে যাব। ও তো কয়েক মিনিটের পথ। বলল শ্যামল। সে সুযোগটাই খুঁজছিল মহুয়া।

বেশ চল—শুভরাত্রি জানিয়ে তারা বিদায় নিল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যরাও আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে পড়ল। মৃন্ময় বিদায়ের সময়ে বললে, রাধাকৃষ্ণ তো মিলিয়ে দিলে, এবার ঘোষ গয়লার কি হবে ? সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।।

ভোরের রোদ উঁকিঝুঁকি দিতেই চমকে তাকিয়েছিল শ্যামল। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। দেহটাও যেন ভার ভার। আরক্ত চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল আলোর ছোঁয়ায়। অনেক কষ্টে চোখ মেলে দেখল মাখনের তালটা বুকের ওপর কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো ঝলমল করছে। জানালা দিয়ে যেটুকু দেখা যায় বাইরে তখনও আবছা অন্ধকার। কয়েকটি সূর্যরশ্মির রক্তাভ বিচ্ছুরণ দুটো বাড়ির ফাঁক দিয়ে কৌতূহলী চোরা দৃষ্টি মেলে তাদের সঙ্গে রসিকতা করছিল।

এই ওঠ—ভোর হয়ে গেছে—সম্বিত ফিরে পেয়ে মহুয়াকে ঠেলে তুলল শ্যামল।

অর্ধ নিমিলিত চোখে ততক্ষণে এদিকে ওদিকে তাকাল মহুয়া। পরে জিজ্ঞেস করল, আমি কোথায় ?

জাহান্নামে—ওঠ চট্‌পট। কেউ দেখে ফেললে তেড়ে আসবে, জোর করে একরকম হাত দিয়ে ঠেলেই তুলে দিল শ্যামল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল মহুয়া। হঠাৎ টনক পড়ল তার, একি ! কোথায় আমি ? আরে তুমি ?

পেছনের সিট থেকে সামনে ড্রাইভিং সিটে বসে ততক্ষণে স্টার্ট দিয়েছে শ্যামল সেন। দূরে একটি রিক্সাওয়ালা ও এক ঠেলাওয়ালার নজরে পড়েছিল ব্যাপারটা। জ্বলজ্বল করে তারা তাকাতেই শ্যামলের গাড়ি হুহু করে ছুটল। আস্তে আস্তে তখন গতরাত্রের ঘটনা সবই মনের পটে ভেসে এল শ্যামলের। মহুয়াই অন্য পথে এনে গাড়ি থামাতে বলেছিল নির্জন গাছে ঢাকা একটা অন্ধকার রাস্তায়। তারপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল শ্যামলের বুকে। কখন যে দুজনেই এরপর গাড়ির পেছনের সীটে এসে বসেছে, কখন যে দুজনেই যৌবনের দুর্বার স্রোতে ভেসে গেছে, গাড়িটা ছাড়া তা কেউই জানে না। অবশ্য দুটো নেশাগ্রস্ত দেহ ঘণ্টাদুয়েক ঘুমিয়ে পড়ে কিসের যে স্বপ্ন দেখেছিল তা আর মনে পড়ল না। এটুকু শুধু মনে পড়েছিল শ্যামল বিলেত যাবার মাসখানেক আগেও এমনি এক রাত্রে গাড়ির পেছনের সীটে তারা দুজন দুজনের নিবিড় পরশে প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। মাঝখানে সামান্য ব্যবধান ছিল ভবিষ্যতের রোমাঞ্চের জন্য। এতদিন পরে বুঝি সম্পূর্ণ আলাদা মনে ও সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে সেই ব্যবধানও তছনছ হয়ে গেছে। কিন্তু রোমাঞ্চিত তৃপ্তির স্বাদ আর তার মধ্যে ছিল না। একতরফা অভিমান অনুরাগের সঙ্গে মিশে ছিল পানীয়ের মাদকতা। মহুয়ার দুর্বার স্রোতে কোনো রকমে হাল ধরে ছিল শ্যামল সেন। তবে বাধা দেয়নি, হয়ত নেশার ঘোরে বাধা দেবার মতো মনের অবস্থাও তার ছিল না।

মহুয়াকে নামিয়ে দিয়ে নিজের ফ্লাটে যখন পেঁাছোল তখন ভোর হয়ে গেছে। [illegible] বিছানায় আছড়ে ফেলে সুপ্তির অতলে আবার [illegible] গেল—ডাঃ শ্যামল কান্তি সেন—এম এস, এফ আর সি এস।

আর মহুয়া ?

ভোরের আলোতে দপ্ করে জ্বলে উঠল সে মশালের মতো। সারা গায়ে তারই অতি আকাঙ্ক্ষিত স্বামীর ভালোবাসার চিহ্ন। আবেগের উচ্ছলতায় সে চঞ্চল। দিগ্বিজয় করে মহারানী স্টেথোটা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বার করে দোলাতে দোলাতে বাড়িতে ঢুকল। পুলকে উদ্বেলিত দেহতে শিহরণের ঢেউ বইছে। চেষ্টা করেও ব্রেক কষতে পারছে না উন্মত্ত মনের স্পিডটিকে। ততক্ষণে মালী এসে গেছে। সে ফুলের বাগান থেকেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল,—"দিদিমণি এই কল থেকে ফিরলেন ?" চমকে তাকাল মহুয়া। হ্যাঁ, খুব খাটুনি গেছে রে সারারাত।

কথাটা বলতে পেরে নিজেকে লো গীয়ারে ঝপ করে শান্ত করে দিতে পারল মহুয়া।

ডাক্তারী করার থেকে অন্য কিছু করাই ভালো—সহানুভূতি জানিয়ে জবাব দিয়ে নিজের কাজে ডুবে যায় মালী। ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে গেছে মহুয়া। ঘাম শুকিয়ে গাটা চ্যাটচ্যাট করছে। এখন যদিও বাইরে বেশ ঠাণ্ডা বাতাসই বইছিল তবুও দেহমনের উত্তাপেই হাঁপাচ্ছিল সে। বেডরুমে ঢুকে অবিন্যস্ত জামাকাপড় খুলে অ্যাটাচড্ বাথরুমের টাবে গরম ঠান্ডা জল মিশিয়ে একগাদা বাবল্ বাথ ঢেলে ফেনার মধ্যে নিরাবরণ দেহটাকে ডোবাল মহুয়া। 'আঃ' দারুন তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল একটা। তারপর গুনগুন করে একটা গানের সুর ভাজতে লাগল। অথচ সে কি জানে, তার স্বামী রমণী মোহন পাল তখন বম্বের নামকরা হোটেলে নিদ্রামগ্ন ! আর তারই সঙ্গে বেড শেয়ার করেছে তারই প্রাইভেট প্রপার্টি কাম সেক্রেটারী চন্দনা বিশ্বাস। সানডে মর্নিং—অতএব নট্ টু বি ডিসটারবড্।

সুলেখা সেন সেদিন অফিসে গিয়ে শুনল তার ইমিডিয়েট বস নরেন রায় আসেনি। তার স্ত্রী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

নরেন রায় লোকটি খারাপ নয়। সুলেখার সঙ্গে খুবই খোশগল্প হয়। বন্ধু বলতে সুলেখার এখন ওই একজনই। যার কাছে মনের গোপন কথাও সহজে প্রকাশ করা যায়। সে কয়েকবার তার বাড়িতে বিভিন্ন কারণে গেছে। মেয়ে পদ্মর সঙ্গেও তার ছেলের খুব বন্ধুত্ব। সুলেখা সেন ও নরেন রায়ের স্ত্রী শর্মিষ্ঠার ভেতরেও খুব মেলামেশা। দুজনে একসঙ্গে মাঝেমাঝে সিনেমায় যায় ও শপিং করে।

শর্মিষ্ঠা অনেকবারই বলেছে, দিন পাল্টেছে সুলেখা। তুমি এবারে একটা ভালোবেসে বিয়ে কর। কত লোকের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই বা ডিভোর্সড। কত লোকের স্ত্রী মারা গেছে—বেচারি সঙ্গী খুঁজছে। সেরকমই একজন খুঁজে বার কর। একবার পেলে দেখবে তোমার চেহারা পাল্টে গেছে। কেউ না থাকাটা এ বয়সে ঠিক নয়। বুঝে শুনে সময় থাকতে বেছে নাও, নয়তো কোনো পাগলা ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। বুড়ো বয়সের সিকিউরিটি থাকবে না।

সুলেখা মৃদু হাসে। শর্মিষ্ঠার কথার আস্তে আস্তে জবাব দেয়।

—না শর্মিষ্ঠা এই বেশ আছি। একবার করে পস্তিয়েছি, আর পস্তাতে চাই না। ভেতরের জ্বালা সহ্য হয়ে গেছে।

—তা না হয় হয়েছে, কিন্তু দেহের জ্বালা! দেহের জ্বালাই যে মনকে বেশি পোড়ায়। ভেতরের ব্যথা বুদ্ধি দিয়ে নেভানো যায়, সান্ত্বনা দেওয়া যায় কিন্তু দেহের আগুনে যে প্রতিদিন শত চোখের দৃষ্টিতে ধুপের মতো জ্বালিয়ে দেয়। নিজের দিকে কি চেয়ে দেখেছো? দেখলে বুঝতে, পাকা ডালিমের মতোই যৌবনটা এখনো সেজেগুজে আছে।

সুলেখা লজ্জা পায়।

লজ্জাবনত দৃষ্টিতে পীনোন্নত বুকের দিকে নজর পড়তেই আঁচলটা টেনে দিল সে। কান দুটো ঝাঝা করছে। দেহের মোহনায় হঠাৎ একটা সাগরের ঢেউ আছড়ে পড়ে সমস্ত দেহটাকে যেন শিহরিত করল। শর্মিষ্ঠার বাঁকা চোখের চাওয়া ও ওর শরীর নিয়ে মন্তব্য সুলেখার ঠিক ভালো লাগেনি! তবে না লাগলেও দেহেমনে যেন কিসের ইশারা জাগিয়েছিল। আর সেই ইশারাকে উপেক্ষা করতে পারেনি সুলেখা। শর্মিষ্ঠার বারবার প্রস্তাব ও অসংখ্য অকাট্য যুক্তির ঘায়ে একসময় সত্যিই তার মনটা নরম হয়ে পড়ে। দেহটাও তপ্তঘন মধুর রসে সিক্ত হয়ে ফেটে পড়তে চায়। ফলে সমস্ত পুরোনো স্মৃতির আঘাতগুলো মন থেকে মুছে ফেলে নিজেকে যেন নতুন করে তৈরি করে। শর্মিষ্ঠাকে বলে, অতই যখন বন্ধুপ্রীতি তো খোঁজই না কাউকে। দেখ না কে দু'হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে বউ করবে বলে।

দাঁড়িয়ে আবার নেই!

ছাই দাঁড়িয়ে—সুলেখা জবাব দেয়, জানো না তো পুরুষরা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বউ চায় না। ফূর্তি করা এক জিনিস আর বিয়ে করা অন্য।

—আরে না না। চাকরি করা মেয়েকে অনেকেই চাইবে—দৃঢ় স্বরে বলে শর্মিষ্ঠা, যাই হোক আমি আজ থেকেই খুঁজব। সেবার বললাম অমলদাকে বিয়ে কর। অমলদার তোমাকে তো খুব পছন্দ ছিল। বলামাত্র তুমি সাপের মত ফোঁস করে উঠলে—আমিও পিছিয়ে গেলাম—আফশোসের সুরে বলে শর্মিষ্ঠা।

সুলেখা সামান্য গম্ভীর হল, বাঃ তখন ও মারা গেছে দুবছরও হয়নি—মনে মনে ভাবল, কিন্তু বলল না যে এখন যতটা সহ্যক্ষমতা হয়েছে তখন কি তা ছিল? এখন মনে হয় আমাকেও তো বেঁচে থাকতে হবে পদ্মর জন্য। আবার আমার এ আমিটাকেও সর্বক্ষণ ফেলে আসা দুর্ঘটনার স্মৃতি বিষ পান করিয়ে নেশাগ্রস্ত করে রাখতে পারছি না। তাছাড়া সুলেখা টের পায়, তার ভেতরের আমিটাও শাসন বাঁধন মানতে চাইছে না। হাজার হাজার পুরুষের চোখের ছোবল, ট্রামে বাসে দেহের নিষ্পেষণে সে ক্লান্ত। বোঝে নিজের ভেতরেই কেমন একটা তৃষ্ণার জ্বালা ছটফটিয়ে মাথা কুটে মরছে। প্রায় দিনই

ভাবে সুলেখা, অফিস থেকে ফিরে রাতের অন্ধকারে শুয়ে ভাবে, জীবন বারবার আসে না। তবে কেন এ জীবনকে এভাবে পুড়িয়ে মারছে! তার চেয়ে যদি আবার নতুন জীবন বেছে নেয়—!

ভাবে। আর ভাবতে ভাবতে সে নিজেই অস্থির হয়। ছুটে যায় শর্মিষ্ঠার কাছে। শর্মিষ্ঠা বোঝে বহুদিন ধরে যে যুক্তি দিয়ে সুলেখাকে নরম করতে চেয়েছে সে সেটা কাজে লেগেছে। আগে সেই যুক্তিগুলোই ভিন্ন অর্থ বহন করে রিবাউণ্ড হয়ে আক্রমণ করত শর্মিষ্ঠাদের মতো বন্ধুদের। আজ সুলেখার সে আবরণ শিথিল হয়েছে।

চুপ করে বসে চা খাচ্ছিল সুলেখা। কাছাকাছি রান্নাঘরে শর্মিষ্ঠা মোচা রান্না করছিল। ঘি গরম মশলা সম্ভারের দারুণ একটা গন্ধে ভরে গিয়েছিল রান্না ঘরটা। সুগন্ধ মনের ব্যথা উড়িয়ে নিয়ে যায়। সুলেখারও তাই হল। নিজের ভাগ্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কিন্তু বড় ভয় করে যে আবার যদি কিছু হয়! তখন এ পোড়ামুখ কোথায় রাখবো? মোচাঘণ্টটা নামিয়ে তৎক্ষণে ফ্রায়েড্ রাইসের ঘিটা চাপিয়ে দিয়েছিল শর্মিষ্ঠা। ঘি গরম হতেই পেঁয়াজটা ঢেলে দিল। একটু নেড়ে চেড়ে বলল,—তাহলে তুমি বলতে চাইছ, ইচ্ছে থাকলেও ভবিষ্যতের অজানা আশঙ্কায় ভীত হয়ে তুমি এগিয়ে যাওয়ার সাহস পাচ্ছো না—

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। বুদ্ধি-বিদ্যা আর জ্ঞানই সব নয়। ভাগ্য ও নিয়তির দুঃস্বপ্নও আষ্টে পৃষ্ঠে মানুষকে বেঁধে রাখে।

দেখ, তুমি যত ভাবছ, আমার তো মনে হয় না অন্যরা ঠিক ততটা তোমার সম্বন্ধে ভাবছে। এটা তোমার নিজের মনেরই ব্যাপার। এরকম মন নিয়ে কিছু করা ঠিক নয়। আগে নিজের মনকে শক্ত কর, নয়ত পরে নিজেকেই আশ্বস্ত করতে পারবে না তুমি। সমাজ সংসার, আত্মীয় পরিজন তারা কেউ কেউ ওই দু'চার দিন ভালোমন্দ বলবে তারপর তাদের আর বলার শক্তি থাকবে না। কিন্তু নিজের মনের বিরুদ্ধে গেলে সে তোমায় সারাজীবন অহরহ পুড়িয়ে মারবে।

তা ঠিকই। খুব সত্যি কথা। কিন্তু আবার বিয়ে করলেও আমি নিজের

ভেতরে পুড়ে মরবো ; আবার না করলেও তাই। এবার ভাবতে হবে, পেয়ে মরব ; না—না পেয়ে মরব !

— পেয়েই মর না ! কি রাজি ?

জানি না। যুক্তির খাতিরে অনেক কিছুই বললাম কিন্তু মনটাকে এখনও ঠিক যাচাই করে দেখার সাহস পাইনি। এতদিন সাগরের ঢেউকে বাঁধ দিয়ে আটকে রেখেছি। বান আসাটাকে ভয় পেয়েছি। এখন বাঁধ খুলে দেব কিন্তু যেচে ডাকব না। ভাগ্যের জোয়ার ধীরে ধীরে নিজেই আসুক। আমি শুধু নিয়তির নীরব দর্শক হিসেবে গা ভাসিয়ে দেব।

—বাঃ চমৎকার আইডিয়া। আমার মনে হয় এই নেগেটিভ পজিটিভিটিই সবচেয়ে ভালো। তাতে নিজেকে সান্ত্বনা দেবারও একটা ফাঁক থাকবে।

কথা বলতে বলতেই দুজনে কখন অন্যজগতে চলে গিয়েছিল খেয়াল নেই ; খেয়াল হল নরেন রায় এসে ঘরে ঢুকতেই। সে ঢুকেছিল রান্নার কতদূর জানার জন্যে। পেছন পেছন সুলেখার মেয়ে পদ্ম ও শর্মিষ্ঠার ছেলে সমরেশ।

পদ্মর বয়স এগারো আর সুলেখার একত্রিশ। আঠেরো বছরে বিয়ে আর চব্বিশ বছরে বিধবা ; অতএব চাকরি ও পদ্মকে নিয়েই শীতল নিরুদ্বেগ মৌন জীবন কেটে গেছে এই সাত বছর ধরে।

—ক্ষিধে পেয়েছে তোমাদের ? যাও ডাইনিং রুমে বোস। এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি, বলল—শর্মিষ্ঠা।

সমরেশ ও পদ্ম গিয়ে ডাইনিং রুমে বসল। ফ্রায়েড্ রাইস ও তন্দুরি চিকেন দিয়ে এল শর্মিষ্ঠা।

—আগে ওরা খেয়ে নিক। পরে আমরা খাব। রায় সাহেব আবার একটি ওয়াইন্ নিয়ে এসেছে। বলে কি জানো, ওয়াইন অ্যান্ড ওয়াইফ্ এ'দুটো ডবলিউ হলেই ইউ গেট্ দ্য ওয়ার্ল্ড।

—ডবলিউ দিয়ে ওম্যানও হয় কিন্তু। অন্য ওম্যানে দৃষ্টি না পড়লেই হোল !—ঠাট্টা করে বলে সুলেখা।

তাহলে চামড়া ছাড়িয়ে নেব না। হ্যাভ ইট অর ফরগেট ইট—আমি—

নয়ত কেউ নয়।—ঝাঁঝাল স্বরে গর্বের সঙ্গে বলেছিল শর্মিষ্ঠা। আশ্চর্য! কয়েক রাত আগেই যার সাথে অতসব মনের কথা হলো, হঠাৎ সেই অসুস্থ হয়ে একেবারে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে! শুনে সুলেখার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কোনোরকম না করলেই নয় কাজগুলো—তাই দায়সারা ভাবে শেষ করেই ছুটল নরেন রায়ের বাড়িতে।

বাড়িতে কাউকেই পাওয়া গেল না। কিন্তু কোন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে জেনে সুলেখা সেখানেই ছুটল। অধীর উদ্বেগ ও উত্তেজনায় বুকটা তখন হাপরের মতো উঠছে নামছে। হাসপাতালে পৌঁছোতেই রিসেপশন থেকে ওয়ার্ড নম্বর বলে দিল। বুকে বিরাট বোঝা নিয়ে উঠল সুলেখা। স্নেহ ভালবাসার স্বভাবই তো অকারণেও অনিষ্ট আশঙ্কা করা। এখানে তো উদ্বেগের যথেষ্টই কারণ আছে।

ওয়ার্ডের সামনেই বসে ছিলেন নরেন রায়। সুলেখাকে দেখেই মুখটা সামান্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে মনে যেন খানিকটা সাহস পেলেন। চোখে মুখে গভীর আতঙ্কের কালি মাখা। ফ্যাল ফ্যাল করে নির্বোধ অথর্বের মতো অস্ফুটে বললেন, ওকে ওটি-তে নিয়ে গেছে সেই কখন, এখনও তো এলো না। তার স্বরে জড়তা। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ।

—কি হয়েছে? উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করল সুলেখা।

বিড় বিড় করে কোনো রকমে নরেন রায় মাথা নেড়ে বললেন, জানি না—

—কিন্তু কি কারণে ভর্তি হলো? উদভ্রান্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল সুলেখা।

—অজ্ঞান—ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি তাকে জাগাতে পারছি না। ঝাঁকুনি দিয়েও জাগাতে পারলাম না। হাত-পা সব কেমন প্যারালাইজড্। অ্যাম্বুল্যান্স ডেকে এখানে নিয়ে এলাম। ওরাও কিছু ডায়গোনিসিস করতে পারছে না।

ব্যাকুল ভাবে বললেন নরেনবাবু।

সুলেখা নার্সের কাছ থেকে দু'গ্লাস জল চেয়ে আনল। দু'জনে জল খেয়ে কিছুটা সতেজ হলো।

—সমরেশ কোথায় ? জিজ্ঞেস করল সুলেখা।

—ওকে পাশের বাড়িতে রেখে এসেছি। পরে ওর মামাকে ফোনে বলেছি ওখানে নিয়ে যেতে।

—কেন আমার কাছেই পাঠাতে পারতেন। মামার কাছে থাকলে তো স্কুলে যেতে পারবে না—পরিবেশ সহজ করার জন্যই সুলেখা চাইল নরেন বাবুর মনটাকে কিছুক্ষণের জন্য অন্য কোথাও ঘুরিয়ে আনতে।

হঁ্যা—তোমার কথা আমার মাথায় আসেনি। আসলে ওর মামা তো ডাক্তার তাই তার কথাই আগে মনে পড়ল। চেম্বার শেষ করেই ফিরে আসবেন এখানে—অকপটে স্বীকার করল নরেনবাবু।

আমার কথা আপনার মনেই থাকে না অসময়ে। আমি তো ভাবতাম শর্মিষ্ঠা আমার খুবই আপন বন্ধু।

একটা অভিমানের দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল সুলেখা।

—না, না, তুমি দোষ নিও না। অসুখ হলে প্রথমেই ডাক্তারের কথা মনে হয় তার সঙ্গে তেমন সম্পর্ক না থাকলেও। ভোরে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল —পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে হয়েছিল। একটা ফোন করতে একঘণ্টা আর অ্যাম্বুল্যান্স পেতে দুঘণ্টা। কত রুগী তারই মধ্যে মরে যায়। তেমনি তো রাস্তার অবস্থা। আসতে একঘণ্টা, তাও ঝাঁকুনিতে আমারই সমস্ত গা ব্যথা হয়ে গেছে। জানি না ওর কি হবে।

অনেক কথা বলতে পেরে এবারে একটু আশ্বস্ত হল নরেন রায়।

—আপনি ভাববেন না। শর্মি ঠিক হয়ে যাবে—সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল সুলেখা। করল, তবে মনে মনে ততক্ষণে ভেসে এসেছে এই হাসপাতালেই তার স্বামীর অসুস্থ হয়ে আসা ও চিরদিনের তরে বিদায় নেবাব দিনটি। আশ্চর্য! সামান্য একটি ফোঁড়া নিয়ে ভর্তি। কয়েক দিনের মধ্যেই জানা গেল, সার্কোমা আর তার কয়েক দিনের মধ্যেই যেন দপ করে পৃথিবীর আলো নিভে গেল চোখের সামনে। ঈশ্বর যেন তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত ভাবলেশহীন ভাবে বললেন, লেট দেয়ার বি ডার্কনেস্ অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ ডার্কনেস্। এমন ভাবেই মাঝে মাঝে খেয়ালি ঈশ্বর তার লীলাখেলা দেখান

একে ওকে। তার কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথম কয়েকদিন কী যে একটা হয়ে গেল তা মাথায়ই ঢোকে নি। অসংখ্য দৃষ্টির সামনে এক পাপিষ্ঠা তার শাঁখা ভেঙে, সিঁদুর ধুয়ে থান পরে রঙ্গমঞ্চে ব্যথার পার্টটি কোনো রকম শেষ করল। অনেকের চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হলো ক্ষণকালের জন্য— বাস্ দুনিয়া ভুলে গেল সব। কিন্তু পৃথিবী ভুললেও তাকে তো বাঁচতে হবে! পদ্মকে বুকে চেপে তাই বাবার কাছে এসে অচেতন হয়ে পড়েছিল। বাবা বুকে নিয়ে তার আদরের মেয়েকে অনেক বুঝিয়ে অনেকটাই সহজ করে দিয়েছিলেন। বছর খানেক পর বিয়ের কথাও ইনিয়ে বিনিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলেছে। সাহস পায়নি সুলেখা। তখনও স্বামীর স্নেহ-ভালোবাসার স্মৃতি সর্বাঙ্গে লেপটে আছে। ধীরে বয়ে গেছে সময়। কাজ, টিউশনি ও পদ্মকে নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে বেশ কয়েকটা বছর। তার পর থেকেই শুরু হয়েছে শর্মিষ্ঠার আবদার আবেদন যুক্তি মতবাদ ইত্যাদি। সেই সঙ্গে বুঝিয়েছে আরও অনেকে স্ত্রী-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ইত্যাদির অনেক আলোচনার ঝড় বয়ে গেছে গত দু'তিন বছরে। আর্দ্র বায়ু লোহাকেও মরিচার আবরণে ঢেকে নরম করে ফেলে। নিজের মনের গভীরে সুলেখা নরম হলো। আব স্নায়ুকেন্দ্র একবার মনের হদিশ পেলে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুপরমাণুর নতুন করে সৃষ্টি শুরু করে দেহাভ্যন্তরে, তাতেই আণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। যারা সুপ্ত ছিল তারা আরও অধীর আবেগে জাগ্রত হয়ে ওঠে। গত ছ'মাসে সুলেখার একসময়ের বিষাদকালো মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এভাবে। অবিন্যস্ত বেখেয়ালী বেশভূষাও আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। যে শুধু মোটামুটি আকর্ষণীয়া যুবতী মাত্র সেও তরোয়ালের মত ধারালো হয়ে উঠল। আর যতই তার চাকচিক্য বাড়াতে লাগল অফিসের মেয়ে বন্ধুরা, পুরুষের কটাক্ষ এবং সবচেয়ে বেশি শর্মিষ্ঠা ও নরেন বাবুর উচ্ছলতা আরও উদ্দাম হয়ে উঠল। উপোসী দেহ নরম মন পেয়ে আরও পেয়ে বসল! দেহমনের তাড়নায় হৃদয়টাও ছটফট করতে শুরু করল। আত্মা ও বিবেকও সেই যুক্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল। তাই একসময় শর্মিষ্ঠাকে বুকের অত্যন্ত সংগোপনে চাপা ইচ্ছাটিকে প্রকাশ করল সুলেখা; সে জানে মেয়েদের পুরুষ পাওয়া কিছুই না। বিয়ের ক্ষেত্রে পুরুষের মূল্য অনেক। কিন্তু

অনেক ইচ্ছা হয়েছিল একটি মেয়ে হোক। মাইনে বেড়েছে। পদোন্নতি হয়েছে—তাই। গতানুতিক একটা জীবনেও বাজ ভেঙে পড়ে এটা কে আর কখনভাবে। যারা বিমানগামী, মটরগামী এমন কি ট্রেনে ডেলি পেসেঞ্জার—তাদেরও অঘটন ঘটতে পারে। তা ব.ল তার মত সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত ছোট, সুখী শান্তিপূর্ণ সংসারে একী বজ্রাঘাত! মনে মনে "হে ঠাকুর একী করলে তুমি? কেন এমন হলো? যদি"···আর ভাবতে পারেন না নরেনবাবু। উদভ্রান্তের মতো বাষ্পহীন চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালেন সুলেখার দিকে। সুলেখা একটা ট্যাক্সি ডেকেছিল; ট্যাক্সিতে বসে বলল এখন আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না সুলেখা! গভীর চিন্তার অরণ্য থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সুলেখা। কলকাতার রুগ্ন পথে চোখ বুলোতে বুলোতে বলল, যা ভাগ্যে আছে তাই হবে নরেনবাবু। যাদের হাতে ওর জীবন তারা নিশ্চয়ই আপ্রাণ চেষ্টা করবেন ভাল করতে। এ সময় শক্ত হতে হবে। এত উতলা হচ্ছেন কেন!

—কেন যে হচ্ছি কি করে বোঝাবো তোমাকে সুলেখা! ওর কিছু হলে ছেলেটাকে কে দেখবে! ও বেচারা যে মা অন্ত প্রাণ—অসহায় আতংকগ্রস্তভাবে বললেন নরেনবাবু। তিনি যেন হাউমাউ করে কলকাতা ফাটিয়ে চিৎকার করতে পারলে শান্তি পেতেন।

একসময় সমরেশকে নিয়েই সুলেখা তার বাড়িতে এল। নরেনবাবুকে একরকম জোর করেই হাত ধরে নামাল সুলেখা। বলল, এ সুযোগটুকু দিন—নয়ত শমির কাছে আমি বড় ছোট হয়ে যাব। আপনারাই আমার একমাত্র বন্ধু—এ সময় আমাকে প্লিজ একটু সাহায্য করতে দিন—

পরের দিন অফিস কামাই করে দশটা নাগাদই হাসপাতালে ছুটে এল সুলেখা। সারাটা রাত কত যে দুঃস্বপ্ন দেখেছে তার ঠিক নেই। সমরেশ ও পদ্মকে তৈরি করে স্কুলে পৌছে দিয়েই ঠিক করে ফেলল গোল্লায় যাক অফিস, আগে শমি পরে কাজ। গভীর উদ্বেগে মনটা ছটফট করছিল। যতই হাসপাতালের কাছে আসছিল ততই বুকের মধ্যে নাকাড়া বাজার তেজটা বেড়ে যেতে লাগল। দরজা দিয়ে ঢুকে এনকোয়ারির সামনে দাঁড়িয়ে ঘর্মাক্ত সুলেখা থমকে দাঁড়াল। গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকের চলন্ত হৃৎপিন্ডটাকে একটু শান্ত

প্রেমের স্থানে মেয়েদের অফুরন্ত পছন্দ। অন্ততঃ যার রূপ গুণ ও বিদ্যা আছে। তার বয়েস হলেও আজকাল এটা এমন কিছু নয় যে বিয়ে করতে পারবে না সে। তাছাড়া কিছুদিন পরে পদ্মও থাকবে না তার কাছে ; এখনও বয়স কম হয়ত সহজেই মেনে নেবে, পরে জামাইর সামনে শ্বাশুড়ী বিয়ে করছে—এ অসম্ভব। এরকম অনেককিছুই অগ্রপশ্চাৎ ভালমন্দ চুলচেড়া বিচার করেছে সুলেখা। ঠিক সেই সময়ই শর্মিষ্ঠা বেচারী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে।

কথাগুলো ভাবছিল নতুন করে হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে বসে। তখনই শর্মিষ্ঠাকে ও টি থেকে নামিয়ে নিয়ে আসা হলো। দু'হাতেই ফ্লুইড দেয়া হচ্ছে। তা দিয়ে একটা টিউব থেকে রক্ত যাচ্ছে। মাথাটা ব্যান্ডেজ করা। তখনও অজ্ঞান। অবস্থা দেখে নিঃস্ব অসহায়ভাবে উঠে দাঁড়ালেন নরেনবাবু। ভীত সন্ত্রস্ত কন্ঠে উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন ; কি হয়েছে ডাক্তার বাবু।

পেছনেই হাউস সার্জেন একজন যাচ্ছিলেন, বললেন, ব্রেনে হ্যামারেজ হয়েছে। হয়ত উনি প্রেগনেন্টও। এক্ষুনি এর বেশি বলা সম্ভব নয়। কালকে ভোরে এসে খোঁজ করবেন, নয়ত প্রয়োজন হলে আপনাকে জানানো হবে। ডাক্তারের চোখে মুখেও একটা শঙ্কার কালোমেঘ থম থম করছে।

সুলেখা তাকাল। ভেঙে পড়ার মতো মেয়ে নয় সে নরেনবাবুর মনটা বুঝতে তার অসুবিধে হলো না। ভদ্রলোক এরই মধ্যে ঝড়ে পড়া পাখির মতো। বিধবস্ত। সান্ত্বনা দিয়ে সুলেখা বলল, চলুন নরেনবাবু সারা দিনরাত এখানে বসে থাকলেও আমরা কিছু করতে পারবো না। বরং সমরেশকে নিয়ে আমার বাড়িতে চলুন। ওকে স্কুলে দিয়ে আমি অফিসে যেতে পারব। ওরও পদ্মর সঙ্গে থাকতে ভাল লাগবে।

হ্যাঁ চলো—ফিসফিস করে বললেন নরেনবাবু। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি যেন বোবা হয়ে গেছেন। যেন এখন যে কেউ যে-ভাবে চালাবে সে ভাবেই চলবে। সরল সহজ নরেনবাবুর জীবনে বৈচিত্র্যের বড় অভাব। মাস্টারের ছেলে। ছোটবেলা থেকেই নম্র ভদ্র বিনয়ী। গোবেচারা গোছের। বি. এস-সি পাশ করে পি. এস. সির মারফৎ চাকরি পাবার পর মামার পছন্দ করা মেয়ে শর্মিষ্ঠার সঙ্গে বিয়ে। বছর খানেক পরেই সমরেশের জন্ম। এবার

করার জন্য দেয়ালে ভর করে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিল। বাসের নিষ্পেষণে অগোছাল শাড়িটা ঝেড়ে নিল একটু। এলোমেলো চুলটাকে হাত দিয়ে ঠিক করল। হঠাৎ মনে হল কে যেন নিবিড় করে তাকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। সুলেখা সোজা হল। গম্ভীর কটাক্ষে তাকাল একপলক। অন্যদিকে ঘুরে যাবে তবুও আবার দাঁড়ালো। ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ঘুরে আবার তাকালো। একজন ডাক্তারই—মনে হলো সুলেখার, কিন্তু তাকানোটা যেন কেমন। একটু চাপা রাগ জ্বলে উঠল সুলেখার। অমন চাহনি পথে-ঘাটে এখানে ওখানে তো কত লক্ষ লক্ষ বার ছিটকে এসে আছড়ে পড়ে তার গায়ের ওপর। পারলে পোশাক ভেদ করে ভেতরে ঢোকে। কিন্তু এ চাহনিটা যেন একটু আলাদা। তাবে খুঁটিয়ে দেখছে কিন্তু কেমন ভাসাভাসা চোখে। তার মধ্যে অন্বেষণ আছে, কিন্তু চাহিদা নেই। একটা কী যেন খুঁজছে ওর দেহের মধ্যে। হয়ত কারও চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করছে। একটু এগিয়ে আবার পিছিয়ে এল সুলেখা। এই ডাক্তারের কাছেই শমির খবরটা জানা যাবে হয়তো। যদি আমার ওপর কোনো কারণে দুর্বলতা এসে থাকে তবে তো ভালই, শমির খবরটা ডিটেলস এ পাওয়া যাবে।

ডাক্তারবাবুও তখন ঘুরে অন্যপথে চলার মুখে। সুলেখা একটু চট জলদি পা চালিয়ে কাছাকাছি এসে ডাকল, ডক্টর—

ডাক্তার পেছনে ফিরলেন। মুখে এক ঝলক হাসি। আবারও গভীর দৃষ্টিতে চোখ রাখল সুলেখার দিকে। তারপর অস্ফুটকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, কিছু মনে করবেন না—আপনার নাম কি পুঁটি ছিল?

চমকে উঠল সুলেখা। একটা বোতাম টিপে আচমকা কে যেন ওকে হঠাৎই অনেক বছর পেছনে নিয়ে গেল। অবাক বিস্ময়ে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে রইল সুলেখা। যেন তার চোখের ভিতর চোখ রেখে দৃষ্টি থেকেই নিজের অতীতটাকে বারবার টেনে বার করার চেষ্টা করছিল। আর এভাবে কতক্ষণ যে দুজন দুজনকে দেখছিল খেয়াল নেই, খেয়াল হল হঠাৎ হাসপাতালের একজন ওয়ার্ড বয় এসে দাঁড়াতে।

—ডাঃ সেন আপনাকে থিয়েটারে ডাকছেন।

—হ্যাঁ যাচ্ছি, তুমি যাও—

মুখ ফিরিয়ে ডাক্তার আবার জানালেন, আপনি এখানে একটু ওয়েট করুন আমি এখুনি আসছি—বলে হন্তদন্ত হয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেলেন ডাঃ সেন।

সুলেখা দাঁড়িয়েই রইল। ফেলে আসা অজস্র মানুষের ছবির কারোরই সঙ্গে সে মেলাতে পারছে না। কী সাংঘাতিক অস্বস্তিকর পরিবেশ। কে এই ডাঃ সেন? তবুও আনন্দে ভরে গেল মনটা। যাই হোক অন্ততঃ একজন ডাক্তারকে তো চেনার সুযোগ পাওয়া গেল এখানে। ওকে দিয়ে শর্মির খবরা-খবর ও তত্ত্বাবধানের অনেকটাই সুবিধা হবে। মনটা অনেকটা শান্ত হলো সুলেখার।

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে এক কোণে একটা বেঞ্চি চোখে পড়ল ওর। ও গিয়ে বেঞ্চিতেই বসল। কে ডাঃ সেন? পুরো নামটাই বা কি! ভাবতে ভাবতে উঠে অনুসন্ধান অফিসে জিজ্ঞেস করল সুলেখা। জানতে চাইল শর্মিষ্ঠার খবর।

আমরা যতদূর জানি—একই রকম আছেন। অবস্থা খুব একটা ভাল না। তবে বলা মুস্কিল। চেষ্টা চলছে। গতানুগতিক খারাপ পেসেণ্ট সম্বন্ধে যেটুকু বলা যায় তাই বলল রিসেপশান থেকে।

'আচ্ছা ডাঃ সেনের প্রথম নাম কি?' দুম করে জিজ্ঞেস করে বসল সুলেখা।

আমাদের এখানে চারজন ডাঃ সেন আছেন আপনি কোন ডাঃ সেনের নাম চাইছেন? একটু ব্যঙ্গোক্তি করে পালটা প্রশ্ন করলেন এনকোয়্যারির মেয়েটি।

থতমত খেয়ে সুলেখা বলল, যিনি এইমাত্র ওটিতে গেলেন।

—ও, ওঁর নাম শ্যামল কান্তি সেন। সার্জেন।

এবার মিষ্টি হাসি দিয়ে বলল অনুসন্ধান অফিসের অন্য মেয়েটি।

—থ্যাংক ইউ—শুকনো হাসিতে বলল সুলেখা। তারপর আবার ফিরে এসে বেঞ্চিতে বসল। নামটা ভাবতে লাগল শ্যামল, কান্তি সেন। কে রে বাবা!

কোনদিন নাম শুনেছি বলেও তো মনে হয় না। অথচ যেভাবে এসে জিজ্ঞেস করল, তাতে তো মনে হয়...

ঘড়ির কাঁটা ঘুরেই যায় – ডাঃ সেন আর আসে না।

তবে যে আসে সে নরেন রায়। হাতে একটি থলে।

-- ও কেমন আছে জান? সুলেখা উঠে দাঁড়াল। অবাক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, সে কি, আপনি ওকে দেখতে যাননি এখনও? আমি তো এই এলাম। ভাবলাম আপনার কাছে ওর খোঁজ করব।

কম্পিত স্বরে নরেন বাবু বললেন, না, আমিও তো এই এলাম। অফিসে তো যেতেই হল একবার। এত কাজ বাকি পড়ে আছে। সকালে ফোন করেছিলাম, বলল, আগের চেয়ে ভালো আছে—সুলেখা বলল, চলুন ওপরে দেখে আসি।

ডাঃ সেনের পিছুটান রেখেই সে নরেনবাবুর সঙ্গে চলল শর্মিষ্ঠার ওয়ার্ডে। যাবার পথে আবার এনকোয়েরিতে বলে গেল, ডাঃ এস কে সেন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলে বলবেন আমি ওয়ার্ড থিুতে যাচ্ছি। আমার বন্ধু শর্মিলা সেন সেখানে ভর্তি আছে।

—কে এস কে সেন? প্রশ্ন করলেন নরেনবাবু।

—চিনি না, হঠাৎ দেখা হল, শর্মির কথা জিজ্ঞেস করতে বললেন পরে বলব। কথাটা সংক্ষেপে জানাল সুলেখা।

—হ্যাঁ—নরেন রায় বললেন, তোমার ঘরে বাজার রেখে এসেছি।

—ওমা, আপনি বাজার করতে গেলেন কেন! আমি মাসীকেই তো রান্নার ভার দিয়ে এসেছি। তার সঙ্গে দেখা হয়নি বুঝি আপনার?

—হ্যাঁ, হয়েছে। আমি বললাম, থাক সুলেখা এসে রাঁধবে খন। আর কথা হয়নি। পাগলের মতো ছুটে চলে এসেছি।

—আচ্ছা সে দেখা যাবে। ব্যাগে কি নিয়ে এসছেন? ব্যাগের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সুলেখা।

—কিছু ফল যদি খেতে পারে ভাল, নয়ত বলব অন্য রুগীদের দিয়ে দিতে। কত লোকই তো রুগীর পথ্য কিনতে পারে না। ব্যথাভরা

কণ্ঠে বললেন নরেনবাবু।

—এ হাসপাতালে তেমন রুগী পাবেন না। এটা বড়লোকের হাসপাতাল। হয়ত অল্পকিছু ফ্রি বেড আছে। কিন্তু তাই বলে—

মৃদু শব্দে হাঁটতে হাঁটতে ওয়ার্ডে পেঁৗছে গেল ওরা। সিস্টার জানাল আজও দেখা করা ছাড়া কথা বলা সম্ভব নয়—এখনও পেসেণ্ট অজ্ঞান।

শর্মিষ্ঠার চেহারা দেখে প্রাণ উড়ে গেল সুলেখার। অমন সুন্দর হাসি-খুশি মুখখানা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। একদিনের পাগলাঝড়ে সব সৌন্দর্য ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে। কপাল পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজে আবৃত। ভয়ত্রস্ত উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠল দেহটা। সাহস করে আর তাকাতে পারল না নরেনবাবুর দিকে। শর্মিষ্ঠার দিকে তাকিয়েই বলল, আমি এখন তাহলে যাই—আপনি পরে আমার বাড়িতেই আসবেন কিন্তু।

ঠোঁট কামড়ে কান্না সংবরণ করল সুলেখা। তারপর ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল। চোখ দুটো তখনো ছলছল করছে।

—এই যে, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। তুমিই শর্মিষ্ঠা সেনের খোঁজ করছিলে? তুমি বলেই সম্বোধন করলেন ডাঃ সেন।

থমকে দাঁড়িয়ে ছোট্ট রুমালটা চোখে মুখে বুলিয়ে নিয়ে সুলেখা বলল, হ্যাঁ। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ থেকে আওয়াজ বেরুচ্ছিল না। গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলল, আপনি কেসটা জানেন?

—সব জানি—তোমার নিশ্চয়ই কিছু খাওয়া হয়নি। কাম উইথ মি। সময় না দিয়ে নিজেই হনহন করে এগিয়ে গেলেন ডাঃ সেন। তাছাড়া একটা কৌতূহলও ছিল। আপত্তি করার মতো মনের অবস্থা ছিল না সুলেখার। তাই মোহমুগ্ধের মতো মায়ার জালে ভেসে চলল।

নিচের একটু ফ্লোরে ডাইনিং রুম। ডাঃ সেন ও সুলেখা মুখোমুখি বসল। সুলেখা চুপচাপ। ডাঃ সেন খানিকক্ষণ পরে একটু হেসে বলল, আমাকে নিশ্চয় চিনতে পারছ না। না মনে পড়ারই কথা। তবুও ভেবেছিলাম হয়ত চিনতে পারবে। কথা বলার মাঝখানে একজন টেবিল-বয় এসে দাঁড়িয়েছিল। সেন বললেন, এই হরি·· যা আছে নিয়ে আয়—

সুলেখা বাধা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ডাঃ সেন শুনলেন না। হরিকে যা বলার বলে দিয়ে জানালেন, ও হো ভুলেই গেছি শর্মিষ্ঠা সেনের কথাটা—

আকুল নয়নে তাকাল সুলেখা, হ্যাঁ, ও ভাল হয়ে উঠবে তো ? আচমকা প্রশ্নটা বেরিয়ে এল সুলেখার মুখ থেকে।

ঈষৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন ডাঃ সেন।—বলা মুশ্কিল-উদ্বেগজড়িত কণ্ঠে বললেন, কেসটা সিরিয়াস অ্যাণ্ড রেয়ার—সাব অ্যারাকনয়েড্ হ্যামারেজ—তার ওপর প্রেগ্‌নেন্সি—প্রগ্‌নসিস ভাল নয়। আমরা একটা ভেস্‌ল্ টাই করেছি কিন্তু আরও আনুরিজ্‌ম্ থাকতে পারে। যেমন ধর এই তোমার ব্রেইন—বলে পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে এঁকে কি কি কারণে হয়, কি হয়, কি চিকিৎসা সব ব্যাখ্যা করলেন ডাঃ সেন, অতি সরল ও সহজ ভাবে। সুলেখা কিছু বুঝল, কিছু বা বুঝল না। ততক্ষণে টোস্ট ডিমের পোচ ইত্যাদি দিয়ে গেল হরি।

—খাও, আচ্ছা শর্মিষ্ঠা তোমার কে হয় ?

খেতে খেতেই বলল সুলেখা সব কিছু।

—তা তুমি আমায় চিনতে পারলে না তো ? অবাক কণ্ঠেই বললেন ডাঃ সেন।

—চিনেছি, তবে—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল সুলেখা। ততক্ষণে তার আচমকাই মনে পড়ে গেছে ব্যাপারটা।

—নামটা মনে পড়ছে না···তাই তো ? তোমার দেওয়া নামটা বলব ? গোলআলু···আর তোমার নামটা পুঁটিরাণী যে দিয়েছিল তার নাম···

—মনে পড়েছে ফড়িং···ডাঃ সেনের কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে নিজেই বলে ফেলল সুলেখা। বাব্বা সে তো সেই কোন কালের কথা। তোমার চোখ আছে, অন্ততঃ কুড়ি বছর পরেও তুমি আমায় চিনতে পারলে ?

—তার কারণ তখন তোমার যা বয়স ছিল তার থেকে আমার আরও তিন বছর বেশি ছিল। তাই চিনেছি—। তাছাড়া সে জায়গা ছেড়ে তোমরা অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিলে। আমরা তো সেখানেই সেই স্মৃতিকে নিয়ে আরও অনেক বছর পড়েছিলাম। তাই তুমি আমাদের ভুলেছ কিন্তু

আমরা ভুলিনি—

অনেক দুশ্চিন্তা অনেক ব্যথা কষ্টের মধ্যেও পুরাতন স্মৃতির ঢেউ নতুন এক দক্ষিণা বাতাসের ঢেউ নিয়ে এল। নতুন মুকুলে ফুলে ফুলে ভরে উঠল পুরোনো স্মৃতির উদ্যানটা, মনের মধ্যে। সেই ছোটবেলার ছোট গ্রামের স্নিগ্ধ সবুজ সুন্দর জীবনটা ভেসে এল প্রাণের পটে।

সুলেখা মায়ের সঙ্গে মামাবাড়িতে এসে বছর দুয়েক থেকেছিল। সে সময় তার বাবা একটা ট্রেনিং-এ যায় বম্বেতে। সেখানে তার সঙ্গে না থেকে নিজের গ্রামে বাবা-মার সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে আসার জন্য সুলেখার মা গ্রামে গিয়েই থাকার প্রস্তাব করেছিলেন। সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিয়ে সুলেখার বাবা সেই ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই দুটি বছর গ্রামের স্কুলে পড়েছিল সুলেখা। তখনকার খেলার সঙ্গীরা তাকে হিংসাই করত শহরের স্মার্ট মেয়ে বলে। দেখতেও ভাল ছিল সুলেখা। ওই বয়সেই মনে হত বয়স যেন তার দু তিন বছর বেশি। ছেলেগুলো বড্ড দুষ্টু ছিল। তাদের একটা করে নামও বসিয়ে দিত সুলেখা। কারও ফড়িং, কারও গোলআলু, কারও বা ল্যাংচা। ফড়িংও ছাড়ার পাত্র নয় সে নাম দিল পাকা পুটুর মা। তারপর থেকে গ্রামে পুটু নামই হয়ে গিয়েছিল সুলেখার। বছর দু-এক পরে বাবা এসে নিয়ে গেল কলকাতায়। সেখান থেকে দুবছর অন্তর বদলী এখানে ওখানে। আর স্কুলের গণ্ডি শেষ হতেই বিয়ে। দেখতে সুন্দরী বলেই নাকি বরের বাড়ির লোক জোর করে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল। অতি সুন্দরীর পাত্র জুটেছিল ঠিকই, কিন্তু পাঁচ বছরও টিকল না। পদ্মকে বাবাই আবার ফিরিয়ে নিয়ে এল নিজের কাছে—কলকাতার বাড়িতে। বাবা তখন রিটায়ার করে এ-পুরোনো বাড়িখানা কিনেছিলেন।

অনেক স্মৃতির মধ্যে গ্রামের কথা মনেই ছিল না সুলেখার। অনেকদিন পরে যেন হারিয়ে যাওয়া হারের লকেটটি খুঁজে পেয়ে সেটি জীবনের সঙ্গে

নতুন করে জুড়ে দিল। মাঝেমাঝে মনে হত জীবনের মালার ছড়া থেকে কোথাও দু'একটি ফুল যেন ছিঁড়ে পড়ে গেছে। অমনিটি তো হয়ই। সময়ের সুতো বড় ধারালো।

আজ মুগ্ধ প্রশান্ত গভীর দৃষ্টিতে ডাঃ সেনের দিকে তাকিয়ে সেই মালাটিই যেন নতুন করে গেঁথে নিয়ে বড় তৃপ্তি পেল সুলেখা। ভাবনার রঙিন স্মৃতিতে বিভোর হয়ে রইল অনেকক্ষণ।

—চা খাও—এবার মনে পড়ছে তো? মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ সেন।

—হ্যাঁ, কিছু কিছু—দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাস ভাবে বলল সুলেখা।

—কোথায় আছ তুমি এখন? প্রশ্ন করলেন ডাঃ সেন।

—শিয়ালদার কাছেই। আসুন না একদিন গল্প করা যাবে বেশ।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব—তবে আর আপনি নয়—তুই বলতে দ্বিধা হলে আমার মতো তুমিই বল। স্মিতহাস্যে বললেন ডাঃ সেন।

—কাল আমি আসব শর্মিষ্ঠাকে দেখতে—আপনি এলে—সরি তুমি এলে তখন কথা হবে। আজ আমার তাড়া আছে একটু।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কাল আমার আউটডোর বারটায় শেষ হবে। তুমি এনকোয়েরিতে আমার কথা জিজ্ঞেস করলেই ডেকে দেবে। চল—গেট পর্যন্ত দিয়ে আসি তোমাকে। কি নাম ওই শর্মিষ্ঠা দেবীর স্বামীর?

—নরেন্দ্রনাথ রায়। আপনি প্লিজ একটু দেখবেন—ও স্যরি, তুমি একটু দেখ। আসলে তোমরা এত ওপরে উঠে গেছ যে 'আপনি' মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

—অস্বাভাবিক কিছুই নয়। মাঝে মাঝে দেখা হলে সে আড়ষ্টভাবটা চলে যাবে। ও জন্য স্যরি হবার কিছু নেই। কাল দেখা হবে।

মিষ্টি চাহনির বিনিময়ে আলতো হাসি হেসে বিদায় নিল দু'জন দুদিকে।

ডাঃ সেন অনেকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে শরৎ বোস রোডের সবুজ গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইলো। সেই সুলেখা, সেই পটুরাণী। কি ক্ষ্যাপাই না ক্ষেপে

যেত পল্টু বললে। শহর থেকে এসেই কেমন গেছো মেয়ে হয়ে অন্যের গাছের ফল চুরি করে খেত ওদের দলে পড়ে। ওদের দলে সেই ছিল বুদ্ধিদাতা। আর ফাড়িং ছিল হিরো। মোটাসোটা ছিল বলে ওর নিজের নাম ছিল 'গোল-আলু'। ছুটতে খুব পারত না। গ্রামের মিষ্টির দোকানের মালিকের ছেলে বলেই হয়ত একটু বেশি মোটা ছিল। তাই ওকে দলে নিতে চাইত না। জোর জার করে, কখনো অভিমান করে কখনও বা সন্দেশের লোভ দেখিয়ে খেলা ও ফলচুরির দলে ঢুকত। মাঝে মাঝে বাবার সন্দেশের প্যাকেট কিছু হাওয়া হত। আজ সেই ডাঃ সেন স্লিম টল অ্যান্ড হ্যান্ডসাম। কলেজ লাইফে উঠেই শরীরটা ঝড়ঝড়ে করে ফেলেছে—কম খেয়ে ও ব্যায়াম করে। সেই গজকচ্ছপ চেহারার ভেতর থেকে এক সুপুরুষ বেরিয়ে এসেছিল। এমনকি মিষ্টির দোকানের মালিক বাপও ছেলের চেহারার পরিবর্তনে বলেছেন, 'যাক বাবা ডাক্তার না হলেও ছেলেটার চেহারা পাল্টে গেছে কলকাতার হস্টেলে থেকে'। মা অবশ্য দুঃখ করে বলতেন, 'শহরের ভেজাল মিষ্টি খেয়েই সুন্দর স্বাস্থ্যটা একেবারে প্যাকাটি হয়ে গেছে। তুই বাবা বাড়ি এসে কিছুদিন থাক—গোল্লায় যাক পড়াশুনা। আগে শরীর পরে পড়া।' ছেলে বোঝাত, 'না মা, যত স্লিম তত কম অসুখ হয়। আর তারা ততদিন বাঁচে।'

মা বলত,—'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর ঠাকুরদা বেঁচেছে নব্বুই—তোর বাপ কোন রোগটাতে ভুগছে? আসলে কি জানিস—না খেয়ে বেঁচে থাকার কোনো দাম নেই। ওই হিমালয়ের সাধুগুলো ধ্যানেই জীবন কাটায়—আমার কাছে তার কোনোই মূল্য নেই। হাত আছে পা আছে—গতরটা নাড়িয়ে নে যতদিন পারিস তারপর তো ওই ধ্যানেই সমাপ্তি। না বাপু স্লিমের দরকার নেই—আমি চাই ননীচোরার মতো বেশ পেটটি নাদুস নুদুস থাকবে···'

মায়ের অবিশ্রান্ত জ্ঞান বর্ষণ মাথা পেতেই নিতেন ডাঃ সেন। সেও তো বেশ কিছু বছর আগেকার কথা। সে মাও নেই—বাবাও নেই। ছোটভাই বাপের মতোই স্বাস্থ্য করে মিষ্টি বেচছে।

বিলেত থেকে ফেরার পর ভাই তাকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারেনি। পরে সাদর অভ্যর্থনা করে হাউমাউ করে পা জড়িয়ে ধরেছে। কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে

এটাও বলেছে যে বাবা-মা কিছুই রেখে যায়নি। ভিটেও বহু পুরুষের ভগ্ন-দশা। বাড়িটা ছাড়া কিছুই নেই। ম্লান হাসি টেনে ছোট ভাইকে আশ্বস্ত করেছেন ডাঃ সেন। বলেছেন, আমায় একটু সময় দে খোকা—সব হবে। তুই বিয়ে করেছিস—দুটো বাচ্চা। বাবার এই দোকান ও বাড়ি সবই তোর। আমি ডাক্তার যখন নিজেকে ঠিকই চালিয়ে নিতে পারব—

সাহায্য করার বন্ধু না থাকলেও হুল ফোটাবার ও ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাবার মত শত্রুদের অভাব নেই এদেশে। দু'একদিনের মধ্যেই কানে উঠল ছোট ভাই খোকা তার স্ত্রীর নামে বিরাট নতুন বাড়ি করেছে, মাইল দুই দূরে—তাছাড়াও জমি-জমাও কিনেছে। আপন গুণে ক্ষমা করেছেন ডাঃ সেন। না করে ও ঝামেলার মধ্যে যাবার মতো মনের অবস্থা তার নেই। তাছাড়া বিদেশে অনেক-দিন থাকার পর দেশের মানুষের ওপর একটা সহজাত স্নেহ-ভালবাসার মৌচাক ভেতরে গড়ে ওঠে। যদিও আবার কিছুদিন থাকার পর ওই মৌটুকু উবে গিয়ে মৌমাছির হুল বিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট্ করতে হয় অনেকদিন। বিদেশের ক্ষণপ্রভা দেশে ফিরে আঁধারে চোখ ধাঁধিয়ে সাময়িক অন্ধ করে ফেলে। যে সব ডাক্তার মাস্টার মহাশয়দের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, তাদের অনেককেই মনে হল স্বার্থান্ধ ও নীচমনের। সাহায্য তো দূরের কথা, কি করে অন্যের গুণকে ছোট করবে, বদনাম করবে, তার জন্যই যেন উঠে পড়ে লেগে থাকে। ছাত্রদের ওপরে তুললে তারা যে আরও শ্রদ্ধা পাবেন তা তারা ভুলে যান। ভাবেন, এ আমার পশার নষ্ট করবে। যিনি অধ্যাপক তিনিও অর্থের জন্য দিবারাত্র ছুটছেন। যার এক জায়গায় অ্যাটাচ্মেণ্ট থাকলেই যথেষ্ট, তিনি দশ জায়গায় টুটু করে ছুটে বেড়াচ্ছেন। ক্ষুধার যেন শেষ নেই।

সব মিলিয়ে এক বছরেই মনে হল এ স্বার্থময় পংকিল পশ্চিমবংগের স্বাস্থ্য দপ্তর ও তার চারদিককার প্রাইভেট হাসপাতালগুলোয় এতই দুর্নীতির রাজত্ব যে এখানে বড় হওয়া দূরের কথা বেঁচে থাকাই অসম্ভব। তবে কি তার মতো শিক্ষিত ডিগ্রিধারীরা এসে ধীর পায়ে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না ? অনেকেই সুখে চালিয়ে যাচ্ছে। তারাও ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ। কিন্তু তাদের অনেকের মামা বাবা শ্বশুরের জোর। ক্যাচ্ ঘুষ, মোসাহেব--ডাক্তারী ডিপার্টমেন্টেও

যে কত নোংরা নীতি চলছে তা অবিশ্বাস্য। নিয়ম কানুন সহজেই সহজ করা যায়, কিন্তু সহজ করলেই মুস্কিল। রাইটার্স বিল্ডিং-এর ধারে কাছেও যাননি এখনও ডাঃ সেন। ওখানে নাকি কেরানী সম্রাটরা ডাক্তারদের প্রশ্ন করেন, ডাক্তারী বিষয়ে। আর তার পাশে বসে তা শ্রবণ করেন অত্যন্ত নামকরা কলকাতার 'ডাক্তার মাস্টার মহাশয়রাই'। শুনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেছে ডাঃ সেনের। তাই যতদিন 'পুল অফিসারের' পোস্টটা আছে ততদিন আত্মসম্মানটা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। তাও সব জায়গায় পারছেন না। মাথা নত করে থেকেও, শান্ত ভদ্র থেকেও দেখেছেন—যারা সম্মানিত তাদের 'সম্মানের চাহিদার' শেষ নেই। একবার বড় হলে সবাই তাদের পায়ে এসে পড়ুক এ যেন তাদের কাম্য! এরাও যে এইভাবেই বড় হয়েছে।

এক বছরেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন বেচারা ডাঃ সেন। অথচ বড়ই গর্ব ছিল নিজের দেশে সে বড় সার্জেন হবে। খেয়াল নেই সময় পাল্টাচ্ছে—বয়স বাড়ছে। পেছনের সাত আট বছরে তার মন একদিকে দৌড়ে গেছে—আর কলকাতাবাসীর মন গেছে অন্যদিকে। এ ব্যবধান খুব কম নয়। তাকে মেনে নিতে যে ভাগ্যের দরকার অর্থাৎ শ্বশুর বা বাবার পসার—তাও তার নেই। এ যেন রকেটে কোন গ্রহে গিয়ে আবার ফিরে আসা—তার মধ্যে পৃথিবীর হাজার বছর পেরিয়ে গেছে। তাই নাকি টাইম অ্যান্ড স্পেস্ থিওরীতে হয়।

তবুও দাঁত মুখ বুজে পড়ে আছেন ডাঃ সেন। আর একটা বছর দেখা যাক। তারপর না হয় দেখা যাবে। ভাবতে ভাবতে নিশ্চুপ বসে থাকেন ডাঃ সেন।

পরের দিনও শর্মিষ্ঠার বেঁচে থাকা না থাকার বোঝাপড়ার মধ্যেই ব্যস্ত হয়ে রইল। দেহ থেকে সমস্ত সৌন্দর্য এর মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে। তাকানো যায় না সেদিকে। সুলেখার রক্ত যেন হিম হয়ে গেল। নরেনবাবু আজ আর চোখের জল বইতে পারলেন না। ওয়ার্ডের বাইরে এসে সুলেখার সামনেই

বড় বড় রক্তচক্ষু করে তাকালেন। তার পরই টস্‌ টস্‌ করে উত্তপ্ত অশ্রু ঝড়ে পড়ল। সুলেখা হাত ধরে ওয়েটিং রুমে নিয়ে বসাল নরেনবাবুকে।

—আপনি ধৈর্য হারাবেন না, এসময় শক্ত না হলে চলবে না। ভাগ্যে যা আছে তা তো হবেই।

আর বলতে পারে না। দুজনেই চোখের জল ফেলে। গম্ভীরভাবে নরেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন, আমার কিছু কাজ আছে—সেরে আবার আসব। তুমি বরং বাড়িই চলে যেও।

—ঠিক আছে। আপনি কিন্তু সন্ধেবেলা চলে আসবেন। চোখ মুছতে মুছতে বলল সুলেখা।

...., ছেলেটার জন্য আমার আরও কষ্ট—প্রাণপণে নিজেকে চেপে দ্রুত-পায়ে বেরিয়ে গেলেন নরেনবাবু।

সুলেখা বসে ভাবল। এই তো জীবন! অল্প সংখ্যক মানুষের জীবনে এ রকম ঘটনা ঘটে বলেই দুর্ঘটনা, ভাগ্য, পাপের ফল, নিয়তি ইত্যাদি কত ভাবেই বাকি অনেকে সান্ত্বনা পেয়ে ভেসে চলে তাদের নিয়তির স্রোত বেয়ে। পুণ্য দিয়ে অর্থ-বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান, এমনকি সারা জীবন উপাসানা করলেও এই ভাগ্য বা নিয়তির হাত থেকে ছাড়া পাবার উপায় নেই। জন্ম থেকেই আমরা এই শিকলে বাঁধা। পৃথিবী প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে যেমন আমরা অনুভব এমন কি কল্পানও করতে পারি না তেমনি এই নিয়তির শিকল বিশ্বাস করেও আমরা অনেকেই তাকে ভুলে বসে থাকি। ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও কল্পনার প্লাস্টার দিয়ে জুড়ে যাই ব্যথার ফাটলগুলো। প্রচণ্ড ব্যথা কষ্ট শোক তাপের মধ্যেও একটা সুদিনের রশ্মি অদৃশ্য প্রাণের মধ্যে জ্বলে ওঠে।

—আরে তুমি এখানে বসে, তোমাকেই তো খুঁজছিলাম আমি—এক রকম হাঁপাতে হাঁপাতেই বললেন ডাঃ সেন।

চমকে উঠলো সুলেখা। চট্‌ করে ভাবনার জাল থেকে ছিন্ন করে নিজের মধ্যে নিয়ে এল মনটা। ম্লান একটা হাসি টেনে বলল, শমিকে খুব একটা ভাল মনে হল না। আপনি তো ওর আসল রূপটা দেখেন নি। ও একাই একটা বসন্ত কাল ছিল. হঠাৎ অসময়ের তীব্র শীতে দুদিনেই ওর সব কিছু

শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ওর দিকে তাকান যাচ্ছে না। আবার বুকের মধ্যে মেঘের গর্জন। বুকটা ভেঙে চুরে যাচ্ছে। ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সংবরণ করল। ডাঃ সেন মেঝের দিকে মাথানত করে তাকিয়ে সায় দিয়ে বললেন, জানি, কিন্তু করার কিছুই নেই। ব্রেনের হ্যামারেজটা বন্ধ হলেও যে জায়গায় হয়েছে তাতে বেঁচে যাওয়ার চান্স খুব কম। প্রেগনেন্ট বলে প্রবলেমটা আরও বেশি। দেখা যাক কি হয়। চল একটু ঘুরে আসি তাহলে মনটা একটু হাল্কা হবে তোমার।

—চলুন অস্ফুট কান্নাভেজা গলায় বলল সুলেখা।

—না, চলুন নয়—বারণ করেছি না—

—ওহো স্যরি।

ডাঃ সেনের গাড়িতে উঠে চুপচাপ বসে রইল সুলেখা, বাইরের দিকে তাকিয়ে। এক সময় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে এসে থামলেন ডাঃ সেন।

—চল একটা ছায়ায় গিয়ে বসি। তোমার যদি আপত্তি না থাকে।

—নানা আপত্তির কি আছে—চলো। মৃদু হাসি দিয়ে বলল সুলেখা। চোখে মুখে তখনও বেদনার উদ্বিগ্ন আকুলতা।

দুজনে গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর বাদাম নিয়ে বসল।

"বল—গ্রাম থেকে হারিয়ে কোথায় তুমি গেলে।" একটু পরিহাসের স্বরে বললেন ডাঃ সেন।

—গ্রাম থেকে তো হারিয়ে যাইনি বরং গ্রামেই হারাতে গিয়েছিলাম। সত্যিই অপূর্ব সুন্দর ছিল ওই দুটো বছর। কিন্তু অনেক আবর্জনার ভিড়ে ওই দুটি মিষ্টি বছরই আমার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে হয়ত কোন দিনও ও দুটো বছরকে খুঁজে পেতাম না।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আফশোসের সুরেই বলল সুলেখা।

দেখ তাতে অবশ্য তোমার কোন দোষ নেই। কত আর বয়স ছিল তখন তোমার—ও বয়সে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে করে বন্ধু পেয়ে পুরোনো দিনের কথা ভোলাটা অসম্ভব কিছু নয়। তোমার দাদুরা যদি ওখানেই থাকতেন,

তবে ভুলতে পারতে না—কিন্তু ওরাও তো বছর খানেক পরে গ্রাম থেকে চলে গেলেন। আমরা কিন্তু তোমার কথাবার্তা, মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগ সব নিয়ে অনেকদিন ধরেই আলোচনা করে গেছি।

হাসিমুখে শুনছিল সুলেখা। মনের কালো মেঘটা কখন যে শরতের বাতাসে উঠে গেছে খেয়াল নেই। বাদামী মুখে রক্তের প্রলেপ পড়তে লাগল ধীরে ধীরে। ডাঃ সেনও অনেকদিন পরে সুলেখার দেখা পেয়ে যেন পুরোনো দিনে ফিরে গিয়ে ছেলেমানুষ হয়ে উঠলেন। হেসে, হাত নাড়িয়ে মাথা দুলিয়ে সেই গ্রাম্য জীবনের সরল সুন্দর স্মৃতিগুলোকে জলপদ্মের মতোই আলতো করে আঙুল দিয়ে পাঁপড়িগুলোকে খুলে খুলে ফোটাতে লাগালেন। আর সুলেখাও হারানো স্মৃতির ঝুড়ি সাজিয়ে সাজিয়ে রাখল। শুধু সাজানোই নয়, আস্তে আস্তে তা দিয়ে যেন মালা গাঁথতে শুরু করল।

কিন্তু তাও বা কতক্ষণ। একটু পরেই আবার ধড়মড় করে উঠে পড়ল সুলেখা।

— এই যাঃ অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমাকে যে এখুনি উঠতে হবে—

—এখুনি উঠবে ?

—হ্যাঁ, একটু কাজ আছে যে—

—ঠিক আছে তবে যাই চল। ভীষণ ভাল লাগল তোমাকে নতুন করে পেয়ে।

—আমারও খুব ভাল লাগছে।

—তা হলে দেখা হচ্ছে কবে ?

সুলেখা মৃদু হেসে বলল, আমি কালও হাসপাতালে যাব, যদি—

—কাল অবশ্য আমার অপারেশন থিয়েটার। তুমি এক কাজ কর না—

কি ?

— এই শনিবার তোমার ফ্যামিলি নিয়ে এসো না আমার ফ্লাটে। বেশ একটা পার্টি হয়ে যাবে।

সুলেখা হঠাৎ চুপ করে থেকে তারপর বলল, ও হোঃ - এই দেখ শুধু নিজের কথাই বলে গেলাম। তোমার কথা তো কিছুই শোনাই হল না।

হেসে উত্তরটা দিলেন ডাঃ সেন, এলেই জানতে পারবে। এই আমার কার্ড।

আর কোন কারণে যদি শনিবার আসতে না পার তবে একটা ফোন করেই দিও। বাড়ির ফোন ওই কার্ডেই পাবে। আচ্ছা তুমি কোথায় আছ এখন?

—আমি? প্রাচী সিনেমার পাশেই থাকি।

—চল, আমি নামিয়ে দিচ্ছি—

—না না তুমি যাবে এদিকে, আর আমি ওদিকে—হাত দিয়ে এদিক ওদিক দেখিয়ে বলল সুলেখা, এই তো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে আমি ট্যাক্সিই নিচ্ছি একটা। পরের দিন না হয় তুমি লিফট্ দিও। একটা কথা আমরা গেলে তোমার স্ত্রী কিছু মনে করবে না তো?

—মনে করলে তো ভালই। একটু বেশি আদর পাব—চোখের কোন দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন ডাঃ সেন।

সুলেখার মনটা ততক্ষণে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। সে বুঝল, পাড়া গাঁ-র সরল সহজ শান্ত কোমল দিনগুলো দুজনকেই আবার অল্প সময়ের জন্য হলেও সেই স্নিগ্ধ পরিবেশেই ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে ডাঃ সেন বললেন, তোমার হাতটা দাও তো।

সুলেখা চমকে উঠল। মুহূর্তেই দেহের সমস্ত রক্ত যেন ছলকে উঠে মুখ চোখে ছড়িয়ে পড়ল।

—আহা দাও না। দেখি একটা জিনিস—

একটু ইতস্তত করে হাতটা তুলে এগিয়ে দিতেই হাতটা চেপে উল্টে দেখলেন ডাঃ সেন।

সুলেখা জিজ্ঞেস করল, তুমি হাত দেখতে পার নাকি?

— হ্যাঁ, তা পারি। তবে হাত দেখে ভবিষ্যতের কথা জানাতে পারি না। বলতে পারি অতীতের কথা। এই তো···এই যে পেয়েছি—দেখি দেখি—

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হাতের উল্টোদিকে তীব্র গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখছিলেন ডাঃ সেন। একটু হেসে পরে বললেন তোমার হয়ত মনে নেই। চৈত্র মাসে টক কুড়ি আম ছুলতে গিয়ে তোমার কেটে গিয়েছিল। ফড়িং তখন ছুটে গিয়ে আইডিন এনে লাগিয়ে দিয়েছিল আর তোমার সে কি প্রচণ্ড নৃত্য! আজও মনে পড়লে হাসি থামাতে পারি না।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়ছে। বাবাঃ যা জ্বালা করছিল—জান তারপর থেকে জীবনে আমি ও টিনচার আইডিন ছুঁইনি।

মনের ভেতরটা খুবই আর্দ্র হয়ে উঠল সুলেখার। ছোটবেলার খেলার সাথী হলেও বিলেতের ডিগ্রিধারী শ্যামল (গোলআলু ভাবতে তো ভয়ই হয়) তার কথা এত নিবিড় ভাবে মনে রেখেছে ভেবেও পুলকিত হল মনটা। নিজে যে তার একবিন্দুও মনে রাখেনি তার জন্য খুবই খারাপ লাগল। মাঝের বহুবছরের ব্যবধানই হয়ত স্মৃতিকে সুমধুর করেছে।

হাঁটতে হাঁটতে গেটের বাইরেই চলে এসেছিল, শ্যামল সেন বললেন, তুমি কিন্তু খুবই সুন্দরী ছিলে—

—তাঃ মানে কি এখন আমি কুৎসিত? —আদুরে গলায় প্রশ্ন করল সুলেখা। স্বরে অনুরাগের ক্ষোভ!

—না না, তা বলিনি। তখন গ্রামে তোমার রূপ নিয়েই তো সবাই অস্থির। আমাদের চোখেও কিন্তু তুমি দারুণ ছিলে।

সন্ধ্যার পরে নরেনবাবু এলেন। শর্মিষ্ঠা এখন আগের চেয়ে ভাল আছে একটু। ডাক্তাররা আশা করছেন কয়েকদিনে আরও ভাল হয়ে উঠবে।

একমুঠো ফুলের মত হাসি ছলকে বেরিয়ে এল সুলেখার অন্তর থেকে। কোথা থেকে অকস্মাৎ নববসন্তের উচ্ছলতায় সারা দেহ মন তৃপ্তিতে ভরে উঠল। অন্দর মহলের সিন্দুকের ডালা আলগা হয়ে অফুরন্ত আনন্দের ঢেউ আছড়ে পড়ল চোখে মুখে।

—শান্তি পেলাম নরেনবাবু। ভীষণ ভাল লাগছে। সকালে ওকে দেখে বুকটা ছিঁড়ে পড়ছিল—বাষ্পাচ্ছন্ন চোখদুটো শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছল সুলেখা। চোখ দুটো উষ্ণ আবেগে রক্তিম হয়ে উঠল। জ্বলজ্বল করে উঠল মুখখানা। নরেনবাবু ম্লান হেসে বললেন, খুব ভয় পেয়েছিলাম। দুর্ভাগ্য যখন আসে তখন প্লাবনের মতই সব তছনছ করে দিয়ে যায়। ডাক্তাররা আশা দিলেও আমার এখনও উৎকণ্ঠা যায় নি। সবই ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে বসে আছি।

—তা ছাড়া উপায় কি বলুন। তবে আমার মনে হয় ও শিগগিরই ভাল হয়ে উঠবে। সমরের জন্য কোন চিন্তা নেই আপনার। ও এখানে ভালই আছে। তবে কাল আমি অফিসে যাব ; হাসপাতালের খবর আপনার কাছ থেকেই নেব।

আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম। তুমি এদিক সামলাও—সেটাই যথেষ্ট। আমি তো ছুটি নিয়েইছি—তুমি ছুটি নষ্ট করো না।

—না, না আমি কাল না গেলেও, পরশু নিশ্চয়ই যাব। শমিকে না দেখলে আমার মনটা সারাক্ষণই ছটফট করবে।

—হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই—তোমরা এত বন্ধু দুজনে- র্ঘশ্বাস ফেলে কাঁপা গলায় বললেন নরেনবাবু।

একটু পরে দুজনেই ভারাক্রান্ত মনে পরের কয়েকদিনের রুটিন ঠিক করল। নরেনবাবুকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। উদ্বেগ ও আতংকেব ছায়াটা আলতো হয়েছে অনেকটা।

খানিক পরে পদ্ম ও সমরেশকে আদর ও গুড নাইট জানিয়ে বিদায় নিলেন তিনি। যাবার সময় অত্যন্ত আবেগে বললেন, সত্যি তুমি না থাকলে যে কি হত জানি না সুলেখা। তুমি খুবই শক্তি যুগিয়েছ এ সময়। নয়ত আমি ভেঙেই পড়তাম।

—না, না কারও জন্য কিছু আটকে থাকে না নরেনবাবু। সংসার চলছে, চলবে। আপনজন থাকে বলেই বাঁচাটা সুন্দর ও সহজ—কোমল কন্ঠে বলল সুলেখা।

—সেই আপনজন পাওয়াটাই তো ভাগ্যের কথা। রক্তের সম্পর্ক থাকলেও সে আপন পরের চেয়েও পীড়াদায়ক হতে পারে।

—তা তো পারেই, সে যাক গে আপনি সাবধানে থাকবেন। এখন আপনার ঠিক থাকাটাই একান্ত দরকার।

আচ্ছা সুলেখা—চলি—

নরেন রায় চলে যেতে অনেকক্ষণ সুলেখা বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল আনমনা হয়ে। অনেকগুলো ভাবনা ও স্মৃতি এসে যেন মানসপটে অস্থির

হয়ে মাথাকুটে মরছে। সব কেমন এলোমেলো। কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছে আজ। তবু সেই অবস্থায় উঠে সুলেখা তার রাতের কাজ শেষ করল। সারাদিনের কর্মক্লান্ত সমর ও পদ্ম দুষ্টুমি করতে করতেই কখন যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তড়ি ঘড়ি করে খাওয়ার পাটটা শেষ করল সুলেখা। তারপর একটা বই নিয়েই বসে পড়ল। কিন্তু পড়বে কি, বারবার মনে ভেসে উঠছে পেছনের ছবি। যেন সিনেমা দেখতে বসেছে ভিডিওতে। নিজের মানসপটটি ভাল করে মুছে নিয়ে এরপর শুরু করল সে ভাবতে। শহরের মেয়ে গাঁয়ে এসেছে। প্রথম দু'চারদিন বিভিন্ন অসুবিধা তারপর জ্বর সর্দি কাশি। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব! স্কুল মাঠ পুকুর সব যেন ছুটে এল। বাঁশবাগান আমবাগান—সবুজের ঘটা। সেই ধানক্ষেত ছোটাছুটি পুজো পার্বণ। মাঝে মাঝে অবাক হয়েই নিজেকে প্রশ্ন করল কী করে ভুলল দিনগুলো! তারপরই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান—কোথাও ছ'বছর খানেক কোথাও দু'তিন বছর। চার পাঁচ জায়গায় ঘুরে বেড়াবার পর বিয়ে—সন্তান, অঘটন। সমস্ত অতীতটা যেন মুহূর্তেই অন্ধকারের অতলগর্ভে পড়ে তলিয়ে গেল। তবু এরই ভেতরে ভাগ্যের বৃশ্চিকদংশনে ক্ষতবিক্ষত প্রাণটায় আরামের প্রলেপ দিয়েছিলেন বাবা। বাঁচার আশা দিয়েছিল পদ্মর উপস্থিতি। একসময় সে ব্যথা বেদনা দুঃখ শোকও সহনীয় হয়ে উঠল! মাঝে মাঝে স্ফুলিঙ্গের মত ক্ষত করা ছাড়া প্রায় সয়েই গেছে এই গতানুগতিক চলমান জীবনটা।

ভাবতে ভাবতে সুলেখার অবাক লাগে। মনটা তার মুহূর্তেই কতদূরে চলে গেছে। অনেক যুগ পরে সেই গোলআলু, ফড়িং, মিতা, ছন্দা, ব্যাঙ, পটল, সুন্দরী, নোয়া কাকা, রাঙা জ্যাঠা, বাঁকা দাদু মঞ্জুরী মাসী, কিরণ পিসি ...অনেকেই পর্যায়ক্রমে এসে হাজির হয়েছে মনের পর্দায়। এখন তাদের কেউ আছে কেউ বা নেই। যে আছে সেও যেমনটি ছিলেন তেমনটি আর নেই। গোলাআলুকে আজ তা বলাও যায় না—ভাবাও যায় না। সে এখন বিলেত ফেরৎ এক সার্জেন ডাক্তার শ্যামল কান্তি সেন। নামের শেষে ডজনখানেক অ্যালফাবেটের রতনমালা।

কতক্ষণ বুকফাটা নিঃশব্দ ব্যথা ক্ষরণের পর যে ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল

নেই সুলেখার—খেয়াল হল সমরেশ ও পদ্মর চেঁচামেচিতে। ঘুম ভাঙল তখনই। বুকটায় তখনও একটা যন্ত্রণার পাথর যেন চেপে বসে আছে।

আয়নার সামনে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিজেকে আনমনা দেখছিল সুলেখা। অনেকদিন যেন নিজেকে সে দেখেনি দীর্ঘছন্দময় দেহে আলতো মোলায়েম মাখনের ঢেউ। মুখটা যেন ঝলসে গেছে কয়েক বছরের রূঢ় বাস্তবের দহনে ও অযত্নে। আজ অনেকদিন পর বোরোলিনের সঙ্গে একটু পাউডার মিশিয়ে মুখটায় ভাল করে মাখল। চুলটা শক্ত করে বেঁধে—শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুখখানা ও গ্রীবা ভালো করে ঘষল সুলেখা। বাদামী রঙ ভেদ করে একটা রক্তিম আভা ফুটে বেরোল।

এই সেই আমি! প্রথম যৌবনে ফেটে পড়া পলাশগুচ্ছ। বিয়ের সাজে সুলেখাকে বর বলেছিল, তুমি নারীই শুধু নও—তুমি যৌবনের জ্বলন্ত মশাল। তোমার রূপ তোমাতেই সীমাবদ্ধ নেই, চারদিক আলোয় আলোয় ভরিয়ে দিয়েছে। দেখ এই মশালে আবার আগুন না লেগে যায়!

ভগবান তার হোমশিখা আমার হাতে তুলে দিয়েছেন তার সৃষ্টিযজ্ঞের উপাসনা করতে। আধারে আগুন লাগে না আমি তো ওই যজ্ঞের আধার মাত্র!

যৌবনের অফুরন্ত আবেগে সৃষ্টিসুধা কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। ভালবাসার দুরন্ত আবেগে দুটো প্রাণ মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এক সময় সে মায়াজাল ছিন্ন ভিন্ন করে সর্বনাশা যমলোকের বন্যা সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কৌতুকী ঈশ্বরের মহাপ্রলয়ের বিদ্রূপে বিস্মিত সুলেখা স্তব্ধ হয়ে শুধু চেয়ে রইল।

সে যে কী নিদারুণ অপমান, কী আত্মঘৃণা আত্মদংশন লোকলজ্জা, ও উৎকণ্ঠা—সে বিদ্যুতের অবিশ্রান্ত আঘাত আজও মনে পড়লে দেহমন জ্বলে ওঠে সুলেখার।

সে জ্বলন্ত মশাল কথাটাই হয়ত সব জ্বালিয়ে ছারখার করে দিল। এক নিমেষে মশাল দপ্ করে নিভে দুর্গন্ধময় আঁধারে ফেলে দিয়েছিল সুলেখাকে। আজ সে অন্ধকারেও বেঁচে থাকতে শিখেছে। ওইটুকুই যথেষ্ট।

পদ্মর দিকে নিবিড় করে তাকাল সুলেখা। মেয়েটাকে লেখাপড়ায় ভাল করতে হবে। সারাদিন খাটাখাটুনির পর তার আর ধৈর্য থাকে না ওকে নিয়ে পড়াতে বসতে। মনে মনে চিন্তা করল, কি করা যায়। তখনই মনে পড়ল অংশুমানের কথা। পদ্ম ক্লাস সিক্সে পড়ে। অংশু নাইনে। সুলেখার ধারণা গোল্ড মেডালিস্ট শিক্ষকের কাছে থেকে যে পড়াশুনা করছে ও, পড়াশুনায় ভাল, সেই হয়ত ভাল শেখাবে।

সেই সন্ধেবেলায় ফিরে এসেই অংশুকে ডাকল সুলেখা। চুপিচুপি বলল, অংশু তুই বাবা পদ্মকে একটু পড়া— হাত খরচ দেব। কাউকে বাড়িতে বলিস না—বলবি ও পড়তে চায়—বুঝতে পারছে না তাই একটু দেখিয়ে দিচ্ছি—

অংশু রাজি হল। আসলে বাড়িতে বললে সুলেখা জানে, অংশুর বাবা মা নিশ্চয়ই রাজি হবে না। তবে পরে কখনো ওর বাবা-মাকে জানাবে ভাবল সুলেখা।

অংশুর খুব ভাল লেগেছিল। কাউকে সে পড়াবে তা কল্পনাও করতে পারেনি। তার ওপরে সুলেখার অ্যাড্‌ভান্স টাকা পেয়ে আনন্দ আর ধরে না। সে পড়াশুনায় খুবই ভাল। ফার্স্টই হয় সব সময় ·কখনও সেকেন্ড। তাই বাড়িতে কেউ তার পড়ার খবরও রাখেন না।

পদ্ম প্রথমটা একটু আপত্তি করেছিল। অংশুদা ভীষণ গম্ভীর—ওকে তার ভয় করে। পরে অনেক বুঝিয়ে রাজি করেছিল সুলেখা। কয়েকদিন পর অবশ্য অংশুর মা-র সঙ্গে দেখা করেও মত নিয়েছিল সুলেখা।

বেশ কয়েকদিন আর হাসপাতালে যায়নি সুলেখা। কিন্তু কেন যে যায়নি তার শতযুক্তি শতভাবে নরেনবাবুকে দিলেও নিজের মনে কোথায় একটা ফাঁক থেকে গেল। আনন্দের ঝড় সকলের শোভা পায় না, সবার মানায় না—অনেকের সহ্য হয় না। ওটা যেন চিংড়ি খেয়ে অ্যালার্জীর মতোই আত্মঘাতক হয়ে আসে।

ডাঃ সেন কিন্তু কিছু একটা আন্দাজ করেছিলেন। শর্মিষ্ঠা অনেকটাই

ভাল হয়ে উঠেছে, যদিও পা দুটো তখনও বিশ্বাসঘাতকের মতো অচল অটল। অবশ অসাড় পাদুটোর দিকে তাকিয়ে ভয়ে আঁৎকে ওঠে শর্মিষ্ঠা। ডাক্তার আশ্বাস দেন, সময় লাগবে তবে আশা করা যায় ঠিক হয়ে যাবে। তাদের আশায় আশ্বান্বিত হয় না শর্মিষ্ঠা। গভীর উৎকণ্ঠায় পাংশু মুখ করে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে স্বামীর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে। ডাঃ সেন প্রতিদিনই কয়েক বার করে এসে দেখে গেছেন। সাহস ও মনোবল ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছেন। এমন একজন হাসপাতালে জানাশোনা থাকলে যে কি প্রচণ্ড শক্তি বাড়ে তা বুঝেছেন নরেনবাবু ও শর্মিষ্ঠা। কিন্তু ইচ্ছে করেই তারা সুলেখা প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলেছেন গত কয়েকদিন।

কিন্তু শ্যামল সেন সেদিন নিজেই যেচে বলল, চলুন আজ আপনাকে পৌঁছে দেব আমি। আমি নর্থ ক্যালকাটার দিকেই যাচ্ছি।

না করার মত মনের অবস্থা ছিল না নরেনবাবুর। এই ডাক্তারবাবু ভগবানের মতোই তাদের সাহায্য করেছেন। তাছাড়া নরেনবাবুর ঔৎসুক্য ানায় কানায় উপচে উঠেছিল এই ভেবে কেন ডাঃ সেন এতটা করছেন। ুলেখার মুখেও আর ডাঃ সেনের কথা না শুনে নরেনবাবুর কৌতূহল তীব্র হয়ে ঠেছিল। কিন্তু তা আর ভাবনার অবকাশ পায় নি। তাই আশ্বান্বিত য়েছিলেন হয়ত সুলেখা ও ডাঃ সেনের সম্পর্কটা জানা যাবে। অজানা সম্পর্ক ানার আগ্রহ সবারই ভেতরে ভেতরে থাকে।

ডাঃ সেন আপন মনেই গাড়ি ছোটালেন। একটু পরে গাড়ি ছুটল গঙ্গার কে। ডাঃ সেন বললেন, আপনি নিশ্চয়ই খুবই ক্লান্ত। চলুন কয়েক মিনিট ঙ্গার পার দিয়ে হেঁটে একটু মুক্ত বায়ু সেবন করে আসি। মনটা ভাল াগবে।

—চলুন—আমার আর আপত্তি কি। আপনার মত জ্ঞানী-গুণী াক্তারের পাশে বসে যাচ্ছি তাতেই আমি কৃপাধন্য। কৃতজ্ঞতায় আমি আকণ্ঠ িমজ্জিত; তাই স্বর বেরুচ্ছে না—সঙ্কুচিত আর্দ্র কণ্ঠে বললেন নরেনবাবু।

—কি যে বলেন। ডাক্তার তার কাজ করে, এটা তার কর্তব্য। জানা-াানা বলে আপনজনের মতো বার কয়েক আপনার স্ত্রীকে 'হ্যালো' বলেছি।

অন্য রুগীর চেয়ে আলাদা কিছু করিনি। এতে কৃতজ্ঞতার কিছু নেই। সমাজে যে যার কাজ করে চলেছে। সবাই মিলে সবাইকে সাহায্যের জন্যই তো সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। এতে আপনার অস্বস্তির কিছু নেই।

—না-না—অস্বস্তি কেন! আমরা সাধারণ ক্ষীণজীবী আপনাদের মতো গণ্যমান্য লোকের সান্নিধ্যে এলে স্বস্তিই পাই। তবে বেশি প্রত্যাশা করে ফেলি—সেই ভয় হয়। আমি শমির ব্যাপারে আশাহীন হয়ে পড়েছিলাম, ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে গিয়েছিল—ভীত কম্পিত স্বরে বললেন নরেনবাবু! জানলার বাইরে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার বললেন, ছেলেটার জন্যে আরও কষ্ট।

—ক'টি ছেলেমেয়ে আপনার—কথা চালিয়ে যেতে যেতে প্রশ্ন করলেন ডাঃ সেন।

—ওই একটাই ছেলে, সবে ধন নীলমণি। নাম অবশ্য সমরেশ। মায়ের চোখের মণি।

—হ্যাঁ, তা তো হবেই। আপনার চিন্তা নেই উনি ঠিক হয়ে যাবেন। তবে পায়ের প্যারালিসিসটা ঠিক হতে সময় লাগবে। হয়ত অবশ ভাবটা অনেক দিনই থাকবে—চিন্তিত গম্ভীরভাবে বললেন ডাঃ সেন।

—তা থাক। প্রাণে বেঁচে আছে—ওতেই আমি খুশি। বড্ড ভেঙে পড়েছিলাম। আপনি আর সুলেখা না থাকলে আমি হয়ত পাগলই হয়ে যেতাম।

বাইরের দিকে তাকিয়ে চোখের জল মুছলেন নরেনবাবু। অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে মৃদু হাসলেন। বললেন, কিছু মনে করবেন না রুগী আর নিজের স্ত্রীতে যে কত তফাৎ তা তো আপনি নিজেও জানেন।

—না, তা জানি না। আমি এখনও বিয়ে করিনি—স্মিত হাস্যে গর্বিত ভাবেই বললেন ডাঃ সেন।

—ও তাই নাকি? স্যরি—ডাঃ সেন—বিনীতভাবে বললেন, নরেনবাবু একটু লজ্জা পেয়ে।

—না-না, স্যরির কি আছে? নিজের স্ত্রীর অসুখ হলে সে তো ডবল্

প্রবলেম—রোগী হলে চিকিৎসা আর স্ত্রী হলে নিজেরও চিকিৎসার দরকার, স্ত্রীরও দরকার। তাই প্রবলেমটা দ্বিগুণ হয়ে যায়। নামুন, একটু হাঁটাহাঁটি করে মনটা হাল্কা করে নেয়া যাক।

—সুলেখা কে হয় আপনার? চট্ করে জিজ্ঞেস করে বসলেন নরেনবাবু।

—ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী। এক গাঁয়ে একসঙ্গে কিছুদিন ছিলাম। তারপর দেখা হল সেদিন, বহু বছর পরে।

মুহূর্তে যেন সেই গ্রামখানি থেকে ঘুরে এলেন ডাঃ সেন। ফিরে গেলেন সেই কৈশোর-যৌবনের মিলন সময়ে। তখনও সাবল্যের শীতল ছায়ায় সবে ভোরের রোদ আলতো আভা ছড়িয়েছে। শুধু রূপ-রসের সামান্য উঁকিঝুঁকির চঞ্চলতা লুকোচুরি খেলছে। বোঝা না-বোঝার ও জানা না-জানার উৎসুকে মনটা একটু যেন ভাবুক ভাবুক। চোদ্দ বছর বয়স। দেহটা চড়চড় করে বড় হয়েছে। বাবা মার আদরে ননী ও মিষ্টি খেয়ে নাদুস নুদুস। গোলআলু সে ছিল না। গ্রামের বেশির ভাগ ছেলেরা কৃষ ও রুগ্ন ছিল বাঁশের মতো। তাই তার মনে হত মোটাসোটা।

দুজনেই গঙ্গার মিষ্টি মধুর শীতল বাতাসে আনমনা হেঁটে যাচ্ছিল নিজের নিজের কথা ভাবতে ভাবতে। চমক ভেঙে ডাঃ সেন বললেন, আসুন একটু ভাঁড়ে চা খাওয়া যাক।

দুজনে বেঞ্চিতে বসে চায়ে চুমুক দিল।

—কিন্তু সুলেখাই তো আপনাদের সব—তাই না? জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ সেন।

—হ্যাঁ, আমার অফিসে কাজ করে। বছর দুতিনের পরিচয়। তবে এখন একেবারে বোনের মতো। আমার স্ত্রীর খুব বন্ধু।

—ও আচ্ছা। চাকরি করে। তা ওর স্বামী? তিনি কি করেন?

—স্বামী নেই। একটি মেয়ে—আমার ছেলের সমবয়সী—ওরাও দুজনে খুব বন্ধু।

—স্বামী নেই মানে? অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ সেন।

—না, তিনি মারা গেছেন বছর পাঁচেক বোধহয় হবে। তার পরই চাকরি

নিয়েছে। বেচারার শুনেছি স্বামীটি খুব ভাল মানুষ ছিলেন। আপনাদের হাসপাতালেই বোন্ ক্যান্সারে হঠাৎ মারা গেলেন—গম্ভীর ব্যথিত স্বরে বললেন নরেনবাবু।

—'ও' মুখ থেকে অস্ফুটে শুধু একটা কথা বেরুল ডাঃ সেনের। তিনি স্তব্ধ মূক হয়ে গেলেন। বুকে [illegible] ভেতরটায় যেন হাতুড়ি মেরে দিলেন নরেনবাবু। সহসা একটা [illegible] দুঃসহ যন্ত্রণায় তার মনটা ছটফট করতে শুরু করল।

—চলুন যাই এ[illegible]—

গঙ্গার শান্ত শীতল সন্ধ্যা [illegible] পরিবেশও তখন অসহ্য লাগল তার। কপালে [illegible] বিন্দু ঘাম। [illegible] দিয়ে বললেন নির্বাক [illegible] দুর্ভাগ্য অভিশাপ। [illegible] বিবর্ত [illegible] দেবীর [illegible] হয়ে উঠল [illegible]। ও [illegible] বলতে [illegible] নিজেকে [illegible]। ফুটফুটে [illegible] সুন্দর চেহারায় [illegible] ছিল না। [illegible] ও [illegible] ছিলেন। ওই বয়সেই ও যেন এ[illegible] চোখে। সেই সুলেখাকে দেখে আমার [illegible] না। যখন চিনলাম [illegible] ভেবেছি অবশ্য [illegible] একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে [illegible] সেই সুলেখা আর এই পুড়ে যাওয়া [illegible]। কিন্তু এতটা অনুমান [illegible]। আবেগের সুরে বলে গেলেন [illegible] ব্যক্ত করতে [illegible]। খুবই বিচলিত ও ব্যথিত মনে হল [illegible]। [illegible] ভাবলেশহীন ডাঃ সেন একটা [illegible] পারলেন। তিনি জড় পাথরের মতোই বসে রইলেন।

—'কোথায় বাড়ি আপনার?' প্রশ্ন করলেন ডাঃ সেন।

—আমি সুলেখার কাছেই যাব এখন। [illegible] দেব—খাওয়া দাওয়া করব—ছেলেটাও সারাদিন বাবাকে দেখে না। মা অসুস্থ জানে। পদ্মকে খেলার সঙ্গী পেয়ে তবু মনটা অন্যদিকে আছে। এখন অবশ্য বুঝতে শিখেছে। ও হ্যাঁ-ওই সারপেনটাইন লেনে। তা আপনিও চলুন না দেখা করে আসবেন। একটু খুশির সুরেই বললেন নরেনবাবু।

আজ নয়—একটু কাজ আছে। পরে আসব নিশ্চয়ই। আর সুলেখার ব্যাপারে আমাদের আলাপ-আলোচনা হয়েছে তা বলবেন না আপনি। বেবেচারা আবার পুরোন দিনের কথা ভেবে কষ্ট পাবে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অনুরোধ জানালেন ডাঃ সেন।

—না, না ও প্রসঙ্গই আমি তুলব না। আশ্বাস দিয়ে বললেন নরেনবাবু।

ভাঙা মনটাকে নিয়ে নিজের ফ্লাটে ফিরলেন ডাঃ সেন। অকারণে অন্যের ব্যথায় মানুষ আঘাত পায়। আত্মীয়তার বন্ধন কোথাও নেই - স্বার্থের সুতো কোথাও জড়িয়ে নেই, জীবনের চলার পথের এক টুকরো স্মৃতি মাত্র। তবুও ওই জীর্ণ পুরাতন সম্পর্কটুকুই কেমন রক্তের টানে জড়িয়ে আছে। একগ্লাস হুইস্কির ওপর দু'তিনটে বরফের টুকরো দিয়ে একটা ম্যাগাজিন কোলে নিয়ে সেটিতে হেলান দিয়ে বসলেন ডাঃ সেন। তাই তিনি করেন। চিন্তা বা কল্পনা করতে গেলে চুপচাপ শান্তিতে বসে আদ্যোপান্ত ভাবেন ও তার চুলচেরা বিচার করার চেষ্টা করেন। সেই সাদাসিধে গোলগাল মানুষটি ধীরে ধীরে কত পাল্টে গেছেন, কত চিন্তাশীল ভাবগম্ভীর হয়েছেন নিজেই জানেন না। সময় সমাজ-পরিবেশ ও শিক্ষা অনেক মানুষকেই অনেক পাল্টে ফেলে। তার ওপর বিদেশে বহুদিন থেকে বহু দেশ দেখে বহু মানুষের সঙ্গে মিশে এককালের ময়রার ছেলে আজ ভিন্ন মানুষ। তারই ছোট ভাই হয়ত সেই গ্রামে সেইভাবেই দৈনন্দিন সুখদুঃখের লাভ লোকসানের হিসাব করে যাচ্ছে তার বাবার মতোই। তার পরিবর্তন শম্বুক গতির মতোই ধীর।

ডাঃ সেন ভাবলেন, বেচারা সুলেখা। নিয়তির কি অভিশাপ নিয়েই এসেছিল এই সংসারে। এখনও অনেক বাঙালী মেয়ের চেয়ে সে আকর্ষণীয়া। কত কষ্ট করে নিজের ব্যথার আগুন বুকে চেপে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভাবনার মাঝে মাঝে বেদনার বিষ উছলে ওঠে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে পানিয়ে চুমুক দেন ডাঃ সেন। কতক্ষণ এভাবে কাটল ঠিক নেই। দরজার বেল বাজতেই চমকে উঠলেন। কখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেছে। তন্দ্রালস বিবস দেহটাকে টেনে তুলে হাই তুললেন। আড়মোড়া ভেঙে দরজা খুলে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। —তুমি? অস্ফুট কণ্ঠ বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

—হ্যাঁ আমি। ঢুকতে তো দাও আগে—

এক রকম জোর করেই ঠেলে ঠুলে ঢুকল মহুয়া। এক অদ্ভুত বিলেতি সেন্টের উগ্রমিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। নিজেই ঝুপ করে সোফায় হেলান দিয়ে বসে মাথাটা পেছনে এলিয়ে দিল। আঁচলখানা অজান্তে ছড়িয়ে পড়ল কোলের ওপর। দরজা বন্ধ করে সেখান থেকেই আড়চোখে একপলক তাকালেন ডাঃ সেন। চোখের সামনে মহুয়ার যৌবন গর্বিত উপচে পড়া স্বর্ণাঙ্গী বক্ষ ঝলমল করে উঠল। মহুয়ার এলানো দেহতটে দু'খানি ঢেউ যেন প্রভাতের আলোয় থমকে গেছে। সব মিলিয়ে মনে হল যৌবনের প্লাবনে মহুয়া কানায় কানায় পরিপূর্ণই শুধু নয়, কামনায় বাসনায় তার সর্বাঙ্গে যেন তরঙ্গ উপচে পড়ছে। ডাঃ সেন ভাবলেন, তার মনোহরণের জন্য কোনো কার্পণ্যই ছিল না মহুয়ার! আজও সে অচল অটল তার চাহিদায়।

গম্ভীর ভাবেই চোখের দৃষ্টিতে মহুয়ার অফুরন্ত সদাচঞ্চল ফোয়ারায় অবগাহন করলেন ডাঃ সেন। এক গ্লাস হুইস্কির নেশা তখনও তার চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। গ্লাসটা আলতো করে তুলে কিচেনে গেলেন ডাঃ সেন। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বললেন, তোমায় কি কিছু দেব মৌ?

—দাও—তোমার যা খুশি। বিষ থাকলে তাই দাও এক গ্লাস। নীলকণ্ঠী হবো আধুনিক যুগের—

—বিষ খেলেও তোমার কণ্ঠ নীল হবে না মৌ—কৌতুকের সুরে বললেন ডাঃ সেন।

—তা আমি জানি। বিষ পান করে করে এমন হয়েছি যে কোবরা ছোবল মারলেও সেটা মরেই যাবে। আমার কিছু হবে না—একইভাবে এলিয়ে শুয়ে বলল মহুয়া।

দু'গ্লাস হুইস্কি নিজেরটা আইস দিয়ে ও মহুয়ারটা লেমনেড দিয়ে মিশিয়ে টি টেবিলে রাখলেন ডাঃ সেন। সোফার অন্যদিকে এসে হেলান দিয়ে বসে জিজ্ঞেস করলেন, তারপর—কেমন আছ বল? মাঝখানে অনেকদিন বেপাত্তা হয়ে হঠাৎ আবার হাজির হয়ে গেলে।

টেবিল লাইটের আলতো আলোতে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ডাঃ সেন।

মহুয়া সুপ্তির ক্লান্তিতে বেতের মতো তাকিয়ে দেহলতা শক্ত করে উঠে বসল। শাড়ির আঁচল কোন রকম কাঁধে ফেলে বলল, আসলে তোমায় ভীষণ দেখতে ইচ্ছে হল শ্যামলদা— তাই এলাম। আজো একটু ব্যস্ত ছিলাম। খানিক থেমে দুষ্টুমির সুরে বলল, সেন—তুমি কি চাওনি আমি আসি? আড়চোখে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হাসল মহুয়া।

—না, তা ঠিক বলব না। তোমার সঙ্গ আমার ভাল লাগে, সেকথা জানাতে আমার লজ্জা নেই—গম্ভীরভাবে নির্নিমেষে চোখ তুলে তাকালেন শ্যামল সেন।

—সঙ্গ ভাল লাগে কিন্তু সঙ্গ সুধায় তা আছে বল! চটুল হাসি ছড়িয়ে দিল মহুয়া, সত্যি শ্যামলদা—তোমার সেই ভীতু প্রকৃতির এখনও কোন পরিবর্তন হলো না। মনে পড়ে, সেদিনের সে— সেই তোমাকে এমন জড়িয়ে ধরে আলতো চুমু খেয়েছিলাম। বাপ রে বাপ— এই না শুনে তো তাই মরো। আর তখন শয়ে শয়ে যুবক লুব্ধ মুগ্ধ এমনি হিংস্রলোলুপ দৃষ্টিতে আমাকে ছিঁড়ে খেত।

—ওসব ভুলে যাও মৌ। সেপথে অনেকটা এগিয়ে গেছ, তাকেই আপন করে ভেবে নাও। নতুন করে জীবনটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেল না। এখন পথ হারালে আর পথ খুঁজে পাবে না। বি সেনসিবল্।

—সেনসিবল্! ক্ষিপ্তোন্মত্তের মত ঝাঁঝিয়ে উঠল মহুয়া, জীবনটা আমার পথ ভুল করে যদি বেপথে গিয়েই থাকে তাকে শোধরাবার সুযোগ আমি নেব না কেন? তুমি পালিয়ে চলে গেলে বিলেত—ক্রোধান্ধ হয়ে আমি একটা বিয়েই করে ফেললাম। ভাবলাম তোমাকে জ্বালিয়ে নিজে জ্বলব। দেখলাম আমি জ্বলছি আর তুমি নির্বিকার নিরাসক্ত হয়ে নিজের ধ্যানে বিভোর।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। খানিক পরে মহুয়া জিজ্ঞেস করল, তুমি কি কিছুতেই আমাকে ভালবাসবে না শ্যামলদা?

—এমন প্রশ্ন তো বহুবার করেছ মহুয়া। এর জবাব দেওয়া সহজ নয়

আমি নিজেও জানি না ভালবাসা বস্তুটা যে কি। যদি বলি যৌবনের লালসার মোহ, তবে বলব সেটা আমার বাধ্যের মধ্যে। যদি বল আকর্ষণ, তবে বলব আমার ম্যাগনেট শুধু রুগীদের রোগকে আকর্ষণ করা আর যদি বল প্রাণের টান, তবে বলব আমি হয়ত পাষাণ। হ্যাঁ একথা অকপটে স্বীকার করতে পারি, তোমাকে আমার ভাল লাগে! তোমার সান্নিধ্য আমি এনজয় করি। কিন্তু স্বামী ছেড়ে ঘর ভাঙা আমি পছন্দ করি না। ভুল করলে ভুল দিয়েই তা শোধরানো যায় না। তোমার অভিমানের অভিনয়ে আরেকজনকে দগ্ধ করার অধিকার তোমার নেই।

—কোন যুগে আছ তুমি ম্যানেলদা? ধনুকের মতো ভ্রু কুঁচকে মুখে কৃত্রিম হাসি টেনে ব্যঙ্গ করে বলে উঠল মহুয়া, এই তুমি বিদেশ থেকে এসেছ —যে দেশে বিয়ের চেয়ে 'ডিভোর্স' বেশি হয়! তোমার থিওরিটা পাল্টাবে না কি কোন দিন? উত্তেজনায় মহুয়ার বক্ষ ডাক্তার সেনের চোখের সামনে সাগরের ঢেউয়ের মতো উত্তাল হয়ে উঠছে নামছে।

ঈষৎ হাসলেন ডাঃ সেন। শান্ত স্বরে বললেন, পশ্চিম দেশের সব ট্রেনিংই ভাল নয়। ওদেশের সভ্যতার প্রতি ওদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা নেই না কেন? আর তোমার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। তুমি যেন নিজের খেয়াল মেটাতেই বিয়ে করেছিলে। আমাকে শাস্তি দেবার জন্য আর আরেকজনকে বিয়ে করা এবং সেটাকে প্রকাশ্যে গর্বিতভাবে বলা তো হোমিসাইড। তার মানে তুমি প্রয়োজন হলে তার হৃদয়েও ছুরি বসাতে পার। অথচ সে বেচারা তো কোনো দোষই করেনি মহুয়া।

—নিশ্চয়ই করেছেন। তা না হলে আমার সঙ্গে তার বিয়ে হল কেন? কেন তার ভাগ্যে এ নিদারুণ অভিশাপের রেখা আঁকা হল।

—হয়ত তুমি ঠিকই—জানি না। কিন্তু ইচ্ছে করে একটা মানুষকে ভালবাসার অভিনয় করে ঠকানোটা মনুষ্যত্ব নয়।

—মনুষ্যত্ব! তুমি কি মনুষ্যত্ব দেখিয়েছ তোমার জীবনে? বার বার আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছ। আবার একেবারেও সরাওনি। বলতে পার রাবার দিয়ে বেঁধে রেখেছ। কিছুটা ছুটে অন্যদিকে পালাতে গেছি অমনি

তোমার দড়ির টানে আরও জোরে ফিরে এসেছি। যখন এসেছি নিজে লাট্টুর মতো আবার ঘুরিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছ।

ক্ষুব্ধ অভিমানী কণ্ঠে বলল মহুয়া। নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে কিছু বাদাম চানাচুর ও হুইস্কির বোতলটা নিয়ে এসে আবার বসল।

—মিস্টার বাড়িতে ফিরবে কটায়? প্রশ্ন করলেন ডাঃ সেন।

সে নেই, আসানসোলে গেছে।

চমকে উঠলেন ডাঃ সেন। মুখে কিছুই বললেন না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, তুমি বিনা কারণে আমাকে দোষারোপ করছ। তোমার ওপর আকর্ষণ আমার চিরদিনই ছিল আজও আছে। হয়ত ভুল ভ্রান্তি দুপক্ষেরই আছে। তা বলে আজ আমরা শুধু বন্ধুই। এর বেশি আর তুমি ভেব না—স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন ডাঃ সেন।

হুইস্কিটা ঢালতে ঢালতে মিষ্টি মধুর চটুল চপল এক ঝাঁক আলতো হাসি দিল মহুয়া। তার আয়ত ঘনকালো চোখ দুটোতে মেঘের বুকে তড়িৎ রেখার মতো স্পষ্ট তৃষ্ণা। পীনোন্নত বক্ষে আঁচল টেনে বলল, আমি নিরুপায় শ্যামলদা। তুমি ফিরে না এলে যেমন চলছিল তেমনিই আশা নিরাশায় চাওয়া না চাওয়ায় ভালোয় মন্দেতে জীবনটা চলে যেত। কিন্তু তোমার সান্নিধ্য আমায় মাতাল করে দেয়। তুমি বিশ্বাস কর, আমি অনেক-অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই মনটাকে বাধ্য করতে পারিনি। এ স্কচ হুইস্কিও তার কাছে কিছু নয়। মদ আমি পান করি শুধু ওর সঙ্গে পার্টিতে গেলে। তোমার কাছে এলে খাই পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে একভাবে তোমাকে পাবার জন্য।

শ্যামল সেন আর কিছু বললেন না। হুইস্কির গেলাসেই ঠোঁট রাখলেন।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল শ্যামল সেনের।

মাথাটা দপদপ করছে। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি। ভোর হয়ে আসছে মনে হল। একটু পাশ ফিরে দেখতে গিয়েই হঠাৎ বিদ্যুতের চমকে পাশের

নিরাবরণ দেহটা চকিতে ঝলসে উঠল।

বসার ঘরে কার্পেটের ওপরেই শুয়ে আছে মহুয়া। নিজের দেহেও সুতোর কোন আবরণ নেই! হুইস্কির নেশায় জমে উঠতে উঠতে কখন যে মহুয়ার নেশায় আবার ডুবে গিয়েছিলেন সে খেয়াল নেই। টের পেলেন এখন। পেতেই চট করে উঠে পড়লেন। বাথরুমে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে নিজের বিছানায় গিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন।

ভোর পাঁচটা। মনে পড়ল আজ শনিবার। তেমন কোন কাজ নেই। কিভাবে কি যে হল, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আবছা ভাসা ভাসা মনে পড়তেই আবার সুপ্তির তিমিরে হারিয়ে গেলেন। একবার ভাবলেন, ওকে ডেকে তুলি। তারপর চিন্তা করলেন, ওর গায়ে একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিই। কিন্তু কিছুই না করে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহটাকে ডানলোপিলোর ওপর একরকম নিক্ষেপ করে কোল বালিশটা জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তারপর যখন ঘুম ভাঙল তখন পাশে নরম উষ্ণ মোলায়েম একটা দেহ তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে আছে। তার নিটোল ফর্সা হাতখানায় লম্বা লম্বা পাঁচটি আঙ্গুল তার বুকের চুল নিয়ে খেলছে। আঙুলের লম্বাটে পথে গোলাপের প্রলেপ। গায়ে যেন হাড় নেই এমন নরম মহুয়ার দেহলতা।

উসখুস করতেই মহুয়া হাতটা ধরে টানল, এদিকে ফের না···।

ঘুরে কোল বালিশের মতই বুকে জড়িয়ে ধরলেন মহুয়াকে। এ বর্ষার ভোরে এমন তন্বী যুবতীর উষ্ণ উছলে পড়া দেহটাকে দূরে সরিয়ে দেয়া অসম্ভব। সরালেও সরবে না মহুয়া। তার জীবনের পাওনা সে কড়াগণ্ডায় বুঝে নেবে। তার মধ্যে মন প্রাণ হৃদয় আছে কিনা, তার সে ধার ধারে না। সে ভালবাসে এইটুকুই তার যথেষ্ট মনের যুক্তি। সমাজের চোখে এ যে ঘৃণ্য জঘন্য মানবতার বিচারে এ যে পাপ ও অন্যায় তার বিচার করার কোন ইচ্ছাই নেই তার। উটকো স্ত্রী লোক, দুশ্চরিত্রা বলবে তোমাকে, বলেছিলেন একদিন ডাঃ সেন। মহুয়া তার স্বভাবজ একরাশ হাসি দিয়ে বলেছে,, 'ভালবেসে দেহ মন দেয়া তো ঈশ্বরের পুজো করা'। তারপর আরও জোরে গর্বিত পয়োধর যেতলে দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল শ্যামল দাকে।

ডাঃ সেনের কাঁধে মাথাটা রেখে বুকে পেটে হাতবোলাতে বোলাতে বলল এখন মহুয়া, চল আমায় নিয়ে বিলেতে। ওখানে গিয়ে দুজনে থাকব।

—কেন? তুমি কি ভেবেছ ওখানে বাঙালী সমাজ নেই? তাছাড়া তুমি ভুল পথে পা ফেলছ। দোষ আমারও নয়ত তোমার সাথে শুয়ে আছি কি করে? তোমাকে আদর করছি কি করে? কিন্তু আমি বিবাহিত নই আমি কাউকে ঠকাচ্ছি না, প্রতারণা করছি না। কিন্তু তুমি নারী, তোমার কথা ভিন্ন।

ফোঁস করে কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু দেহটাকে তুলল মহুয়া, ও, মেয়ে বলে আমার বুঝি ইচ্ছা অনিচ্ছা চাওয়া পাওয়া নেই? তোমরা রাধাকৃষ্ণ নিয়ে একটা ধর্ম তৈরি করে ফেললে আর আমার বেলা যত দোষ। ওটাই তোমাদের দোষ যা তোমরা পুজো কর তা বিশ্বাস কর না। যা তোমরা পেয়ে ধন্য হও তাই তোমরা ঘৃণা কর— যা নিজেরা না করলে মরে যাও তারই বদনাম করে নিজেদের পাপী করে তোল। তুমি বল আমার এ সান্নিধ্য তোমার ভাল লাগছে না? বলবে, তোমার স্বামী যদি এখন ঢুকে পড়ে তবে দুজনকেই গুলি করে মারবে। মারুক। তোমার রক্তের সাথে আমার রক্ত মিশে একাকার হয়ে যাবে। আমি তাই দেখতে চাই।

বুকের ওপর আরও জোরে চেপে ধরে শুয়ে রইল মহুয়া। নির্বোধ বালিকার মতো সে কেঁদে উঠল, নিরাবরণ পুষ্ট সোনালী দেহখানা ডাঃ সেনের দেহটাকেও থরথর করিয়ে কাঁপিয়ে তুলল। সান্ত্বনা দিয়ে ডাঃ সেন বললেন, বাস বাস এ ভোর বেলা কান্নাকাটি করো না। মুখখানা তুলে ধরলেন ডাঃ সেন। বিম্বাধর লাল টুকটুক করছে। আতপ্ত সরস ঠোঁটে চুম্বন করে বললেন, তুমি সেই পাগলীই আছ দেখছি। আবার শুরু হল ভালবাসার যৌবন পাগল করা দেহের নিষ্পেষণ। আদরে আদরে দু'জনেই তখন দুজনকে জ্বালিয়ে তুলল। এ তৃষ্ণার বুঝি শেষ নেই। তৃপ্তি নেই। একটু পরে অর্ধ-উন্মিলিত চোখ খুলে আলতো চুমু খেল মহুয়া। মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে বলল, এমনি যদি জীবন চলতো—বেশ হত তাই না?

'হুঁ'—সুপ্তিতে ভরপুর ক্লান্ত গলায় জবাব ডাঃ সেনের।

— চল না চলে যাই দুজনে কোথাও—অভিনয় করার মতো বলল মহুয়া।

—কোথায় ? মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন ডাঃ সেন। উত্তরটা শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলেন।

—বিলেত-আমেরিকা-অথবা দূরে কোথাও। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মহুয়া।

—তাহলেই কি ফেলে আসা জীবনটাকে ভুলতে পারবে ? স্নান করলে দেহের পাঁক মুছে ফেলা যায়, কিন্তু মনের পাক ? সেটা যদি মুছে ফেলা যেত—তাহলে তো কথাই ছিল না। যে দিনটি যায় সে মনের ওপর একটা করে দাগ কাটতে কাটতে যায়। সে দাগ হাজার ঘষলেও ওঠে না।

—ওসব বড় বড় কথা রাখ। আমি ভুলের জন্য অসংখ্যবার মাফ চেয়েছি এখনও চাইছি। কিন্তু ভুলকে মেনে নিয়ে সারাজীবন অভিনয় করে যেতে পারব না আমি।

—তাহলে আমার বিলেত যাবার আগে কেন অভিনয় করেছিলে ?

—আমি ? অবাক হয়ে মাথা উঁচু করল মহুয়া। বলল, আমি কোথায় অভিনয় করেছি ? তুমিই তো না জানিয়ে পালিয়ে গেলে—রাগের সুরে বলল মহুয়া।

—কেন পালিয়ে গেলাম ? অভিমানের সুরে প্রশ্ন করলেন ডাঃ সেন।

—তা আমি কি করে জানব ? হয়তো আমাকে ভালবাসতে না বলে। কিন্তু আমার মন রোদের আলোর মতো তোমার ওপরই পড়েছিল সর্বক্ষণ—এখনও তাই। মেঘের মতো তুমিই আমার ভালবাসাকে থমকে দিয়েছ অন্য কোথাও যেতে দাওনি। তোমাকে শিক্ষা দেবার জন্য অভিমান করে যে আলোটুকু অন্যের ওপরে পড়েছে তাতে কোন উত্তাপ ছিল না, আজও নেই।

—কিন্তু আমি যদি আঁতস কাঁচ হই—তাহলে তো তোমার ভালবাসার কিরণ তার মধ্য দিয়ে গিয়ে অগ্নি বিচ্ছুরণ ঘটাবে। তাই না ? বিয়ের পর যা তুমি করার কথা ভাবছ তা আগুন নিয়ে খেলা করা। নিজেও জ্বলবে অন্যকেও জ্বালাবে।

কৃত্রিম রাগের সুরে বলল মহুয়া, নিজে জ্বলেও তোমাকে জ্বালাতে আমার

ভালোই লাগবে।

—আমাকে দগ্ধ কর তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার স্বামী? সে বেচারার তো কোন দোষ নেই। তাছাড়া আজও যা খেলার ছলে করছ সে সাময়িক মোহ মাত্র। এভাবে জড়িয়ে জীবনটা চলে না। ওঠ এবার—

—আর একটু শুয়ে থাক না। এত কি তোমার কাজ। আমি কি জ্বলন্ত টিকে নাকি তোমার বুকে? নিজেকে আরও ঘন করে বলল মহুয়া।

—এ ভাবেই যদি এক হয়ে মিশে থাকার ইচ্ছে ছিল তবে তখন সমীরণের পেছনে ছুটেছিলে কেন?

—আমি সমীরণের পেছনে ছুটেছিলাম? ইউ মাইট বি ম্যাড। সে আমার জন্য পাগল হয়ে শেষ পর্যন্ত সুইসাইড করেছে—বিরক্তির সুরে বলল মহুয়া।

—তাই নাকি? সে সুইসাইড করেছে? তা তো আমার জানা ছিল না।

বিস্মিত কণ্ঠে বললেন ডাঃ সেন।

কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যেই তন্ময় হয়ে রইল দুজনে। ডাঃ সেন অবাক কণ্ঠে বলে উঠলেন, আচ্ছা, সমস্ত ব্যাপারটাই তাহলে মিথ্যে?

—কি মিথ্যে? কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল মহুয়া।

—সে তো গল্পের মতোই। একদিন আমায় এসে বলল তুমি তাকে বিয়ে করবে জানিয়েছ। তারপর এসে বলল তোমরা দুজনে দার্জিলিং বেড়াতে যাচ্ছ। তারপর একদিন এসে বলল বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে। তাই তো আমি তোমার থেকে দূরে সরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বিলেতে যাবার যখন কথা তার তিন মাস আগেই চলে গেলাম।

—তুমি সে কথা আমায় জানালে না কেন? আজ ওই শয়তান নেই—তাও ওকে পেলে আমি ছিঁড়ে ফেলতাম। সব মিথ্যা। তবে হ্যাঁ, আমরা দার্জিলিং গিয়েছিলাম। পেছনে সেও না জানিয়ে গিয়েছিল। এমনকি বাবা-মার কাছে প্রোপোজও করেছিল। আমি ভদ্রভাবে বলেছি 'না'। শেষে সে-ই খবর দিল তুমি বিলেত চলে যাচ্ছ। অভিমানে জর্জরিত হয়ে, রাগে ক্ষোভে ব্যথায় মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। আমি যেভাবে তোমাকে ভালবাসি বলে গেছি, তুমি কোন দিনও তা ভ্রূক্ষেপ করনি। তাই ভাবলাম তুমি

আমায় ছেড়ে যেতে পারলেই বাঁচো। তাই বাবা মাকে বলে যাকে চিনি না জানি না এমন একজনকে বিয়ে করলাম। পাঁচ বছর স্বামীস্ত্রীর ঘর করছি। সে বেচারা সাত পাঁচ বোঝে না তাই দিব্যি আছে। আমি তোমার শোকের বোঝা টেনে চলেছি। এবার আর নয়। আর তোমায় ছাড়ছি না।

গভীরভাবে শিশুর মত শ্যামল সেনকে জড়িয়ে ধরল মহুয়া।

ডাঃ সেন বললেন, কিন্তু এবার যে উঠতেই হবে। আমার একটু হাসপাতালে যাওয়া দরকার। একটি রুগী দেখে আসতে হবে।

—এমন কি পেসেণ্ট আছে যে আমাকে ঠেলেই উঠে পড়লে? কপট অভিমান করে বলল মহুয়া।

—তোমার মতো সুন্দরী রমণী হলে ডাক্তার হয়েও গৃহলক্ষ্মী হয়ে থাকতে পারতাম। কিন্তু পুরুষ মানুষকে খেটে খেতে হয়—একটু ঠাট্টার সুরেই বললেন ডাঃ সেন।

ফোঁস করে উঠল মহুয়া, ও আমি বুঝি কাজ করি না?

—হ্যাঁ চামড়ার ডাক্তার! তাও আউটডোরে।

—ডারম্যাটোলজি বল—ছাল চামড়া বললে গায়ে ছ্যাঁকা লাগে। তাছাড়া স্কিন খুবই ইম্পরটেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট। তোমাদের সার্জারী তো, এই রোগ হয়েছে কাট অ্যাণ্ড আউট, বাস্। তোমাদের বলত বারবারস, মানে নাপিত।

দু'ডাক্তারের এবার ডাক্তারী নিয়ে শুরু হল। বহুকালের এই ঝগড়া। সেই ফাইন্যাল ইয়ার থেকে জানাশোনা। তখন মহুয়া সবে থার্ড ইয়ারে উঠেছে। অর্থাৎ দুবছরের জুনিয়র। কলেজে থিয়েটার করতে গিয়ে ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু পড়া ও ডাক্তারী পাগল ডাঃ সেনের প্রেমের কোন ঝোঁকই ছিল না। তাই আরো দু'বছর চাওয়া ও কথা বলার মধ্য দিয়েই কেটে গেছে। নিজে যখন রেসিডেণ্ট সার্জেন তখন জুনিয়র হাউস সার্জেন হয়ে এল মহুয়া। তখন থেকে প্রেমের অঙ্কুর গভীর ঘন সবুজ হতে শুরু করেছিল। কিন্তু মহুয়ার চটুল চপল মিশুকে স্বভাবটা এমনই ছিল যে মনে হত অনেকের সঙ্গেই তার প্রেম। কোথায় যে কতটা ঘনত্ব তা বুঝে উঠতে

পারে নি অনেকেই। তাই মহুয়ার উচ্ছল চঞ্চল গায়েপড়াটাকে ওর স্বাভাবিক ব্যবহার মনে হয়েছে ডাঃ সেনের। অথচ অন্য অনেককেই সেটা প্রেম নিবেদনের মরীচিকা হয়ে বিভ্রান্ত করেছে।

সেই বিভ্রান্তি থেকে দূরে রেখেছিলেন নিজেকে ডাঃ সেন। তাই ধরা দিয়েও তিনি দেননি। কলেজ থিয়েটারে অভিনয় করার মতোই করে গেলেন। পরে সমীরণের কথাও অবিশ্বাস হয়নি। সমীরণ সিনিয়র হাউস অফিসার। ওরা বেশ কয়েকজনে মিলে মাঝে মঝেই এদিকে ওদিকে যেত। সিনেমা থিয়েটার দেখত। ডাঃ সেন কাজের ছুতোয় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

সুন্দরী মেয়ে বেশি খোলামেলা, মিশুকে ও চটুল চপল হলে অনেকের হৃদয়ই জ্বলে পুড়ে যায়। মহুয়ার আগুনেও তাই অনেকে দগ্ধ হয়েছে। তার মধ্যে সমীরণ বেচারা তো আত্মাহুতিই দিয়েছে। মহুয়ার মতো পর্যাপ্ত যৌবনবতী, সমাজের অনেক জায়গায়ই আগুন লাগিয়ে যাচ্ছে।

এসবই ভাবতে ভাবতে রেডি হয়ে নিলেন ডাঃ সেন।

একটা লম্বা তোয়ালে দিয়ে নিজেকে কোন রকমে ঢেকে সামনে এসে দাঁড়াল মহুয়া। বলল, তুমি যাও—আমি একটু চান করে নেব। ভাবলাম চানটাও আজ তোমার সঙ্গেই করব।

দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বলল মহুয়া। সিগারটায় লাইটারের আলো জ্বালাতে জ্বালাতে বললেন ডাঃ সেন, তোমার পাগলামোর সীমা নেই। বয়সটা যেন দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। রস যেন উপচে পড়ছে।

—বারে, তোমার কাছে আমি বৌবি! কেন বিলেতে 'বৌবি' নিয়ে ফুর্তি করোনি বুঝি? এদেশে এসেই সতী বনে গেছ। বিদ্রূপ করে বলল মহুয়া।

ডাঃ সেন তাকালেন। দশ বছরে মহুয়ার রূপ যেন আরও বেড়ে গেছে। লম্বাটে মুখে আয়ত দুটি চোখ জ্বলজ্বল করছে, টানা সরু ভ্রূদুটো ইচ্ছে মতো ঢেউ তোলে। সুস্পষ্ট ধনুকের মত গ্রীবা কণ্ঠহাড় দুখানি চওড়া বুকখানাকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। লম্বা লম্বা হাত দু'খানিও যেন সোনার প্রলেপে উজ্জ্বল। এক কথায় এমন তন্বী তনুশ্রী সর্বালংকারে ভূষিতা রমণী বিরল। ডাক্তারী কলেজে হৈ-চৈ পড়েছিল সে ঢুকতেই। সে সোরগোল

আমোদিনী মহুয়া সুধারসে সিঞ্চিত করেছিল। ম্যাগাজিন থেকে থিয়েটার সর্বত্রই মহুয়ার মিষ্টি পরশ ছিল।

কি দেখছ। যাবে তো যাও—বলে উঠল মহুয়া এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে।

—তুমি যাও চান করতে—এক সঙ্গেই বেরোব।

—তাড়িয়ে দিচ্ছ ?

—না না—আমার কাজ আছে অনেক—গম্ভীর হয়েই বললেন ডাঃ সেন। তার চোখের সামনে এক বিরাট দুশ্চিন্তার পাহাড়। মহুয়া ঝাঁপিয়ে পড়লে নিজেকে কে সামলাবে। কিন্তু দেহের উষ্ণতা শীতল হলেই মনটা লজ্জিত সংকোচিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে পীড়া দেয়। হৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়। দুঃসহ অনুশোচনায় আত্মঘাতী হবার মানসিক বিকার শুরু হয়। রাত্রের স্বপ্নে বিভীষিকার চমকে আঁতকে ওঠেন। অনেকদিন ধরে বেদনার বিদ্যুৎ কষাঘাত করে দেহে মনে। সে সময়টা পেরিয়ে গেলেই নতুন চেউয়ের মতো নতুন উদভ্রান্ত যৌবন নিয়ে হাজির হয় মহুয়া। এই নিয়ে একবছরে তিন-চার বার হলো। প্রায়ই কেন আসে না ? প্রশ্ন করেননি ডাঃ সেন। বুঝেছেন ওরও ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই দহন হয়, অনুশোচনা হয় ; কিন্তু এক এক সময় প্রচণ্ড সুযোগ পেলে আর বাঁধ রাখতে পারে না। মহুয়া বোঝে নিশ্চয়ই, এতে জ্বলন বাড়ে বই কমে না। এটা কোনোমতেই মেনে নেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু একটা সময়ে দেহ মনও কথা শুনতে চায় না। আত্মবিস্মৃত দেহটা এসে হাজির হয় ডাঃ সেনের উৎকণ্ঠিত তাচ্ছিল্যে ভরা চোখের সামনে। নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য উদ্ঘাটিত করে জোর করেই বশীভূত করে ডাঃ সেনকে। প্রথমে যৌবন উদ্দীপ্ত দেহের পরশে যেন গলে গেলেন শ্যামল। ভেঙ্গে পড়ে কান্নায় আছড়ে পড়েছিল মহুয়া। সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক, মরিচীকায় আত্মবিসর্জন দেবে, তবুও এ ভার আর বইতে সইতে পারছে না সে। সেই ভাবেই জড়স্তূপের মতো ঝুপ করে ঘাটে বসে কাঁদতে শুরু করেছিল ফুলে ফুলে। গলে গিয়েছিল শ্যামলের মন। মহুয়া তার বেডে চোখের জল ফেলছে—এ কি ভাগ্যের পরিহাস। সেই বিকেলের রক্তিম পড়ন্ত রোদে দুটো দেহ মিশে গিয়েছিল। একসময় শ্যামল সেন বলেছিলেন, এটা ঠিক হলো না মহুয়া, এমন ভাবে

আমাকে নিঃশেষ করে দিও না—এতে অনেক প্রাণ জলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ভুলে যাও—প্লিজ আর এসো না—

সেদিন কিছু না বলেই শুধু যুদ্ধজয়ের এক সাফল্যেভরা হাসি দিয়ে চলে গিয়েছিল মহুয়া। তারপর অনেকদিনই আসেনি। হঠাৎ আবার দুর্গাপুজোয় তার স্বামী গ্রামের বাড়ি যেতে কি অছিলায় সে যায়নি। দুর্গা প্রতিমার মতোই এসে হাজির হয়েছিল যৌবন সম্ভার নিয়ে। সে উগ্র মূর্তির কাছে, সে উন্মত্ততার ঝড়ে ডানাভাঙা পাখির মতো হারিয়ে গিয়েছিলেন ডাঃ সেন। অকল্পনীয় গতিতে সেদিনের সেই শ্যামলদাকে ক্ষত বিক্ষত করে নতুন করে ভালবাসার প্রলেপ দিয়ে গড়ে তুলেছে। হাসিতে কান্নার আঘাতে আদরে অভিমানে অনুরাগে হাজার রকম ব্যবহারে যেন অভিভূত করেছিল শ্যামলদাকে। নারী এমন হতে পারে, সেই চিরহাস্যময়ী চিরচঞ্চলা মহুয়ার এ মূর্তি দেখেননি শ্যামল সেন। এ তো একটি যুবতী নয়, এ যেন বিভিন্ন যুবতীর এক বিরাট মহাসমন্বয়। এর মধ্যে এত কাব্য, এত ভাষা, এত আলো, এত রূপ-রস-গন্ধ আছে কে তার হদিশ জানত। আকণ্ঠ নিমজ্জিত সেই শ্যামল সেন তবুও বলেছে, প্লিজ তুমি আর এসো না মহুয়া। তুমি এলে আমি তোমায় না পেয়ে থাকতে পারব না। তুমি আমায় ক্ষমা কর—প্লিজ আর এসো না।

—আমি আসব—ভালবাসব। যেদিন রাজি হবে তোমার সঙ্গে সহমরণে যাব।

—তা হলে আমি পালাব—

—কোথায় পালাবে চাঁদ? আগে তোমায় জানতাম না বলে পালাতে দিয়েছি—ভুল করেছি। অভিমান অনুরাগ এ সব তুমি বোঝ না। তুমি বোঝ শুধু রক্ত, হাড়, মাংস—তার মধ্যে যা দেখনি অ্যানাটমি হলে তা তুমি বোঝ না। তুমি শুধু নিজেকে ভালবাস—অন্যকে নয়। তাই তোমার যা আছে তাই চাই আমি—তোমার যা নেই তা চাইব কি করে?

—ভালবাসার কথা ছাড়। লোকলজ্জা লোকভয় সমাজ সব বাদ দিলেও অন্যান্যদের ভালমন্দ তো চিন্তা করতে হবে। তোমার বাবা-মা স্বামী আত্মীয়-

স্বজন—এদের কথা ভাববে না তুমি ? বোঝাবার চেষ্টা করেছেন শ্যামল সেন।

—আগে তুমি পরে অন্য সব—ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলেছিল মহুয়া।

—ইউ আর ম্যাড।

—ইয়েস—তোমার জন্য। তাতে তুমি গর্বিত বোধ কর না ? আগুনে ঝড়া চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল মহুয়া।

—না—বলবে ভাবল, অপমান বোধ করি কিন্তু আঘাত করতে চাইলেন না ডাঃ সেন। এ অবাধ্য মেয়েটাকে যে কি করে বোঝাবেন তা কিছুতেই ভেবে পেলেন না। এমন নারী স্বদেশে বিদেশে অনেক আছে কিন্তু তার সঙ্গে এমন-ভাবে সে নিজে জড়িয়ে পড়তে পারে তা ঘুণাক্ষরেও যদি জানতেন।

সিগার থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী করে এসবই ভেবে চলেছিলেন ডাঃ সেন। এমন সময় বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এল মহুয়া।

—আঃ সারা দেহ মন শীতল হলো।

—তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও মউ—আমাকে বেরুতে হবে।

—আর একবার মউ বলে ডাক না লক্ষ্মীটি। শুনতেও মিষ্টি লাগে। অমন মধুর করে মউ বলে কেউ ডাকে না আমাকে—বলে খিল খিল করে একরাশ হাসি ছড়াল। ধুপের সুঘ্রাণের মতোই সেই হাসির সুখস্পর্শ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

বেরোবার আগে আবার সেই একই উপদেশ, আবার সেই একই অনুনয় বিনয় শ্যামল সেনের, প্লিজ আর এসো না, নিজেকে এভাবে ধ্বংসের পথে ছুঁড়ে দিও না। তোমার আমার সবার কথাই ভেব দেখ মউ। প্লিজ।

মহুয়া শুনল। শুনেই আজ কিন্তু গম্ভীর ভাবেই ভাবল খানিকক্ষণ সে। তারপর ব্যথাতুর একটা দৃষ্টি মেলে বলল, তুমি আমায় সুদূরে ছুঁড়ে ফেলে আমার মৃত্যু চেও না। সংসারে বিভিন্ন রকম মানুষ আছে শ্যামল দা। ঘর সংসার সমাজ স্বামী সবাইকে খুশি রেখে যদি তোমার সান্নিধ্যে একটু জীবনকে খুঁজে পাই তাতে কারও চারিত্রিক অধঃপতন হয় না। এই কলকাতায় অসংখ্য গৃহবধূ আছে যাদের স্বামী ছাড়াও অন্য পুরুষের সান্নিধ্য ঘটে। হয়তো জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে না—হয়তো বা কামোত্তেজিত হয়ে রমণ করছে না,

কিন্তু মনের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা করে সুখ পাচ্ছে। সুযোগের অভাবে অথবা সমাজের ভয়ে তারা মনের কল্পনায়ই সুখতৃপ্তি পেয়ে নিজেকে শান্ত রাখছে। আমি ডাক্তার। আমি স্বাবলম্বী। তাই আমি হয়তো সাহস করে তোমাকে পাচ্ছি। আমার নিজের মনে কোনো পাপ নেই। তাই আমি আসব —যখন আমার মন তোমায় চাইবে আই উইল এনজয় ইউর কমপেনি। তোমার যতদিন আমাকে বিয়ে করে একসঙ্গে থাকার সাহস না হবে, ততদিন আমি আসব। তুমি বাধা দিলেও আমি জোর করে তোমাকে পাব। কেননা আমি জানি ও বাধা দেয়াটাই তোমার স্বভাবের দুর্বলতা।

টকটকে ফর্সা মুখ রক্তিম আভায় রাঙা হয়ে উঠেছিল মহুয়ার। মোমের পুতুলের এ উদ্ধত আবদার স্তব্ধভাবে সহ্য করেন না শ্যামল সেন। এ জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস, উন্মাদিনীর উল্লাস, এ লজ্জাহানার প্রাণচাঞ্চল্য শ্যামল সেনের পাষাণ হৃদয়ে কোনো ঢেউ তোলে না। সেই পরাজয়ের গ্লানি বহন করেই হন হন করে চলে যায় মহুয়া। 'মউ'—ডাকেন ডাঃ সেন। বাধা দিতে পারেন না তিনি।

—তুমি ভুল বুঝ না—আই অ্যাম স্যরি। কিন্তু···

—আই নো। সরি বললাম তো সাতখুন মাপ। যাক টেক্ কেয়ার—আজ যাই আবার হয়তো দেখা হবে—ম্লান হাসি টেনে বিদায় নেয় মহুয়া। ওর যাবার দিকে তাকিয়ে থাকেন ডাঃ সেন। পরক্ষণেই আবার বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকেন—এ সে কি করছে? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে মউ তাকে। এ কোন সর্বনাশের স্রোতে ভাসছে তারা? নিয়তির এ কি কদর্য বিদ্রূপ! যে বিষ ঢেলে দিয়ে গেল মউ—সর্বদেহে মনে তা ছড়িয়ে পড়ে ধীরে ধীরে। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরায় ডাঃ সেন কয়েক দিন। রাত্রে দুঃস্বপ্নে জেগে ওঠেন। আবার বিভিন্ন কাজ, চিন্তা ও সময় এসে প্রলেপ দিয়ে মুছিয়ে দেয় গ্লানি। হঠাৎ একদিন মনে হয় মৌ অনেকদিন আসেনি। মনে হতেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। একবার মহুয়ার সঙ্গে দেখা হওয়া বড় দরকার। প্রায় ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটিয়ে চলেন ডাঃ সেন।

মহুয়ার কথা ভাবতে ভাবতেই হাসপাতালের দরজায় এসে পোঁছলেন ডাঃ সেন।

—নমস্কার স্যার—পেছন থেকে কে ডাকল।

—চমকে ফিরে তাকালেন ডাঃ সেন। সোৎসাহে বলে উঠলেন, এই যে নরেনবাবু—কেমন আছেন মিসেস?

সদাহাস্য মুখে প্রশান্ত হাসি দিয়ে বললেন নরেন রায়, ভাল আছে অনেকটা, তবে পায়ের কোনো পরিবর্তন নেই। আপনি কি যাবেন একবার?

—হ্যাঁ যাচ্ছি। ও'র জন্যই তো এলাম। আজ আমার নিজের কোনো কাজই ছিল না। না এলেও চলতো—হাঁটতে হাঁটতে বললেন ডাঃ সেন।

—ইউ আর ভেরী কাইণ্ড স্যার—মাটিতে মিলিয়ে গিয়ে যেন বললেন নরেনবাবু।

—না না আপনি তো জানাশোনা। এখন তো আত্মীয়ের মতোই। তা ছেলে কেমন আছে? মাকে ছেড়ে বেচারার বোধহয় খুবই কষ্ট হচ্ছে। সহানুভূতির স্বরে বললেন ডাঃ সেন।

—হ্যাঁ, তা তো হবেই একটু। তবে সুলেখা দেখছে। ও তো প্রায় মায়ের মতোই। চলতে চলতে বললেন গভীর কৃতজ্ঞতার সুরে।

—তা প্রয়োজনে উপকার করবে বলেই তো মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্ক। বন্ধুত্বের টান। একে অন্যেকে অসময়ে তো দেখতেই হবে। দৃঢ়স্বরে বললেন ডাঃ সেন।

—তবুও তেমন ক'জন আর সংসারে পাওয়া যায় বলুন।

—হ্যাঁ, তা অবশ্য সত্যি। অসময়ে সব পালায়, তখন সবাই ব্যস্ত।

ওয়ার্ডে কেস রিপোর্টটা আবার উল্টেপাল্টে দেখে নার্সের সঙ্গে শর্মিষ্ঠার কেবিনে ঢুকলেন ডাঃ সেন। শর্মিষ্ঠা শুয়ে ছিল। ডাঃ সেনের গলার আওয়াজ পেয়েই যেন প্রাণ পেল। খানিকটা উৎফুল্ল হয়ে বলল, ভাল আছেন ডাঃ সেন?

—হ্যাঁ, আমি তো ভালই আছি। আপনি কেমন আছেন? বেশ হাল্কা চালে মাথা নাড়িয়ে বললেন ডাঃ সেন।

—সেটা তো আপনি জানেন—মিষ্টি হেসে বলল শর্মিষ্ঠা।

—আমি তো দেখছি আপনি আগের থেকে অনেক ইমপ্রুভ করেছেন। বেঁচে গেছেন এযাত্রা। এবার পায়ের জোর পাবেন। তবে হাঁটতে সময় লাগবে একটু। সেইজন্য সাহস, ধৈর্য ও মনোবলের প্রয়োজন। অধীর ও উদ্বিগ্ন হলে চলবে না কিছু। এমনি শরীর কেমন লাগছে?

—ভীষণ দুর্বল। মাথাটা এখনও ঘুরছে। কেমন যেন একটা বোঝা চাপানো আছে মনে হয়।

—ও কিছু না। ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করলেই আবার সব সেরে যাবে।

—ডাঃ সেন হ্যামার দিয়ে নিম্নাঙ্গ পরীক্ষা করতে করতে বললেন, হ্যাঁ এগুলো সবই সময়সাপেক্ষ। তাছাড়া আমরা তো মটর গাড়ি নই যে পার্টস চেঞ্জ করে দিলেই হৈ হৈ করে চলতে শুরু করবে। পার্টস ছাড়াও মন বলে একটা বস্তু আছে—ওটাই সবচেয়ে মুস্কিলের। সেটা দুর্বল হলে সবই এলোমেলো হয়ে যায়। স্বামী ছুটছেন, ছেলের চিন্তা, বাড়ির জন্যে মন খারাপ, তার ওপর নিজের কথা তো আছেই। এ সব চিন্তাগুলো কয়েকদিন দূরে রাখুন—দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তো আশা করছি সপ্তাহ খানেক পরে আপনি বাড়ি ফিরতে পারবেন। আমি অবশ্য ডাঃ বাসুর সঙ্গে এ-ব্যাপারে আলোচনা করব আবার। উনিই আপনার অপারেশন করেছেন।

ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানাল শর্মিষ্ঠা,—হ্যাঁ, ডাঃ বাসু কালকেই তাই বললেন।

—দুশ্চিন্তার কিছু নেই। চেষ্টা করুন পায়ের আঙুলগুলো নাড়াতে। পরে ফিজিও থেরাপী হবে।

মৃদু হেসে আশা ভরসা দিয়ে বিদায় নিলেন ডাঃ সেন। যাবার আগে নরেনবাবুকে পিঠ চাপড়ে বললেন, কোনো ভয় নেই, আর বড় জোর সপ্তাহ খানেক—তবে কি জানেন, সবার ওপরে আছে ভাগ্য। এটা ভালো না

থাকলে—

—তবুও আপনারা অনেক করেছেন।

—আরে ওটা তো আমাদের ডিউটি। ও হো যে কথা জিজ্ঞেস করব ভাবলাম—ডাঃ সেন কি যেন ভাবলেন একটু সময়, তারপর বললেন, আজকাল সুলেখা আসে না তো?

—নরেনবাবু উচ্ছ্বাসিত হয়ে বললেন, আজ আসবে। আসলে দু'দুটো বাচ্চার দেখাশোনা করে, অফিস করে আর সময় করতে পারে না। আমিই বলেছি ছুটির দিন ছাড়া তোমাকে যেতে হবে না।

—হ্যাঁ, সেটা ঠিক।

সহানুভূতির সুরে বললেন ডাঃ সেন।

—ও কিন্তু কাজের মেয়ে। মনটাও ভীষণ নরম। সুলেখা নিজের বোনের থেকেও আমাদের জন্য বেশি করছে—কৃতজ্ঞ গলায় বললেন নরেনবাবু।

—ও অনেক পাল্টে গেছে। আমি যখন দেখেছি তখন ওর বয়স এগার বার হবে। শহর থেকে গ্রামে গিয়েছিল দাদুর বাড়িতে। আমরা প্রথমটা ভাবলাম এ কোন মেমসাহেব এল। টুকটুকে গায়ের রং। বারোতেই রূপ যেন ফেটে পড়ছিল। সারা গাঁয়ে হৈ হৈ পড়েছিল। তখন কে ওকে খেলার দলে টানতে পারে তাই নিয়ে ঝগড়ার অন্ত ছিল না। অল্পদিনেই একেবারে গেছো মেয়ে হয়ে গেল। সাঁতারে, গাছে চড়ায় আর বনবাদারে ঘুরে বেড়াতে এক্স্‌পার্ট। এখন সে রূপও নেই, সে তাপও নেই। তাই হঠাৎ দেখে চিনতেই পারিনি। আমাকে অবশ্য সুলেখা চেনেই নি। তখন আমি একটু বেশিই মোটাসোটা ছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে ডাঃ সেন আবার বলে চললেন—গ্রামের পরিবেশ বড়ই মধুর। কখনো তা ভোলা যায় না। আর বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলো তো চমৎকার। মনে হয় ঐ সরল সহজ দিনগুলোতে আবার ফিরে চলে যাই—একটু থামলেন ডাঃ সেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে চুরুট ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা সুলেখা কখন আসবে? আমার একটু কথা ছিল।

—আমি ফিরলেই আসতে পারে। সময়টা ঠিক বলে নি—চিন্তিত

ভাবেই বললেন নরেনবাবু।

—চলুন আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসি, হয়তো জিজ্ঞেস করে দেখব কখন আসবে।

—আপনি চলুন না ওর বাড়িতে, সেখানেই দেখা হবে।

বিনীতভাবে অনুরোধ জানালেন নরেনবাবু।

—বেশ তাই চলুন—

—আপনাকে দেখতে পেলে খুব খুশি হবে সুলেখা। সেদিন কথায় কথায় আপনার প্রসঙ্গ উঠতেই ওকে খুব উৎসাহী মনে হলো। অবশ্য ছোট বেলার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে সবারই আনন্দ হয়। তাছাড়া ও আমাদের ছাড়া কারও সঙ্গেই মেলামেশা করে না। আমার সঙ্গে যখন তিনবছর আগে প্রথম পরিচয় হয়, তখন ভীষণ মরোজড় ছিল। যেন পাথরের মূর্তি একটি—কোনোরকমে নড়ছে চড়ছে। কোনো সাজসজ্জার বালাই নেই, চোখে মুখে কালো কালো দাগ। এক ঝটকায় দেখলে মনে হত টুবি রুগী। সব খবরা-খবর পেয়ে আমিই ওকে প্রায় জোর করে শর্মিষ্ঠার কাছে নিয়ে যাই। এর পর থেকেই বেঁচে উঠেছে। আপনি তো জানেনই শরীরের চেয়ে মনের অসুখ আরও মারাত্মক, তাতে মানুষ আরও ভেঙে পড়ে—

—হ্যাঁ, তা তো হবেই। শরীরের অসুখ হলে ভাল হবার এবং বেঁচে থাকার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। সেই জোরেই ভাল হয় অনেকটা। মানসিক রোগ হলে তো সেই বাঁচার ইচ্ছাটাই লোপ পায়। মনের শক্তি না থাকলে অল্পতেই ভেঙে পড়ে। একটা ব্যাপার কি জানেন—যে যত উচ্ছল, হাসি খুশি ও আপাত দৃষ্টিতে শক্তিশালী—সে আরও বেশি আঘাত পায়।

ধৈর্য ধরে পাশে বসে নরেনবাবু সবই শুনলেন। ডাঃ সেন যে সাধারণ জীবন সম্বন্ধেও কতটা ভাবতে পারেন তা ভেবে একটু অবাকই হলেন। মনে মনে তার অগাধ সংসার জ্ঞান উপলব্ধি করে শ্রদ্ধায় বুকটা ভরে গেল।

—আপনার ঔদার্য সত্যিই প্রশংসনীয়। বহুদিন বিদেশে থাকলে মানুষ তো অনেক পাল্টে যায়—সাহেব হয় শুনেছি। অথচ আপনার সঙ্গে কথা বলে মনেই হয় না আপনি এত শিক্ষিত—বিলেত ফেরৎ ডাক্তার। বিনম্র ভাবে

বললেন পরেশবাবু।

—ওটা ভুল ধারণা। খাঁটি সোনা কখনই পালটায় না বরং আরও খাঁটি হয় বিদেশে গিয়ে। সাহেব সম্বন্ধে ওটা ভ্রান্ত ধারণা যে সাধারণ মানুষকে তারা মানুষ হিসেবে গণ্য করে না। বরং উল্টো। বিদেশে আপনজনকে তারা খুব ভালবাসে। আমরা শিক্ষা পেয়ে অর্থ পেয়ে নব্বুই ভাগ দেশবাসীকে পর করে দেই—সেটা হয়ত আমাদের সমাজ ও মাটির দোষ। অবশ্য আমি বলছি না আমি সোনা বা রুপো তবে এটা সত্যি নতুন জন্ম হয়নি আমার বিদেশে। ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন, অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতে: পরিহাসের সুরে অট্টহাসি দিলেন ডাঃ সেন।

—আপনি অঙ্গার নয়—বলতে পারেন কোন মাইনের এক বিরাট ডায়মন্ড। গর্বিত স্বরে নরেনবাবু মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন।

—আর বেলুন ফোলাবেন না—এমনই প্রাকটিস হচ্ছে না—আর ফোলালে ফেটেই যাব—হাসতে হাসতে বললেন ডাঃ সেন।

—প্রাকটিস দারুণ হবে আপনার। এদেশে সবকিছুতেই একটু বেশি সময় লাগে। একবার আপনার সংস্পর্শে যে আসবে সেই আপনার ব্যক্তিত্বের চুম্বকে আটকে যাবে। একটু ধৈর্য্য ধরুন। আমি তো জানিই না আপনার চেম্বারটা কোথায়। আমার যারা জানাশুনা তাদের আপনার কার্ড দিয়ে দেব। প্রথম প্রথম একটু ছাড়তে হবে সুতো। একবার টোপ ধরলে তখন বঁড়শি টানবেন। অনেক সদ্যফেরা ডাক্তারবাবুরা ভুল করেন—দরাদরি করেন না এখানে আর খুবই আড়ষ্ট ভাব। ডাক্তারী যে একটা ব্যবসা সেটা প্রথম প্রথম বোঝে না তাই একটুতেই রেগে যান বা নিজের আহামরিতে জলে মরেন। এ শহরে তা চলবে না। প্রথমে মাথা নিচু করে বিনীত ভাবে ঢুকতে হবে—পরে ঝেঁটিয়েও তাদের পারবেন না।

—বাঃ আপনার তো ডাক্তারদের সম্পর্কে বেশ জ্ঞান আছে—স্মিতহাস্যে তারিফ করলেন ডাঃ সেন।

—তা একটু হয়েছে। আমার মামাত ভাই আপনার মতোই অনেকদিন পর বিলেত থেকে ফিরেছিল ফেলোশিপ করে। ভেবেছিল দমদমে নামা মাত্র

সারা বাংলা ফুলচন্দন নিয়ে এয়ার পোর্টে এসে ভিড় করবে। কিন্তু সেদিন তো আর নেই। এমন বিদেশ প্রত্যাগত ডাক্তার অনেক আছে। সাধারণ মানুষের ক্ষমতা সীমিত। যাদের পয়সা আছে তারা নামকরা ডাক্তারের কাছে যায়। কিন্তু সে ধৈর্য নেই তার। এক বছর মশার কামড় খেয়ে কলকাতা ও ভারতকে গালাগাল দিতে দিতে আবার ফিরে চলে গেল। কেউ একফোঁটা চোখের জলও ফেলল না। সে অবশ্য ইংরেজী ছাড়া বাংলায় কথাই বলতে চাইত না। কলকাতাকে ভালবাসে খুবই—কিন্তু টিকতে পারল না। তাকেও অনেক বুঝিয়েছিলাম থাকার জন্য।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন নরেনবাবু, সহজ জীবন ও সহজ আর ছেড়ে আবার নতুন করে শুরু করা খুব সহজ নয়। তাছাড়া বেশিদিন থাকলে সে দেশটাও আর পর মনে হয় না। বিদেশে বন্ধু ছাড়া শত্রুর সংখ্যাও কম। আত্মীয় স্বজনের ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নেই। এই সব কারণেই ফিরে এসে টিকে থাকা শক্ত। অনেকে সেন্টিমেন্টের জন্য ও নিজের আইডেন্টিটির জন্য ফিরে আসে নিজের দেশে। বিদেশে সব ভালো হলেও নিজের বলে মেনে নেয়া সম্ভব না। তবে ঐ সবই মনের ব্যাপার। যে যেখানে সুখে থাকে—সেই তার দেশ।

—দেখুন আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের সহজ জীবনে এই শহরই তীর্থস্থান—তাই না? আলতো করে মাথা নেড়ে বললেন ডাঃ সেন।

এরই মধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। গরম ভাবটা কমে ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। বাড়ির কাছাকাছি পেঁছিতে দুজনেই নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

দ্বিধা ও লজ্জায় ডাঃ সেন একটু সংকোচ বোধ করলেন। এতক্ষণ কথাবার্তার মধ্যে অন্যমনস্ক ছিলেন। এখন কি কারণে বুকটা ঢিব ঢিব করতে শুরু করল। কপালে কিছু কিছু ঘাম ফুটে বেরোল। অস্বস্তি ও উত্তেজনায় স্নায়ুগুলো যেন শক্ত হয়ে উঠেছে। আড়ষ্টতার আবরণে দেহটা যেন অসার হয়ে উঠল। কি বলতে যে এসেছেন তাই ভুলে গেলেন।

বিপন্ন হয়ে অস্ফুটে বললেন, থাক আমি না হয় আর নাই বা গেলাম। হাসপাতালেই কথাবার্তা হবে।

নরেন রায় বুঝলেন। এমন একটা অনুমানও যে করেন নি তা নয়। সে ভাবে আসতে আসতে মনটাকে প্রস্তুতও করেছিলেন। তাই ঝট করে হাতটা ধরে ফেলে বললেন, প্লিজ, আমি রিকোয়েস্ট করছি আসুন। এটা আমার বাড়ি না হলেও সুলেখা ও আমার দুজনের তরফে আপনাকে অনুরোধ করছি। প্লিজ। এখান থেকে ফিরে গেলে সুলেখা আঘাত পাবে।

—না, না, সে তো না বললে জানবেই না।

না, আপনি আর না করবেন না···প্লীজ—

—আচ্ছা বেশ চলুন—নরেন বাবুর অনুরোধ এরপর আর ফেলতে পারলেন না ডাঃ সেন। তাছাড়া এতদূরে আসবে বলে এসেও যদি বাড়িতে না ঢুকে ফিরে যান তা হলে সেটা মনের দুর্বলতার জন্যই। সে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। ভাবতে ভাবতে গাড়ি থেকে নামলেন ডাঃ সেন। গম্ভীর ভাবে বললেন, না বলে আসাটা ঠিক হলো না। আমাকে দেখে কি জানি হয়তো অস্বস্তি বোধ করবে কিংবা ব্যস্ত হয়ে পড়বে বা···

মুখের কথা শেষ না হতেই নরেনবাবু বাধা দিয়ে বললেন, ছেলেবেলার বন্ধু, দেখলে খুশিই হবে। চলুন তো। পরে ওসব ভাববেন—

সুলেখা দরজা খুলেই অবাক। পাশ কাটিয়ে নরেন রায় ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, দেখ কাকে ধরে নিয়ে এসেছি। দোরগোড়ায় এসেও চলে যেতে চাইছিলেন।

নরেন রায় ভেতরে ঢুকলেন। তার গলার শব্দে বাবা এসেছো তুমি—বলতে বলতে সমর এল। তার পেছনেই পদ্ম।

—কাকু, কাকীমা ভাল আছেন তো? জিজ্ঞেস করল পদ্ম প্রথমেই। সমরের মুখেও তখন একই প্রশ্ন।

—চল, ভেতরে বলছি—দু'জনের হাত ধরে পরে ভেতরে নিয়ে বললেন, তোমাদের এক নতুন আংকেল এসেছেন। খুব বড় ডাক্তার। উনিই সমরের মাকে দেখছেন। তাছাড়া উনি আবার ছেলেবেলায় পদ্মর মায়ের বন্ধু ছিল। তোমরা কিন্তু একেবারেই দুষ্টুমি করবে না। তাহলে উনি হয়তো কোনোদিনই

আর আসবেন না।

—কই দেখি, বলে দু'জনেই দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দেখল। পরে ভেতরে ঢুকে বলল, আংকেলকে বেশ ভাল দেখতে। সাহেব সাহেব মনে হচ্ছে—

—সাহেবই তো। কিছুদিন হলো বিলেত থেকে ফিরেছেন। পরে তোমাদের বিলেতের গল্প বলবে। এখন বিরক্ত করো না কিন্তু। তোমরা বরং ক্যারাম বোর্ডটা নিয়ে বস।

নিচু গলায় ফিসফিস করে বললেন নরেনবাবু। ইচ্ছে করেই জামা জুতো খুলে গামছাখানা নিয়ে বলল, আমাকে মাপ করবেন, আমি চট করে চানটা সেরে নিই।

উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই তিনি বাথরুমে ঢুকলেন।

সুলেখা চোখে যেন ভূত দেখছে। অলীক কল্পনা যে করে নি তা নয়, মনের গভীরে ভেবেছিল হয়ত একদিন আসবেন ডাঃ সেন। কিন্তু সে সামনে এসে আচমকা যখন দাঁড়িয়েছে তখন হৃদয়টা ধড়ফড় করে উঠেছে। মনের ভেতরে একটা বালকোচিত চঞ্চলতার ঝড় উঠেছে।

খানিকক্ষণ দু'জোড়া চোখ আটকে গিয়েছিল। সে দৃষ্টিটার বিদ্যুৎপ্রবাহে দুটো হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছিল। অসংখ্য অব্যক্ত অবর্ণনীয় ভাষা যেন চুপিচুপি আনাগোনা করছিল। চকিতে সামলে নিয়ে মাথা নাড়িয়ে সুলেখা আহ্বান জানাল, এস—ভেতরে এস।

ডাঃ সেন ম্লান হেসে বললেন, আসব বলেই তো এলাম। তবে না বলেই চলে এলাম।

—খুব ভাল করেছ খুব খুশি হয়েছি, এস—তারপর দরজাটা বন্ধ করে সোফার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, বস। গরিবের বাড়ি এসেছ গাটা একটু শিরশির করবেই। এটা আমার বাবার বাড়ি। তিনি এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটা আমাকে দিয়ে গেছেন।

—বাঃ ভালই তো। কলকাতায় এই ফ্লাট পেতেই এখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে। প্রচন্ড ভাড়া, প্রচুর সেলামী, তাও পাওয়া যায় না।

—আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে এসেছ যখন—সলজ্জিত সুরে

হাত জোর করে বলল, সুলেখা।

—জানি কি বলবে। কিন্তু সেটা কি জানিয়ে অন্যদিন হলে ভাল হত না? গম্ভীর ভাবেই বললেন ডাঃ সেন।

—নেমন্তন্ন করে পরে নিশ্চয়ই খাওয়াব। আজ যা রান্না করেছি তাই খেয়ে যেতে হবে।

—ও কে! বাবা ঠিক আছে। একসময় তো তোমার হাতের আম, আমড়া আর চালতে-মাখা খাবার জন্য হাত পা ধরতাম। ও! আজ ভাবলেও জিবে জল আসে।

সত্যিই ঢোক গিললেন ডাঃ শ্যামল সেন। তারপর তাই পদ্ম ও সমরের দিকে তাকিয়ে রসিয়ে রসিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন। কি ভাবে ঝিনুক ফুটো করে তাই দিয়ে টক ফলগুলোকে কাঁচালঙ্কা, আখেরগুড় দিয়ে মেখে মাটির পাত্রে তারা ছোটবেলা তিন চার জনে বসে বসে খেতেন।

অনতিদূরে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে শুনছিল সুলেখা। তার সমস্ত দেহে মনে রোমাঞ্চের ঝড় বয়ে গেল। আশ্চর্য! এখনও সেই সব ঘটনা অমন সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ভাবে মনে রেখেছেন শ্যামল সেন।

মেয়েদের বুঝি এইই হয়। সেই হাসপাতালে দেখা সুলেখা এই ক'দিনেই যেন কত পাল্টে গেছে। তখন যেমন রুক্ষ্ম কালচে ঝড়ে পড়া কাকের মতো শ্রীহীন মনে হয়েছিল, আজ যেন সেই গ্রামের সুলেখাই অনেকটা ফিরে এসেছে। সেদিন কোন নেশার ঘোরে হঠাৎ দেখা ও কিছুক্ষণ একসঙ্গে বসে থাকলেও দৃষ্টিটা বুঝি কোন সুদূরে পড়ে ছিল। না কি শাঁমষ্ঠার অসুস্থতা, দুটো বাচ্চা ও নরেনবাবুকে সামলানো আর সারাটাদিন ছোটাছুটি তাতেই হয়তো আসল রূপটা ঢাকা পড়েছিল।

নিজেকে সহজ ও আপন করার জন্য পদ্ম ও সমরেশকে কাছে ডাকলেন ডাঃ সেন। ধীর পায়ে তারা দুজনে এল। ডাঃ সেন দুজনকে দুদিকে বসিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও নানা গল্প করে পরিবেশ ও সম্পর্কটা সহজ করে ফেললেন। ততক্ষণে নরেন রায় স্নান সেরে ঢুকলেন। সুলেখা ইশারায় জানাল, আপনি গিয়ে গল্প করুন ততক্ষণে আরও দুটো পদ রান্না হয়ে যাবে

পদ্ম ও সমরেশেরও খাওয়া হয়ে যাবে।

নরেনবাবু হেসে মাথা নেড়ে বসার ঘরে ঢুকে পদ্ম ও সমরকে বললেন, পদ্ম ও সমর তোমরা খেয়ে নাও, তারপর আমরা বসব।

পরে ডাঃ সেনের উল্টোদিকের চেয়ারে বসে বললেন, আমরা, ডাক্তারবাবু, যেমন ছিলেন তেমনি আছি। এখানে কিন্তু নিচে বসে খেতে হবে, ডাইনিং টেবিল নেই। আসলে দরকারও হয় না। এইভাবেই চলে যাচ্ছে।

—তাতে কি হয়েছে বহু বছর আমিও তো সেভাবেই বড় হয়েছি। তবে হ্যাঁ অনেকদিনের অভ্যাসে এখন অবশ্য চেয়ার টেবিলেই অভ্যস্ত। তবে ভালবেসে মাটিতে ছুঁড়ে দিলেও হরির লুটের বাতাসা অমৃত। আর তাচ্ছিল্য করে মুরগা মসলম দিলেও তা বিষফলের মতোই তেতো। সব কিছুই মন ও সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে। মায়ের পায়ে গোদ, আর তার ওপর ফোঁড়া থাকলেও সে মায়েরই পা—তা বলে সেখানে প্রণাম না করে কি ফর্সা মেমসাহেবের পায়ে প্রণাম করব? তবে হ্যাঁ, কেউ কেউ তা করে। বিলেতে দেখেছি অনেকে 'ওঃ কোলকাতা' বলে থু থু ছেটায় আর আইরিশ পতিতার পা চাটে। তবে কি জানেন, একদিন ঠিক বুঝবে গঙ্গার ঘোলা জল আর লিভারপুলের নীল সাগরের তফাৎ কী! যৌবনে যা চোখ ধাঁধিয়ে অন্ধ করে, প্রৌঢ় বয়সে পৌঁছে তাই-ই বুকে ক্রুশ হয়ে ঢুকবে। অবশ্য এ নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত ধারণা। তবে সেই স্বদেশঘৃণা করা স্বার্থান্ধ অর্থলিপ্সু লোভীদের আমি বরদাস্ত করতে পারতাম না। তাই তাদের কথা মনে পড়লেই গা-টা রি রি করে ওঠে।

—না সেটা ঠিক নয়। গম্ভীর ভাবে বললেন নরেনবাবু, আমার মাসতুতো ভাই কিন্তু তা বলেনি। সে বলেছে, আমার কলকাতায় রুটি রোজগার হলো না তাই বিদেশে যাচ্ছি। তা বলে দেশের অবমাননা করে নি। আমরা গরিব আমাদের জীবনযাত্রা ভিন্ন। তা বলে নিজের বাবা মা পূর্বপুরুষ আত্মীয়স্বজন সবাইকে ঘৃণা করবে—না সেটা ঠিক নয়। আমার মনে হয় নিজে পরাজিত বলেই সে দেশকে ছোট করছে। নয়ত বিদেশ থেকে যারা আসে কই এখানকার সাফল্যমণ্ডিত মানুষের থেকে তাদের চেহারা তো ভিন্ন

কিছু নয়।

—তাদের জীবনযাত্রা সহজ, আয় সহজলভ্য। তবে হ্যাঁ, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে মনে মনে ক্ষুব্ধ। অন্তর্দাহ প্রচণ্ড। তা মেটাতে বড় বড় বাড়ি আর বড় বড় গাড়ি কেনে। যেমন অশিক্ষিতা মেয়েরা গোছাগোছা সোনার গয়না পরে আর শিক্ষিতা মেয়েদের কাছে একটা বালা আর একটি ঘড়ি। তাই খুব ভারী তাদের কাছে। যার মূল্য আছে তার আভরণের প্রয়োজন কি? আর ঠিক এই কারণেই বিদেশের বাঙালিরা আপনি গেলে তাদের সাম্রাজ্য দেখাবে অত্যন্ত গর্ব করে। কারণ ওই অন্তর্দাহ। সে নিজের দেশে স্থান পেল না—সহজলভ্য স্থানে বটবৃক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য দোষ তাদেরও নয়। ভাগ্য ও পরিবেশ। এখানেও এত অরাজকতা···

কথার মাঝখানেই ঘরে ঢুকেছিল সুলেখা। দু'জনের দিকে তাকিয়েই বলল, খাবার দিয়েছি—এস।

তার চোখে মুখে জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস ও তৃপ্তির রক্তিম আভাস।

সমরেশ ও পদ্মর খাবার ব্যবস্থা করতে করতেই স্টোভে পোস্ত ও ভাজাভাজিগুলো করে ফেলেছিল সুলেখা। সারা সপ্তাহে রোববার ছাড়া সময় কই। তাই ফ্রিজ একটা কিনে নিয়েছিল। কিন্তু সংসারে দুটি মাত্র প্রাণী, তাই ডাইনিং টেবিলের আর প্রয়োজন হয়নি।

পদ্মর পড়ার টেবিলটা পরিষ্কার করে তার ওপরই খাবার ব্যবস্থা করল সুলেখা। ট্রাউজার পরে মেঝেতে বসে খাওয়া সহজ নয়। তার ওপর যাদের অভ্যেস নেই তাদের পায়ে ঝিঁঝি ধরে। যত্ন করে গুছিয়ে খেতে পারে না। ভীষণ অস্বস্তি হয়। সেটা জেনেও সুযোগ থাকলে কষ্ট দিয়ে লাভ কি। ভাবতে ভাবতে আয়োজন করল সুলেখা।

—নরেন বাবু, আসুন খেতে দিয়েছি। এস শ্যামল দা—ডাকল সুলেখা। একটু পরে ওরা ঢুকলে বলল, তেমন কিছুই নেই কিন্তু আজ নিতান্তই ডাল ভাত, পরে একদিন ভাল করে খাওয়াব।

বিনীত ভাবে মার্জনা চাইল সুলেখা।

—বাচ্চা! এই তোমার ডাল ভাত! ঢুকেই বললেন শ্যামল সেন।

সে তখন বড় বড় চোখ করে বাটিগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল।

নরেনবাবু সোৎসাহে বললেন, ওর কথা আর বলবেন না। আমাকে যেভাবে প্রতিদিনই জামাইষষ্ঠি খাওয়াচ্ছে জানি না নিজের জামাইকে কি খাওয়াবে। আসলে সুলেখা রাঁধতে ও খাওয়াতে ভালবাসে।

পাশের বেসিনে হাত ধুতে ধুতে শ্যামল সেন বললেন, এ ভাল লাগাটা সবচেয়ে ভাল। মানুষ খেয়ে যত তৃপ্তি পায় অন্য কিছুতে তা পায় না। আমাদের পুজো অর্চনায় দেখুন না যত বড় পুজো তত বেশি নৈবেদ্য। সবচেয়ে বড় মাপে ষোড়ষ উপচারে পুজো—যত রকম মাছ সম্ভব—তার ওপর বলি। এর মানেই খাওয়ার ওপর আকর্ষণ বাড়ান।

—তা তো নিশ্চয়ই—মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন নরেনবাবু, তবে সব কিছু এমন দুর্মূল্য যে বাজারে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখের উনুনে রান্না করে কল্পনার মুখে আস্বাদ নেয়া ছাড়া বাস্তবে ভাল খাওয়া দাওয়া অসম্ভব। আমি তো গলদা চিংড়ি বড় বড় রুইমাছ তাকিয়ে দেখি আর কল্পনা করি গিন্নি রান্না করে সাজিয়ে দিয়েছে আর আমি খাচ্ছি। কেনার সময় ওই গতানুগতিক এক টুকরো পোনা নয়ত ইলিশ।

—তার কারণ পপুলেশন একস্‌প্লোশন। যে হারে মানষ বাড়ছে তাতে একসময় শুধু সয়াবীনের গুলি খেয়ে থাকতে হবে! স্মিতহাস্যে বললেন ডাঃ সেন।

—এবার খেতে বসুন তো, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আলাপ আলোচনা পরে হবে—কৃত্রিম আদেশের স্বরে বলল সুলেখা।

—তুমি বস—বললেন নরেনবাবু।

—আপনাদের দিয়ে তারপর খাব।

সুলেখার কথায় কি বলতে যাচ্ছিলেন নরেন রায়, হঠাৎ শ্যামল সেন বলে উঠল, বাহঃ দারুণ হয়েছে তোমার রান্না। তবে মাঝে মাঝে এসে এবার একটু উৎপাত করব কিন্তু—

সুলেখা একটু অন্যমনস্ক হয়ে শ্যামল সেনের আঙুল চাটা দেখছিল। গ্রামের সেই আম মাখা, তেঁতুল মাখা খেয়ে শ্যামলদা ওইভাবেই আঙুল চাটতো

হাসপাতালের পোর্টারকে দু'দিন বখশিস দিয়ে সেলাম পেয়েছে সুলেখা। তার কাছ থেকেই কথাপ্রসঙ্গে জেনেছে শ্যামলদা অবিবাহিত। বছর খানেক আগে বিলেত থেকে ফিরেছেন। এলগিন রোডে ফ্লাট নিয়েছেন। সে ফ্লাটের নিচেই চেম্বার। শ্যামলদা তার সম্বন্ধে কতটুকু জানে কে জানে। সে নিজে তো কিছুই বলে নি। তবে নরেনবাবু নিশ্চয়ই যাতায়াতের পথে কিছু না কিছু বলেছে। প্রশ্ন যখন আর করেন নি তখন উত্তর নিশ্চয়ই জানেন। এসব ভাবতে ভাবতেই খাওয়া শেষ করল সুলেখা। কাজকর্ম শেষ করে গল্পে যোগ দিয়ে বলল, আমি শমিকে দেখতে যাব, তুমি নামিয়ে দেবে আমাকে? সঙ্গে ওদেরও একটু নিয়ে যাব—

—অফ্ কোর্স। চল না—জোর গলায় বললেন শ্যামল সেন।

সে বিকেল ও সন্ধেটা বড় ভাল কাটল সুলেখার। অনেকদিন পরে সুলেখা মুক্ত আকাশ দেখল। কলকাতায়ও কত সবুজ, কত ঘন রঙ আছে, কত বিভিন্ন ফুলে ফোটে তা যেন প্রথম লক্ষ্য পড়ল। গড়ের মাঠে কত মানুষ মুক্ত হাওয়ায় সুখ অনুভব করছে। গঙ্গার পাড়ের মৃদুমন্দ বসন্তের মধুর বাতাস। ঝাল মুড়ি, আইসক্রিম, বাদাম। পদ্ম ও সমরেশের আনন্দ আর ধরে না। তারাও দৈনন্দিন জীবনের চারদেয়াল থেকে মুক্তি পেয়ে আবেগে আত্মহারা হয়ে গেছে। তাদের চোখেমুখে শ্যামল আংকেলের প্রতি মুগ্ধ প্রশংসা।

হাসপাতালে নেমেই সুলেখা বলেছিল, তুমি এবার যেতে পার। আমি ওদের নিয়ে যাব খন।

স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষন তাকিয়েছিলেন ডাঃ সেন। তারপর বিষণ্ণ মুখে বললেন, আমার আজ কোনো কাজ নেই—না হয় চল না কিছুক্ষণ তোমাদের সঙ্গে ঘুরি। নিজের তো সংসারও নেই, হয়ত এদিকে যেতে পারি। তোমার আপত্তি না থাকলে ওদের একটু ঘুরিয়ে না হয় বাড়ি পৌঁছে দেব।

কি জবাব বেবে ভাবছিল সুলেখা। সংকুচিত ও ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, না না—আমি তোমার কথা ভাবছিলাম। হয়ত চেম্বার বা রোগী থাকতে পারে। আমাদের তো ভালই হবে তুমি পোঁছে দিলে।

পেছন থেকে পদ্ম বলে উঠল, প্লিজ আংকেল, আমাদের গড়ের মাঠে নিয়ে চল না। সমরেশ বলল, না আমি গঙ্গার পাড়ে যাব।

—আচ্ছা বাবা যাবে। আগে মাকে তো দেখে আসি। তার কথা না ভেবে নিজেদের কথা ভাবছ—শাসনের সুরে ধমক দিয়ে বলল সুলেখা।

—ওদের বকছ কেন? এই সরল সহজ মনগুলোকে বেঁকিয়ে দিও না। কি মধুর সম্পর্ক ওদের। লজ্জা দ্বিধা সংকোচ কিছু নেই।

—একসময় সবই ধীরে ধীরে আসবে। নিচু সুরে বলল সুলেখা। বলে চকিতে সলজ্জ মুগ্ধ চোরাদৃষ্টিতে তাকাল শ্যামল সেনের দিকে।

গড়ের মাঠ, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল ও গঙ্গার পাড় বেড়িয়ে একসময় ক্লান্ত হয়েই ফিরেছিল ওরা। শর্মিষ্ঠা অনেকটা ভাল হয়ে উঠেছে। দুই বন্ধুর হাসিও চোখের জলে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ছেড়ে আসতে বুকটা ব্যথায় ভরে গিয়েছিল। তবু ভাল হবার আনন্দ বিষাদকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় শর্মিষ্ঠা ও নরেনবাবুর গল্প করেই সময়টা কাটিয়ে দিয়েছিল। বাদবাকি সময় কেটে গেল সেই গ্রামের বন্ধু বান্ধবদের খবরাখবরে। নিজেদের প্রসঙ্গ তুলতে কেউই চায়নি। মাঝে সুলেখা একটু নাড়া দেবার চেষ্টা করেছিল মাত্র। বলেছিল, তুমি এখনও অবিবাহিত থাকলে কেমন করে?

হকচকিয়ে গিয়েছিলেন শ্যামল সেন। চট করে উত্তর দিতে পারেন নি। পরে সামলে নিয়ে মিষ্টি হেসে বলেছে, অধিক সুন্দরীর বিয়ে হয় না।

—তার মানে? অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিল সুলেখা।

—আসলে আই মিসড দ্যা বোট। অর্থাৎ সব সময়েই ভেবেছি আরও ভাল কেউ জুটবে। অথবা পড়া ও কাজ নিয়েই এমন ব্যস্ত থেকেছি যে ওটা ঠিক মাথায় আসেনি। যখন এল, তখন মনে হয়েছে বিয়ের নৌকো আমায় ফেলে অনেক আগেই সরে পড়েছে। আবার এটাও সত্য যে সুযোগ

হয়নি। প্রেমে পাড়িনি। মেয়ে দেখে বিয়ে দেবারও কেউ নেই। বিদেশে যে বছরগুলো হৈ হৈ করে চলে গেছে তার হিসেব রাখিনি। এই বিভিন্ন কারণে যৌবনচর্চা করলেও সংসার চর্চাটা করা হয় নি।

—ও—বলে প্রসঙ্গ পাল্টে নিয়েছিল সুলেখা, তোমার বাবা-মা কেউই বেঁচে নেই তাহলে?

—না—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ডাঃ সেন, আমার ফেলোশিপ পরীক্ষার আগে ও পরে অল্পসময়ের ব্যবধানেই তারা চলে গেছেন।

—আর তোমার সেই ভাই?—

—সে বাবার যায়গায় বসে রসোগোল্লা বেচছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর শ্যামল সেন বললেন, চল না কাল একবার আমাদের গ্রাম থেকেই সবাই মিলে ঘুরে আসি। মাত্র ঘন্টাদেড়েক লাগবে। গাড়ি নিয়ে যাব আবার খাওয়া-দাওয়া করেই ফিরে আসব।

—যেতে পারি। আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে—

—তবে কি! চোখের কোণে প্রশ্ন রেখেই জানতে চেয়েছিলেন ডাঃ সেন।

—শর্মিষ্ঠা একটু ভাল হলে না হয় যাব—

—বেশ তাহলে পরের রোববার চল। ততদিনে মনে হয় মিসেস রায় অনেকটাই ভাল হয়ে উঠবেন।

সম্মত না হয়ে পারেনি সুলেখা। তবে শর্ত—যদি শর্মি ভাল হয়ে ওঠে

—বেশ পরের শনিবারে আমিই খবর নেব। শ্যামল সেন বললেন, বেশ লাগবে—দেখবে তুমি খুব এনজয় করবে। এত বছর পর সেই পুরনো স্মৃতি যখন জ্বলজ্বল করে উঠবে রোমাঞ্চ, আর আনন্দে খুশিতে তোমার বুক ভরে উঠবে—

—জানি। তাইতো ভাবছি ভাল মন নিয়ে যাব। বুকে ব্যথা থাকলে সে আনন্দ অনুভব করতে পারব না। তুমি তো ঠিক জান না শর্মি আমার কত বন্ধু। যতদিন ও ভাল না হবে আমার মনে শান্তি নেই—অশ্রুভেজা গলায় বলেছিল সুলেখা।

—বুঝতে পারছি—সমবেদনায় আর্দ্রকণ্ঠে বললেন শ্যামল সেন।

—তুমি কিন্তু মাঝে মাঝে এসে খাওয়া দাওয়া করে যেও। যা বন্ধু হলে পদ্ম আর সমরের। এরপর থেকে আংকেল আংকেল—করে পাগল হবে। এমন সাহেবের মতো গাড়িওয়ালা আংকেল পেয়েছে।

প্রসঙ্গ পাল্টাতে ওদের হয়েই বলে গেল সুলেখা গাড়িতে ফিরতে ফিরতে।

—আমারও তো কেউ নেই এ শহরে। সময় কাটাতে আসব নিশ্চয়ই। আর ছোটবেলার বন্ধুত্বের মধ্যে একটা আলাদা প্রাণের টান থাকে। পরবর্তী জীবনের বন্ধুত্বের মধ্যে ষড় রিপুর ভেজাল থাকে। কিন্তু এ বন্ধুত্ব একেবারে খাঁটি।

গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মাখানো দৃষ্টিতে চেয়েছিল সুলেখা। প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথার রাগিনী আবহ সংগীতের মতো বেজে চলে। এইটুকু সময়ের সুখতৃপ্তি আনন্দ আবেগ···সবকিছুর পেছনে একটা চাপা গোঙানি অন্তরে গুমরে ওঠে। একটা মন যখন সুখের অমৃত পানে নিমগ্ন, অন্য মন তখন বিষাক্ত সাপের ছোবলে ক্ষত বিক্ষত। তবুও ভাবে জীবনটা নিজের। জীবন এই একটাই। সমাজ ও ধর্ম—নিজের আত্মা ও প্রাণের শান্তি ও তৃপ্তির বিরোধী হতেই পারে না। মানুষের সুখের জন্য আনন্দের জন্যই তার উৎপত্তি। বিবেক সায় দিলে নিজেকে বিনা কারণে আত্মতৃপ্তি থেকে বঞ্চিত রাখাই বরং অন্যায় ও নিজের আত্মার প্রতি অবিচার করা। ভালবেসে কাউকে মন প্রাণ দিলে তা ধর্মত সমাজের পরিপন্থী হতেই পারে না। এভাবে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে নিজেকে নতুন করে নতুন ভাবে সাজাবার চেষ্টা করে সুলেখা।

গাড়ি ততক্ষণে বাড়ির কাছে এসে পড়েছে।

একটু পরে ওদের নামিয়ে দিয়েই, এই যাঃ—ঠিক আটটায় এক রোগীর বাড়িতে যেতে হবে—বলে পরেই আবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিজেকে আশ্বস্ত করেন শ্যামল সেন, ওঃ এখনও মিনিট পনের বাকি আছে···যাক তাহলে আমি আসি এখন—পরে আবার দেখা হবে—

বলতে বলতে গাড়ি ঘুরিয়েই বিদায় জানিয়ে শ্যামল সেন চলে গেলেন। আর যতক্ষণ পায় সেদিকেই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুলেখা।

গাড়িটা মিলিয়ে যেতেই পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকল সুলেখা। মনের ভেতর ততক্ষণে অনেকদিন পরে একটা গানের কলি ভেসে এসেছে।

সোনার বরণী রঞ্জিতা রমণী
বেহুঁশ বিবশ মনে
উদাস আবেগে মধুর আবেগে
কি যেন ভাবিয়া মরে।...

বেশ লাগছে মনটা। গান শেষ হতেই যেন মনের ভেতর একটা তৃপ্তির ছোঁয়া লেগেছে। মনটা যেন উড়ে যাচ্ছে অনেক দূরে—

ঘরে ফেরার পরও সামান্য কিছু কাজ থাকে। সেটুকু সেরে সমরেশ ও পদ্মকে খাইয়ে শুইয়ে দিয়ে আরেকবার চান করে নিল নিজে। এবারে বেশ ঝরঝরে লাগছে। ব্যাকুল মনটা বড় চঞ্চল। বাতাসের দমকায় কাঁপতে থাকা প্রদীপের শিখার মতো।

জানলার কাছে এসে দাঁড়ায় সুলেখা।

কয়েক সপ্তাহ দেখতে দেখতে চলে গেল। কেটে গেল গতানুগতিক ঘটনা প্রবাহের আলতো ঢেউ তুলে। কত গাঙে কত ঢেউ উঠল আর মেলাল কে আর তার হিসেব রাখছে। সুখ-দুঃখ-আনন্দ ব্যথা উন্নতি অবনতি ইত্যাদির ইতিহাস বালুতটে এঁকে সময় চলেছে—মানুষ চলেছে। সে যে কেন এসেছে, কেন আছে আর কেনই বা যাচ্ছে তা কে জানে! এফিসিএন্সির সর্বোচ্চ পয়েণ্টে ওঠা মাত্রই তার নিম্নগতি বা ভাঙ্গন শুরু। উড়ন তুবড়ির মতো আগুনের ফোয়াড়া ছোটাতে ছোটাতে যখনই সর্বোচ্চ স্থান দখল করল সেই মোমেণ্টেই সে ধারিত্রীর পানে আরও বেগে ফেটে পড়তে ছুটল। ওই বারুদ, ওই ওঠা, ওই স্বপ্নটুকু নিয়েই বিভ্রান্ত হয়ে সব ছুটছে। যার যেমন বারুদ সে তত ওপরে ছুটতে পারছে—নিয়তির নিষ্ঠুরতায় সে মাটির খোলও অনেক সময় উড়বার আগেই ফেটে পড়ছে। কেউ নিভে যাচ্ছে পড়েই—কেউ বা আগুন জ্বালিয়ে

স্থানাঞ্চন্য হয়ে থাকছেন কিছুক্ষণ।

সেদিন কিন্তু ছাড়েননি শ্যামল সেন। সুলেখা, পদ্ম ও সমরেশকে পাকরাও করে নিয়ে গেলেন তার গ্রামের বাড়িতে। ভাই বিমল খুবই খাতির ও আদর-যত্ন করল। সেন সুইটস- একচেটিয়া মিষ্টি বিক্রেতা। বাবার দোকানের সুনাম রক্ষা করে ভালই ব্যবসা চালাচ্ছে বিমল। তবে তার যুক্তি শ্যামলকে বাবা পড়াতে অনেক খরচ করেছেন অতএব সে নিজের ডিগ্রি ভাঙিয়ে খাবে। তার লেখাপড়া হয়নি অতএব বাড়ি ও ব্যবসা তার। সে জানে না সে পয়সায় তার ফ্যামিলির সুনাম বৃদ্ধি ছাড়াও কত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে শ্যামল সেনকে হোস্টেলে ও বাইরে বাইরে থেকে। বাবা-মার সব স্নেহ ভালবাসার ঘিতে চপচপ করেছে বিমল আর পড়ার চাপে চুপসে গিয়েছিলেন শ্যামল।

ডাক্তারী পড়ার শুরু থেকে শেষ যে কি অমানুষিক পরিশ্রম ও স্নায়ুর সংঘাত তা ডাক্তার ছাড়া কেই বা বুঝবে। তবে সেটা অনেকটা তীর্থ করতে বদ্রীনাথ যাবার মতোই—সে কৃচ্ছ্রসাধনের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট এক আনন্দের, সাফল্যের ও আত্মগর্বের তৃপ্তি মেশানো থাকে। তা হলেও তাতে জীবনের ওপর দিয়ে ধকল কম যায় না। পরে অনেক বিষাদও আসে নিজেকে অন্য থেকে ছিন্ন ভিন্ন হবার জন্য। এক ঝাড় বাঁশ ধীরে ধীরে বড় হয়। তার কোনোটা থেকে ঠাকুরের কাঠামো তৈরি হয়। কোনোটা থেকে কুটির, কোনোটা থেকে ফুলের সাজি, ডালা বা কোনোটা মাছ মারার চাঁই, আবার কোনোটা বা মরার খাট। এদের সবার যদি হঠাৎ নদীর পাড়ে মিলনও হয়—সবই চাওয়া চাওয়ি করে—সেই বাঁশবাগানের বাঁশঝাড়ের কাব্য —সেই বন্ধুত্ব—সেই একত্ব আজ কোথায় হারিয়ে গেছে। কেমন যেন উঁচু নিচু কমপ্লেক্স মৌন। তার ব্যথাও কম নয়। এঁটো কলাপাতা আর সেই ঝাড়েরই কলাগো।

ময়রা ভাইকে দেখে সে কথাগুলোই ভাবছিলেন শ্যামল সেন। ছেলেবেলা থেকে বিলেত ফেরৎ হয়ে আসা পর্যন্ত এই ভাই ছিল তার প্রাণ। শ্যামল-বিমল যেন বাপের যমজ ছেলে। যদিও তিনবছরের ছোটবড় তারা হলেও বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন পাড়া-পড়শির বুদ্ধিতে সে বাপের সবই আত্মসাৎ

করেছে। শ্যামলদা অবাক হয়ে এ ব্যাপারটা দেখেছেন। বলেন নি কিছু। সত্যিই তো তার এর থেকেও বেশি করার সুযোগ আছে। তবুও এই মীননেস কে মনে মনে ঘৃণা করেছেন। ছোট ভাই তাকে দিলেও তিনি কিছুই নিতেন না, মনে মনে তাই ঠিক করেছিলেন তিনি কিন্তু সে উদার হওয়ার সুযোগটাও পাননি—। সেটাই তার মনে ছুরির মতো বিদ্ধ করেছে। তবু মনকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। আমাদের যুগে সমাজে এতো স্বাভাবিক। স্বার্থপরতা, শঠতা, অবিশ্বাস ও মিথ্যাচার—এ গুণগুলোতেই আমরা বিশ্বাসী। সর্বত্রই তাই দেবদেবীর ছবি আর ধর্মের নামাবলী। গঙ্গায় স্নান করে যদি সর্বপাপ মুক্তি হয় তবে আর পাপ করতে ভয় কিসের।

ছোটভাই বিমলের হাতের দশ আঙুলে আটখানা দামী পাথরের আংটি। হাতে গোল্ড চেনের সঙ্গে কবচ তাবিজ। গলায় চওড়া সোনার হার। এসব দেখেই শ্যামল সেনের এ কথাগুলো মনে পড়ছিল। আর ভাবছিলেন তিনি গ্রামের কথা। সে গ্রামও আর গ্রাম নেই। ছোট টাউন হয়ে গেছে। ছেলেবেলা পায়ে হেঁটে তিন মাইল আসতে হত ছোট নদী পেরিয়ে। বর্ষায় যাতায়াত তো অসম্ভবই হয়ে উঠত। কিন্তু গত পাঁচবছরে সে গ্রাম্য চেহারা কোথায় উবে গেছে। সাধারণ চাষীও ভারতের সংবিধান নিয়ে কয়েক মিনিট লড়ে যেতে পারে। পার্টির ক্যাডারদের ইনফ্লুয়েন্সে সবাই এখন এক্সপার্ট পলিটিশিয়ান। ওই বিদ্যেটা যদি জমিতে বা নিজের ঘরে লাগাতো তবে সত্যিই দেশের উন্নতি হত। ভাবেন শ্যামল সেন। আর এসব ভেবে ব্যথাও পান। কিন্তু তিনি রাজনীতিজ্ঞও নন, সমাজসেবীও নন—নিতান্তই একজন ডাক্তার। তাই চুপ করে শোনেন। মন্তব্য করেন না। তাহলে অর্ধেক রোগীই হাওয়া হয়ে যাবে। এদেশ ভিন্ন। এখানে ডাক্তারের রঙ-রূপ-বিশ্বাস-ধর্ম ইত্যাদি অনেক কিছুর ওপরই সুনাম যশ অর্থ প্রতিপত্তি নির্ভর করে।

বিমল তার দাদাকে জ্ঞান দিয়েছে খুব। তার ধারণা বিলেত থেকে ফেরা দাদার এসব জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে। অদৃশ্য মুচকি হাসিতে ধৈর্য ধরে শুনে গেছেন তার দাদা। আর ভেতরে ভেতরে মজাও পেয়েছেন। বিমলটা

দেখতে একেবারে বাবার মতো।

দিনটা খুবই ভাল কেটেছিল সুলেখারও। বহুদিন পরে বহু পরিবর্তিত গ্রামে অনেক পুরনো মুখ সে খুঁজে পেয়েছিল। নতুন করেও মনে পড়ল অনেককে। তবে সময় সবই পাল্টে দিয়েছে। সে গ্রাম এখন ছোটখাট একটা টাউন। জঞ্জাল বেড়েছে যেমন বাড়িগুলোও তেমন পুরনো হয়েছে। তার ওপরই কাস্তে, বলদ, ধানের শিষ, টাকা পয়সা, পাল্লা বাটখারার, আলকাতরা দিয়ে অংকিত কঙ্কালের মতো ছবি। সে সবুজ গাছপালা বনজঙ্গল কিছুই নেই। জায়গায় জায়গায় ভাঙা ইট, টিন ও নোংড়ার পাহাড়। মিতার সে গ্রামেই বিয়ে হয়েছিল স্বরাজের সাথে। তাদের সঙ্গে অনেক কথা হলো। সেই গোল আলুই যে ডাঃ শ্যামল সেন তা তারাও ভুলে গিয়েছিল। নোয়া কাকা সত্যিই তখন নুয়ে পড়েছেন আরথ্রাইটিসে। রাঙা জ্যাঠা— যিনি পুজোপার্বণ করতেন গ্রামে—তার ছোট মন্দিরটির অস্তিত্ব আর নেই। গতবছর তিনিও গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছেন। কেউ এখনও সংসারের ঘানি ঘুড়িয়ে চলেছেন—কেউ বা বিদায় নিয়ে বেঁচে গেছেন।

শ্যামলদা যতক্ষণ রোগী দেখছিলেন ততক্ষণ ঘুরে ঘুরে বেড়াল ওরা তিনজনে। পদ্ম ও সমরের নতুন জায়গায় নতুন বন্ধু পেতে একটুও সময় লাগল না। তারা তাদের দলে ভিড়েও গেল।

তবে একটা খবরে খুব রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল সুলেখা। কথায় কথায় মঞ্জুরা মাসীমা কেন যে তার কথা তুললেন। হয়তো ভালোবাসতেন ছেলে-বেলায় খুবই। মঞ্জুরো মাসীমা অকালে বিধবা হয়েছিলেন এবং যে দুটি সন্তানের জননী হয়েছিলেন তারাও একজন একজন করে তাকে ছেড়ে চলে গেছেন। তাই চোখে জল তার লেগেই থাকত। কথাই কথাই কারণে অকারণে আঁচল টেনে চোখ মুছতেন। পরে ওটা বোধহয় তার বাতিক হয়ে গেছে। এখন বয়স হয়েছে। চামড়া কুঁচকে ঝুলে পড়েছে। প্রায় ন্যাড়ার মতোই ছাটা মাথা। গড়ন দেখলে বোঝা যায় যৌবনকালে তার রূপ ছিল বটে। তবে আজ একটা আলুর বস্তার মতো জবুথবু।

একটু আধটু খবরা খবরের পরই তিনি ফাড়ং-এর কথায় এলেন। ফাড়ংটা

খুব ভালছিল। মাসী মাসী করত শুধু। সেও গ্রাম ছেড়ে, সেই যে শহরে গেল আর তো ফিরল না। প্রথম গেল পড়তে। পরে ওখানেই বিয়ে করে বউ নিয়ে আছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে কত কি তিনি ভাবলেন। ব্রেনে মরচে ধরে গেছে। ভাবলেও মনে পড়ে না। যখন যেটা মনে পড়ার কথা সেটা কলকাতা ট্রামের মতোই ঘণ্টাখানেক পরে খটাং খটাং করে অসংখ্য অন্য চিন্তার সঙ্গে দলা পাকিয়ে হাজির হয় যখন তখন আর তার প্রয়োজন নেই। তখন আপন মনেই মন্ত্র-পড়ার মতো বিড় বিড় করে বকে যান। শোনার মানুষ শুধু ওই রাধামাধব মন্দিরের যুগল মূর্তি। কখন তারাও যে মুখ ঘোরাবে তার ঠিক নেই।

সেই অবসরে সুলেখার মানসচক্ষে ফড়িংদা অর্থাৎ রমণী মোহন পালের কথা মনে পড়ল। ফড়িংদা ভীষণ ফচকে ছিল। সুলেখাকে দেখলেই সুযোগ খুঁজত কেমন করে ওকে জড়িয়ে ধরবে আর ওর ফর্সা ধবধবে ফোলাফোলা গাল দুটেকে টিপে দেবে। সুলেখার বয়স এগার বারো বছর হলেও ওঁর গড়নটা দু'তিন বছর এগিয়ে ছিল। ওই বয়সেই ওর মায়ের দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। গ্রামের শান্ত শীতল পরিবেশেও মেয়েকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। বলতেন, ভুলে যেও না তুমি বড় হয়েছ সুলেখা—ছোটদের সঙ্গেই খেলবে। যতটা দৃষ্টি দেয়া সম্ভব দিতেন তিনি। কিন্তু তারই ফাঁকে প্রকৃতির লীলা তার কাজ চালিয়ে যেত। কি একটা ভীষণ শিহরণের আকর্ষণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওই ফড়িংদার সঙ্গে মারামারি করতে যেত। মারামারি নয়ত কি? ফড়িংদা ওকে গাছের সঙ্গে লেপটে ধরত। ওর গলা টিপে ধরত। বাদাম-চানাচুর-কচি আম—যখন যেটা সম্ভব দিত, আবার সেটা দেহের ওপর দিয়ে তুলে নিত। এখন সবই বুঝতে পারছে সুলেখা। তখন কিন্তু ও এতটা বুঝতে পারত না। ভাবত, ফড়িংদা ওকে ক্ষ্যাপাবার জন্যই এসব করছে। এর যে একটা গভীর অর্থ আছে, গোপন চাহিদা আছে—তা বুঝেও যেন বুঝতো না। কিন্তু ফড়িংদা কোনোদিনই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি—এক ওই শেষ দিন ছাড়া। যেদিন ওরা ফিরে আসবে কোলকাতায়, সেদিন ফড়িংদা ওকে অনেক কিছু দিয়েছে মেলা থেকে কিনে। আলতো করে ঠোঁটে চুমু খেয়েছে। গালে গাল ঘষেছে

তারপর ঝড় ঝড় করে কেঁদেছে। ফাড়িংদার মতো পাড়ার মস্ত বখাটে গুন্ডা ছেলে যে কাঁদতে পারে তা ভাবেই নি সুলেখা। এতদিন ভয়মিশ্রিত নেশায় ও কিছুটা হিরো ওয়ারশিপের মতো ফাড়িংদার কাছে নিজেকে সাবমিট করেছে। কিন্তু সেদিন নিজের ফ্রক দিয়ে তার চোখের জল মুছে দিয়ে বলেছে, তুমি কাঁদছ কেন? সময় পেলেই কলকাতায় চলে আসবে। না না না···বলেকাঁদতে কাঁদতেই মার খাওয়া পশুর মতো পালিয়ে গিয়েছে ফাড়িংদা। আর দেখা হয়নি। তারপর হয়ত সে কোনোদিন কলকাতা এসেও ছিল। কিন্তু সুলেখা তারপর থেকে পাঁচ বছর তো বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়িয়েছে।

মঞ্জুরো মাসীমা অনেক হাড়ি খুড়ির মধ্য থেকে তার খবর আবিষ্কার করে খুশির হাসি হাসল। তার চিন্তার জালে স্মৃতির সমুদ্র থেকে ফাড়িংকে খুঁজে পেয়েছে—সে বালিগঞ্জে আছে। পুজোতে আমার একজোড়া থান আর একশ টাকা দিয়ে গেছে। বলেছে, ব্যবসা করে অনেক টাকা করেছে। খুব খুশি। আবার থামলেন মাসী। বুকটা ঢিব ঢিব করছে সুলেখার। রমণী মোহন পাল—ব্যবসায়ী—বালীগঞ্জ। তা চেষ্টা করলে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু প্রয়োজন কি? শ্যামলদার সঙ্গে দেখা হতে সেই আবার ইউ টার্ন করে পেছনের ব্যথার কুয়াশায় ঢুকে পড়া। অতীত স্মৃতির জঞ্জাল ঘেঁটে আর লাভ কি? তার থেকে যেমন আছি তাই তো ভাল। ভাবে সুলেখা। ফাড়িং-এর কথা মনে পড়তে দেহটা চড় চড় করে উঠল। মনটায় ওইটুকুই যেন আনন্দের কলঙ্ক: এখন মেয়ের সেই বয়স—তাই নিজের বিয়ের ছোঁয়া লাগবে। যৌবনটা প্রৌঢ়ত্বের কপট গাম্ভীর্যের আবরণে ঢেকে থাকাই ভাল। নয়ত কেমন একটা লজ্জা লজ্জা বাঁধো বাঁধো লাগে। মেয়েকে বন্ধুর পর্যায়ে ফেলাটা অসম্ভব। মায়ের মাতৃরূপ যৌবন রূপে নয়—সে এক ভিন্ন নরম রূপ। তেইশের পল্লীর তেইশ বছর বয়সের যৌবনপ্লাবিতা দুর্গাদেবীকে মা বলে আমরা প্রণাম ও ভক্তি করি কি করে? ওই সময়ে নিশ্চয়ই নিজেদের বয়সটা কমিয়ে শিশু বা বালিকা বয়সে নিয়ে যাই—সেই দৃষ্টি মেলে তাকাই। তাই কি? নাকি জোর করে মা ডেকে ভক্তি আনি মনে?

—ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার—বলেই গম্ভীর হয়ে গেলেন একটু মাসীমা।

মুখটা ব্যথায় কুঁকড়ে গেল। চুপি চুপি বললেন, বউ-এর সাথে মিল নেই—সে নাকি শুধু বাইরে বাইরে টোটো করে ঘুরে বেড়ায়। ওকে যত্ন আত্যি করে না। বৌয়ের ব্যাপারে ওর বড় কষ্ট। তবে আবার রসিয়ে বলল কলকাতায় মেয়েমানুষের অভাব নেই—ওর জন্য নাকি মৌমাছির মতো কাতারে কাতারে ভিড় করে আছে। একটা ক্রুর তামাসায় দুষ্টু হাসি দিলেন মাসীমা। আর সঙ্গে সঙ্গে সুলেখাও রসাল ভাবে একটু হাসল। যোগ না দিলে আলোচনা জমে না। এগিয়ে না নিয়ে গেলে মনের কথাও বেরোতে চায় না। জ্বলন্ত কথা পেতে গেলে কয়লা খুঁচিয়ে নিতে হয়। তা সুলেখা কি আর জানে না। সুলেখা ওর ব্যাগ থেকে কিছু টাকা বার করে মাসীর হাতে দিল, এই নাও মাসী এটা রাখ। আমি থান কেনার সময় পাইনি, তুমি কিনে নিও। এরপর থেকে মাঝে মাঝে আমিও তোমায় দেখতে আসব।

—টাকার আমার দরকার নেই। যে ক্ষেত জমি আছে খাবারটা তাতেই চলে যায় আর মাসে মাসে ফড়িং আমার হাতে খরচা পাঠায়। তাও আমার খরচ হয় না-মন্দিরে দিয়ে দিই।

তবু জোর করে বিদায় নিয়ে ছিল সুলেখা। বলল, এখন তাহলে যাই মাসী—অনেক বাড়ি যেতে হবে তো—

নিজের কথা কিছুই বলার দরকার হয় নি। ফেরার পথে সুলেখা ফড়িংয়ের কথা একবার তুলেছিল। কিন্তু আশ্চর্য শ্যামল সেন তার কোনো খবরই রাখেনি। বললেন, ডাক্তারী পড়ার সময় ছ'মাসে একবার বাড়ি আসতাম। পরে বছরে একবার। তারপর বিলেত, কে যে কোথায় হারিয়ে গেছে গড্ নোজ।

তারপরই রসিকতার সুরে বললেন, তুমি তাকে ভোল নি দেখছি! সুলেখা বলল, মানুষকে ভোলা শক্ত। তোমাকেই কি ভুলতে পেরেছি! আসলে ভুলেছিলাম সবাইকে, কিন্তু তুমি যেই হাজির হলে অমনি পুরনো ফিল্মের মতো অন্যান্য চরিত্রগুলোও তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তোমরা একটা লস্ট কন্টিনেন্ট ছিলে আমার কাছে।

—তাহলে আমার জন্যই গোল্ডেন কন্টিনেন্ট ডিসকভারর্ড হলো বল?

—গোল্ডেন না স্পাইসি তা জানি না—হেসে বলল সুলেখা।

গাড়ি চালাতে সুলেখাকে দেখছিলেন শ্যামল সেন। প্রথম দিনের থেকে এ সুলেখা যেন আলাদা। কিন্তু কেন? চোখের দোষ? মনের দুর্বলতা? নাকি সত্যিই সুলেখা আবার নতুন যৌবনে উদ্ভাসিতা হয়েছে?

শ্যামল সেনের মনটা ইতস্তত করেও যেন সুলেখার দিকে আসছিল যাচ্ছিল। কেমন একটা সুতোতে বাঁধা ফিরে আসার স্প্রিং লাগানো যন্ত্রের মতো। সহজ হবার শত চেষ্টা করেও হিমালয়ের বাঁধাটাকে ভাঙতে পারছেন না। অনেক শক্তি সঞ্চয় করে অতি করুণ ও কাতর কণ্ঠে শেষে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আর ম্যারেজের কথা কিছু ভেবেছ সুলেখা?

চমকে গিয়েছিল সুলেখা। কিন্তু এমন প্রশ্ন সে বহুবার শুনেছে গত কয়েক বছরে অনেকের মুখ থেকে। সকলেই সহানুভূতির সুরে তাকে এমন প্রশ্নই করে গেছে। কেউ সাহসে ভর করে বলেনি, বিয়ে তোমাকে করতেই হবে, অথবা আমি এসেছি তোমাকে স্ত্রী করে নিয়ে যেতে। যে প্রশ্ন করেছে তারও গলা কেঁপেছে যেন তার নিজের অবিশ্বাস করা কিছু পাপকথা মুখে এনেছে। অথচ তার নিজেরও এমনটা ঘটতে পারত! সুলেখা মুখে বলেছে, 'জানিনা-ওসব ভাবিনি এখনও।' মনে মনে বলেছে, বিদ্যাসাগর পুরুষদের বাঁধ পুনর্বিবাহ বন্ধ করতেন তবে হয়ত স্বামীহীন নারীদের বিয়ে হত। নিজেদের পাসপোর্ট বার করতে মেয়েদেরটা পুরুষ কার্যকরী করত আগে। অষ্টম হেনরী যেমন নিজের বহুবিবাহের জন্য রোমের ক্যাথলিক চার্চকে আউট করে দিয়েছিলেন। তবে বিলেতেও ডিভোর্সিকে বিয়ে করে কাকা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হলেন আর বর্তমান রানী এলিজাবেথ সিংহাসনে আসীন হলেন।

সুলেখা অনেকক্ষণ চুপ করেই ছিল। আবার একই প্রশ্ন করেছিলেন শ্যামল সেন।—সারাটা জীবন কি একা কাটাবে সুলেখা? এতদিনে নিশ্চয়ই শোক কাটিয়ে উঠেছ—আর তার পর ওই একই জ্ঞান দেয়া। জীবন একটাই। শুধু হা-হুতাশ করে কাটিয়ে লাভ কি? ইত্যাদি আরও কত। বিদ্যাসাগর থেকে আমেরিকার সমাজ—ওম্যানস্ লিব থেকে পশুপক্ষী-বৃক্ষলতার উপমা। কিন্তু হায়-একবারও বলতে সাহস পায়নি। এই নাও আমার হাত ধর—কালই

আমরা রেজেস্ট্রী করব। সাহসী এম এস, এফ আর সি এস, বাল্যবন্ধু আমার।।

মনে মনে হেসেছে সুলেখা। একসময় পাল্টা প্রশ্নও করেছে, তোমার কি মনে হয় আমার বিয়ে করা উচিৎ আর একটা ?

বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন শ্যামল সেন। ভাববারই কথা। উত্তরটা চট করে দেয়া নিশ্চয়ই সম্ভব নয়।

—কি হলো কিছু বলছ না যে ? আবার প্রশ্ন করল সুলেখা।

চমক ভাঙ্গল শ্যামল সেনের। তবুও সে মুখে গম্ভীর্য রেখেই স্টিয়ারিং ধরেই আবছা অন্ধকারে সামনের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন।

—কি বিপদে ফেললাম তো ? সুলেখার চোখ একবার শ্যামল সেনের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল।

—না-না, বিপদের কি আছে! আসলে ভাবছিলাম—

—তোমার মতো অত্যাধুনিক শিক্ষিত বিলেত ফেরৎ ডাক্তারকে যদি এতটা ভাবতে হয় তবে বুঝতেই পারছ আমার অবস্থাটা কি ?

—আসলে এটা সবই নির্ভর করে তোমার নিজের ওপর। আবার বিয়ে করলে তুমি যে এখনকার জীবন থেকে মুক্ত হয়ে একটা নতুন সুন্দর জীবন পাবে সে গ্যারান্টি কিছু নেই। যতটা ব্যথা কষ্ট দাহকে সহ্য করে একটু মুক্তির স্বাদ পাচ্ছ সেটুকুও হয়ত নতুন শোকের আগুনে পুড়ে যেতে পারে। তোমার যদি মনের সে শক্তি থাকে যে অজানা ভয়ংকর পরিস্থিতিকেও তুমি মেনে নিতে পারবে তাহলে ঠিক আছে, নয়ত যেমনটি চলছে তাই ভাল।

—ঠিকই বলেছ তুমি। বিদেশের পরিবেশ এক, সেখানে শতসহস্রের বিয়ে হচ্ছে ভাঙছে। আবার হচ্ছে আবার ভাঙছে। কিন্তু আমরা তো সেই ভাঙাগড়া দেখতে অভ্যস্ত এখনও নই। তাই নতুন করে গড়ার আগেই ভাঙার দুশ্চিন্তায় জড়সড় হয়ে পড়ি।

গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল দুজনে।

—তবে তুমি একটা চাকরি কর। পদ্ম বড় হয়ে গেছে। এখন তেমন কাউকে পেলে ভেবে দেখতে পার।

—তাতে প্রব্লেম কিছু কম নয়। পদ্মর কথাও ভাবতে হবে। এমনিতেই আমাদের দেশে বিয়ে হওয়াটা খুব সহজ নয়—তার ওপর তার বাপ নেই—আরও যদি জানে তার মেয়ের একটা বিয়ে তো একেবারে ফিনিশ। এছাড়া ও বড় হয়েছে, ও নিজেই যে কতটা মেনে নিতে পারবে সেটাও তো দেখতে হবে।

—সেটা দেখে দেখে গা সওয়া হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম আমাদের মধ্যেই তো অসবর্ণে বিয়ে হলে সংসারে অনুশোচনার শেষ ছিল না। কিন্তু যত তা ঘটছে ততই সহজ হয়ে যাচ্ছে সব। প্রথম শ্রেণীর সৈন্যের ওপর দিয়ে ঝড়টা যায়—পরে অন্যেরা তার ফল ভোগ করে। নয়ত তোমাকেই হয়ত কবে সতী হয়ে সহমরণে যেতে হত—

একটু ঠাট্টা করেই বললেন শ্যামল সেন।

—গেলেই ভাল হত নিঝঞ্ঝাট। দুর্ভাগ্যের কালি মেখে বসে থাকার থেকে সেই নিয়মই ভাল ছিল।

বিষন্ন মুখে সুলেখা জানাল। শ্যামল সেনও কোনো কথা বলল না।

বেড়ানো যতই ভাল হোক, দিনটা যতই মধুময় হোক, পরিবেশ যতই মিষ্টি হোক মনে কাঁটা একটা আটকে থাকলে কিছুই যেন সম্পূর্ণ ভাবে পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝেই খচ্ খচ্ করে স্নায়ুগ্রন্থিগুলো। উচ্ছলতা চমকে উঠে থমকে যায়।

চতুর মধুর একটা হাসি দিয়ে সুলেখা পরিবেশটা মনোরম করার চেষ্টা করল।

—তুমি এবারে একটা বিয়ে কর তো—বয়স অনেক হলো। এরপর কবে আর ঘর সংসার করবে? বলে মিষ্টি চোখে চেয়ে রইল সুলেখা।

—হ্যাঁ, ইচ্ছে তো আছে—দেখা যাক—উদাস স্বরে বললেন শ্যামল সেন।

—তোমার তো দেখার কেউ নেই। ও ভারটা আমাকেই দাও। চটপট ব্যবস্থা করে দেব।

—ঘটকালি করবে বলছ? ভ্রূ বাঁকিয়ে হাসলেন শ্যামল সেন।

—তোমার মতো পাত্রর জন্যে পাত্রীর চেষ্টা করা তো গর্ব।

—আর আমি যদি পাদ্রী হতাম।

—তাহলে এ বয়সে সাদা রাস্তায় অসম্ভব। কালো রাস্তা ধরে এগোতে হবে।

—তার মানে? অবাক হয়ে তাকালেন শ্যামল সেন।

—মানে—একটু হেসে সুলেখা জানাল, মানেটা না হয় পরেই বলব একদিন। আজ এসে গেছি। তুমি বরং পদ্ম ও সমরেশকে একটু তুলে দাও তো। ওরা তো গাড়ির পেছনেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আর হ্যাঁ—যেন কিছু একটা হঠাৎ মনে পড়ায় সুলেখা বলল, আজ বরং সমর আমার কাছেই থাক। বাড়ি গেলেই তো মাকে বিরক্ত করবে। তুমি বরং যাওয়ার সময় ওদের একটু বলে যেও—

পদ্ম ও সমরেশকে খাইয়ে দাইয়ে শুইয়ে দিল সুলেখা।

পদ্মকে বার বারই আপাদমস্তক গভীর দৃষ্টি মেলে দেখল। মনে হলো, না ঠিক বারো বছর বয়সে সে যেমনটি যৌবনরসে ডালিমের মতো ফেটে পড়েছিল, পদ্ম তা পড়েনি। ও বয়স অনুযায়ী ঠিক ঠিক ভাবেই বাড়ছে। সেটাই ভাল। নয়ত তের বছরেও তো কত মেয়ে মা হয়েছে : আজকাল হয়ত অন্ধগলির নার্সিং হোমে পাপ খসিয়ে নিয়ে আসে। শহর কলকাতা —আজকাল একটা অ্যাবরশনশালা হয়ে উঠেছে। অফিসের অনিমেষ বাবুর ভাইই নাকি বছরে তিনশোর বেশি অ্যাবরশন করেন। তার এস্টিমেট বছরে লাখ খানেক টার্মিনেশন তো হয়ই এই শহরে। হোক, তার জন্য কারও আফশোস নেই—সৃষ্টির যজ্ঞে এতো স্বাভাবিক। যত মুকুল হয় তাই কুশীআম হয় না—সব কুশী একইভাবে বড় হলে তো গাছই ভেঙে পড়ত। ন্যাচারাল সেলকসন প্রকৃতি মেনে নিলে মানুষ মানবে নাই বা কেন। মুস্কিল তার কমপ্লিকেশন কিছু কম নয়। কতই গল্প আপিসে চলে একবার টার্মিনেশন হলে বাচ্চা নাও হতে পারে, ইনফেক্‌শন্‌ হতে পারে, মানসিক যাতনা তো আছেই। কী ভাবতে কী ভেবে চলে সুলেখা। ভাবনাগুলো অসীম আকাশে অসংখ্য পথে বিচরণ করে। কোনো বাঁধা ধরা রাস্তার ট্রাফিক ও স্টিয়ের ধার ধারতে হয় না। সেখানে সাইরেন নিয়ে পুলিশ পেট্রল নেই যে

ফাইন করে দেবে। ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেননা একক ভাবনা একক পথে চলে না। তার সঙ্গে অনেক ভাবনা জড়িয়ে চলে। তাই এলোমেলো ভাবনার মাঝখানে হঠাৎ একটা মুখ ভেসে আসে সুলেখার মানসপটে। ছ'ফুট অন্ততঃ হাইট। স্মার্ট চেহারা—ঠোঁটে সিগ্রেটের ফাঁকে কেমন ক্রুর চাহনি। এক ঝলক করে দু'তিন দিন দেখেছে লোকটাকে। সানগ্লাসের মধ্যে চোখটা দেখতে পায় নি। গলার ভয়েস আত্মগর্বে ভরা। তারই মধ্যে কোমল সুর—অনুরোধ। ভাবটা এমন আপনি না করলে আপনাকে দিয়ে করানো হবে। অতএব আমি ভাল, আপনিও ভাল মানসম্মান রেখে কিছু নিয়ে মালটা চালিয়ে দিন। পারচেজ ডিপার্টমেন্টের হেড্ ক্লার্ক মধুসূদন দত্ত রায়ের ঘরে আপিসের কাজের জন্য সুলেখা দু'তিন দিন গত বছরে এরকম একটা লোককে দেখেছে।

সুলেখা মনের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে স্মৃতিকে টেনে বার করবার চেষ্টা করল। হ্যাঁ—পালসাহেব বলেই গদগদ ভাবে বড়বাবু তাকে খাতির করে-ছিলেন। চেয়ারে সে বসেনি। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েই মাত্র কয়েক মিনিট কথা বলে উধাও হয়েছিল। একদিন কমেটের মতো ঢুকে বড়বাবুকে শাসিয়ে আবার উল্কার মতোই বেরিয়ে গেছেন। তবে কি এ লোকটাই সেই ফড়িংদা ?

কি জানি সুলেখার কিন্তু সর্বান্তঃকারণে বিশ্বাস, ওই মিঃ পালই রমণী মোহন পাল হতে পারে। ও চিন্তাটা সাইডিং করে মেন লাইনে শ্যামল সেনকে এনে সুলেখা অনেকক্ষণ ভাবল।

কথাটা যে কি ভাবে তুলবে আপিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুলেখা তাই নিয়েই ভেবেছিল। নরেন বাবু এখন আবার তার হাসিখুশি ভাবটা অনেকটাই ফিরে পেয়েছেন। শর্মিষ্ঠা ওয়াকারে ভর করে চলাফেরা করতে পারছে। নরেন বাবু ও সবাই তাতেই খুশি। পায়ে এখনও জোর পাচ্ছে না, মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করে, শরীরটাও দুর্বল সিবি অ্যারাক্নয়েড হেমরহেজ—সেটা হয়ত আবারও হতে পারে তাই ডাক্তারবাবুরা পরামর্শ করে টার্মিনেশন করে দিয়েছেন। বলেছেন প্রেগনেন্সি আর নয়। পরে স্টেরিলাইজেশনও করে দেবেন। আপনারকতক নাকি করলেই যথেষ্ট। সে থাক বাবা—ওসবে আর

কাজ, সেই বেঁচে থাকলেই হলো—ভাবেন নরেন বাবু। এদিকে শর্মিষ্ঠাকে প্রায়ই সাহায্য করে যায় সুলেখা। তেমন কোনো গোপন তথ্য না জানলেও ডাক্তার শ্যামল সেন যে সুলেখার একসময়ের খেলার সঙ্গী ছিলেন সে খবরটা শর্মিষ্ঠা ঠিক পেয়েছে। একটু ইশারা ইঙ্গিত ঠাট্টা করতেও ছাড়েনি। সুলেখা অবশ্য রাগের ভান করে বলেছে, বন্ধুর সঙ্গে কদাচ নয়। দুর্ভাগ্য দিয়ে জড়াতে হলে অজানা অচেনা ভাল। তাছাড়া বন্ধু হলেও শিক্ষা ধর্ম ও অর্থ এই তিন বিষয়ে মোটামুটি সমতা না থাকলে দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়া খুব শক্ত। নিগোসিয়েশন ম্যারেজে এগুলো দেখা হয় বলেই বিয়ে টেকে। প্রেমে যত চট্ করে মানুষ পড়ে তত পট করে তা ভাঙে।

—সবসময় সে কথা খাঁটি নয়, অনেকসময় যত দিন যায় প্রেম তত মধুর হয়। বাধা দিয়ে বলেছে শর্মিষ্ঠা।

—তা হয় যখন বিয়ে ও প্রেম দুটো আলাদা ভাবে থাকে। যেমন শ্রীরাধা—হেসে বলেছে সুলেখা।

—জানি না বাপু অতশত, এখনও বয়স আছে, তাই বলছিলাম ভেবে দেখ।

—হ্যাঁ, শ্রীরাধিকা প্রেমে পাগল হয়েছিলেন আর আমি ভাবনায় পাগল হব।

সে সব তো অনেকদিন আগেকার কথা। মনটা যখন যেখানে খুশি এক বারটি পাক মেরে আসে। তার তো আর কলকাতার জনারণ্যে চিড়ে চ্যাপটা হয়ে কর্দমাক্ত ঘর্মাক্ত হয় না। ভাড়াও লাগে না। খুশি হলো তো অমনি পেছনের পাতা উল্টে ছুটল সেখানে, নয়ত গ্রহ-উপগ্রহদের ভবিষ্যত নির্ণয় করার আগেই প্রেডিকশন করতে বসল কি হতে পারে। তবেই না মানুষের মন। কিন্তু হে মন- হে দেব বা দেবীর অংশ বল তো মধুসুদন বাবুর কাছ থেকে রমণী মোহন পালের খবরটা কি করে বার করা যায়। মাথায় হাত দিয়ে একটা ফাইলের দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলো সুলেখা।

আপিসের প্রব্লেমটা মিটে যেতে যেতে নিজের প্রব্লেমটাও সহজ হয়ে উঠল সুলেখার। শশব্যস্তে ঝটিতি হুই হুই করে ছুটল সুলেখা। পারচেজ

ডিপার্টমেন্টে ঢুকেই তার অতি পরিচিত হীরালালবাবুকে পাকড়াও করল।

—আপনার কাছে আর এম পালের ফাইলটা আছে? কি যেন পুরো নামটা —ওই যে দত্তবাবুর কাছে যাতায়াত করেন।

চিন্তিত অন্যমনস্ক হবার ভান করে জিজ্ঞেস করল সুলেখা। অন্য লোক হলে শতশত প্রশ্ন করতেন তাকে হীরালাল বাবু। কি সুলেখা বলে কথা —তার ওপর স্বামীহীন যুবতী। মনের পেছনে একটা দয়ালু দরদ সুলেখার ওপর অনেকেরই আছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফাইল বার করে বললেন, কেন তোমার ডিপার্টমেন্টেও হামলা করেছে নাকি? এর কিন্তু তেমন এক আধটু স্বভাবটবাব আছে।

সুলেখার ঢিল মারাটা তাহলে ঠিক লেগেছে। তাহলে সেই ফড়িংই এই পালসাহেব।

সুলেখা যেন তার সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তেমন অভিনয়ের মতো করে বলল, তা আপনারাই বা ছাড়েন কেন? কিছু অভদ্রতা করলে আপিস থেকে ঘাড় ধরে বার করে দেবেন।

আঁৎকে উঠলেন হীরালাল বাবু।

—অ্যাঁ, কি বললে? চাকরি আগে না সম্মান আগে? এদের আগুনের তাপ সহ্য না করতে কি আর সংসারের ভাতের হাঁড়ি গরম হয় আমাদের। পেটে দিলে পিঠে সয়।

—তার মানে আপনি···? অবাক স্বরে চাপা কৌতুক প্রশ্ন করল সুলেখা।

—না না আমি একা কেন। তুমি আবার এসবের মধ্যে···যাকগে। এই ফাইলটা নিয়ে যাও আবার চোখ বুলিয়ে চট্‌পট ফেরৎ দিয়ে যাবে। এই নাও এই কাগজটায় মুড়িয়ে নিয়ে যাও। এটা ভি আই পি ফাইল—জানাজানি যেন না হয়—সাবধান করে দিলেন হীরালাল বাবু।

—না না, কেউ জানতে পারবে না—আশ্বাস দিল সুলেখা।

পনেরো মিনিটেই তার কাজ শেষ। মাত্র কয়েকটা জিনিসই তার নোট করে নেবার দরকার ছিল। বাড়ির ও আপিসের ঠিকানা। তবুও ইচ্ছে করেই

পুরো ফাইলটা নেড়ে চেড়ে দেখল। কয়েক লাখ টাকার কণ্ট্রাক্ট ও দেনা পাওনার জটিল হিসেব-নিকেশ। তার কোনো প্রয়োজন নেই সুলেখার।

—ফাইলটা যে আমি দেখেছি সেটাও কিন্তু চেপে রাখবেন আপনি। তাহলে সবই চাপা থাকবে—একটা চোখ টিপে দুষ্টুমিভরা একটা আলতো হাসি দিয়ে ফাইলটা ফেরৎ দিয়ে এল সুলেখা।

এখনই দেখতে ইচ্ছে করছে। সে ফড়িংদা আজ রমণী মোহন পাল—বেশ বড়ই ব্যবসায়ী। চিঠিপত্র ফাইলপত্র দেখে শিক্ষারও ছাপ আছে। সত্যি পৃথিবীতে কিছু হারায় না। সেই ফড়িংদা তার চোখের সামনে দিয়ে অন্ততঃ তিন চার দিন এসেছে গেছে অথচ একবারও পরিচয় হয়নি। কিন্তু সুলেখাকে তার তো চেনার কথা। আনমনা ছিল হয়তো কাজের মধ্যে। আর পুরুষের থেকে মেয়েরা পাল্টে যায় চেহারায় অনেক বেশি। তাই হয়ত চিনতে পারে নি।

মানুষের ব্রেনের কাছে কম্পুটারও নগণ্য। তুচ্ছ আবিষ্কার। অবাক হলো সুলেখা নিজেও, সে যে ফড়িংদাকে বারবার দেখেও দেখেনি অথচ তার কথা উঠতেই একটু হিণ্ট পেতেই সে ছবির মতো পরিষ্কার হয়ে উঠল মনের নেগেটিভ থেকে। হয়ত নাও মিল থাকতে পারত। হয়ত কল্পনায় নাও আসতে পারত। কিন্তু এল এবং মিলে গেল। সেটাই অবাক করে মানুষকে - সেটাই আত্মসচেতনতা ও আত্মগর্বকে বাড়িয়ে তোলে। তাই সৃষ্টির বিস্ময়ে স্রষ্টাকে অসীম মনে হয়। তখন মাঝে মাঝে রাগও হত। ফড়িংদা ফড়িং-এর মতোই আফাটা পদ্মকলিতে বসে সুড়সুড়ি দিত। এখানে ওখানে হাত দিত। যেন হঠাৎ লেগে গেছে ভান করে। উঃ আঃ করে চেঁচিয়ে উঠলে মুখ টিপে ধরত—চেঁচাস নে—কে শুনতে পাবে। আমি কি ইচ্ছে করে করেছি নাকি? ওর চোখে মুখে কৌতুহলের অসীম লাজুকতা লেগে থাকত। কিন্তু ওর আদর, রাগভাঙান খোশামোদ ও ওর পছন্দ মতো ঝাল-মুড়ি, লেবুলজেন্স পকেট থেকে বার করে অন্য কিছু খেলা আবিষ্কার করত। এসবই কয়েক মুহূর্ত। সাহসে ভর করে এর বেশি আর এগোতে সাহস পেত না। দুজনেই বুঝত যা তারা করছে সেটা ঠিক ভাল নয়।

আজ মনে হয় ওই আগ্‌নেলাগা সময়টায় ওটুকু উসখ্‌স করা, গায়ে পড়া, আদর সোহাগ করাই যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম। ছেলেদের প্রথম যৌবনটা পাগলকরা রসে ভরপুর। ক্ষণে ক্ষণেই তারা দেহের বিষে অস্থির হয়ে ওঠে। পরিবেশের চাপে সমাজের ভয়ে জড়সড় হয়েই থাকে। মেয়েদের তো তা নয়। যেমন বয়স বাড়তে থাকে তেমন তাদের জোয়ারের জলও বাড়ে। কখনই বাঁধভাঙা যৌবনে আছড়ে পড়ে না। তাদের যৌবনের উত্তালতাও নির্ভর করে পুরুষের ওপর। গত পাঁচ বছর নিজের দীঘির শীতলতায় শান্ত থেকে সুলেখার তো পুরুষের সান্নিধ্যের কথা কখনও মনে হয়নি। বরং রাস্তাঘাটের লোলুপ দৃষ্টি বা বাসট্রামের নিষ্পেষণ তার অসহনীয় মনে হয়েছে। শ্যামলদার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই সে যে একটা যুবতীদেহ নিয়েই নড়াচড়া করছে তা যেন অনুভব করছে। আলতো ঢেউ উঠে দেহের তটে ছড়িয়ে পড়ছে।

এখন ফড়িংদাকে মনে পড়ে সে তরংগ যেন আরও উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ভ্যানিটি ব্যাগের ছোট্ট গোল আয়নাটায় নিজেকে একবার দেখলো। মনে হচ্ছে এই কয়েক সপ্তাহেই সে যেন একটু মোটা আর ফর্সা হয়েছে। এখন দেখলে হয়ত ফড়িংদা গালটা টিপে দিয়ে বলবে, ওঃ রসগোল্লা—মাইরি বলছি তুই রসে টুস টুস করছিস। আর একটু বড় হলে না—রাজভোগের মতো রসে ফেটে পড়বি। বলে আবার গাল টিপে মুখটা এগিয়ে নিত—বাস ও পর্যন্তই। ...মাকে আজ বলবই—ভয় দেখিয়ে মজা পেত সুলেখা।

পরে তাতে ভয় পেত না ফড়িংদা। বলতো, তোর মাকে বলিস তোকে আমি ভীষণ জোড়ে জড়িয়ে ধরেছি। আমার গায়ের রং লেগে গেছে তোর গায়ে। তোকে কেউ আর বে করবে না—তুই আমারই থাকবি।

মোটেই না—গায়ের রং সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলব।

তবু তোর বর যদি জানে আমি তোকে জড়িয়েছি—তাহলে তোকে খুন করবে।—

চুপ করে ভাবত সুলেখা। ততক্ষণে ঝপ করে গাছের আড়ালে জড়িয়ে ধরত ফড়িংদা। ফড়িংদার চোখ মুখ তখন লাল টুকটুকে হয়ে উঠত। তারও

গাটা রি রি করত। কপট রাগ করে সরিয়ে দিত সুলেখা। ওই স্পর্শ ওই নিষ্পেষণ তারও ভালই লাগত। তারও আতপ্ত চোখে বাষ্প আসত। দেহটা ফুলে ফুলে উঠত। অবশ অবশ লাগত। ঠোটদুটো দাঁত দিয়ে চেপে দূরে সরে যেত। ফড়িংদা তখন বিরাট তেঁতুলগাছের বড় শিকড়টার ওপর বসে ঘাসের শিস চিবোত। কখনও আরও অনেকে মিলে ছোটনদীর ধারে গিয়ে খেলত। সুযোগ পেলেই ফড়িংদা ইশারায় কিছু দেবার লোভ দেখিয়ে ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে নিয়ে যেত। সুলেখাও জানত কিছু দেব্যর লোভ দেখিয়ে কি যে দেবে। কিন্তু তারই বা অত লোভ কেন যাবার জন্যে? বয়েস তো মাত্র বার কি তেরো। দেহের উত্তেজনা? মনের?—নাকি সে যে বড় হয়েছে তার পরিচয় উপলব্ধি করতে? ওটাই অন্তরের গর্ব যে সেও বড় হয়েছে। কৌতূহল? হ্যাঁ তাও। আছে যখন নিজের, একজন যখন চাইছে—তখন দুজনেই একটু আনন্দ ও সুখের অনুভব পেতে দোষ কি? তবুও কয়েক মুহূর্ত পরে মনে হত এটা অন্যায় কিছু।

এই সবই ভাবে আজ সুলেখা। ভাবে তার কাজের ফাঁকে ফাঁকে। নরেন-বাবু বেশ কয়েক বারই লক্ষ্য করেছেন সুলেখা আনমনা। কিন্তু তার ভাবনাকে ইচ্ছে করেই ডিস্টারব করেন নি। সুলেখার প্রতি তার একটা উইকনেসই ডেভেলপ করেনি—একটা নিবিড় ভালবাসার সম্পর্কও গ্রোআপ করেছে।

সুলেখা ভাবছিল দেখা করাটা কেমন করে ঘটান যায়। সব ঘটনা ঘটে না তাকে ঘটাতে হয়। এখনও ঘটক ঘটকালি করে যাদের মিলিয়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে তারা কেমন অল্পদিনেই তালগোল পাকিয়ে এক হয়ে মিশে যায়। অথচ ওই অল্পদিন আগেও দে ওয়ার ফার অ্যাপার্ট। সমাজে এমন ক্যাটালিস্ট না থাকলে কত কেমিক্যাল কমপাউন্ড না হয়েই উবে যেত।

কলকাতার ঋতু তো দুটি—বর্ষা ও অবর্ষা। এর সাথে জড়িয়ে থাকে শীত ও গ্রীষ্ম। কিন্তু অসংখ্য দেবদেবীর দেশে মনীষীরা যখন ছটা ঋতু বলে গেছেন তখন তো মানতেই হবে। সুলেখা ভাবছে সেই জন্মাবার কয়েকবছর পরেই যে এক এ চন্দ্র থেকে দশে দিক মুখস্থ করেছি তার সব অর্থ তো এখনও বোধহয় জানি না। ভেবে মনে মনে এক দুই তিন করে গুনতে থাকল।

সীতাই তাই পশু বাণ, সাত সমুদ্র, অষ্ট বোস, দশ দিক। কিছুতেই এগুলো ঠিক মনে পড়ছে না। তাহলে মাস্টার মশাইরা এমন সব পড়াতেন কেন— যা আজও বোঝে না। তার নিজেরাও হয়ত জানতেন না। কিন্তু তা বলে এমন অসময়ে বৃষ্টি। কারও হাতে ছাতাও নেই বর্ষাতিও নেই। ঝমঝম করে বৃষ্টি—তার সাথে মেঘের হুঙ্কার ও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ওই আওয়াজটায় ছোটবেলা থেকেই বড্ড ভয়। ও হ্যাঁ মনে পড়েছে দু'সপ্তাহ পরেই অকাল বোধন—তারই নাকাড়া বাজান হচ্ছে। মা এসেছেন বাপের বাড়ি—অতএব সাজ সাজ রব পড়বে। পাড়ায় পাড়ায় এখন কি অনেক আগে থেকেই চাঁদার জোর জবরদস্তি শুরু হয়েছে। এখন আর তোমার খুশিমতো দেয়া চলবে না— ধার্য করা হবে যা তাই দিতে হবে। জোর যার মুলুক তার। সম্মান সম্ভ্রম নিয়ে বাঁচতে গেলে অসুরদের কাছে মাথানত করে থাকতেই হবে। মায়ের পুজো মানেই তো অসুরের ব্লাড্‌ট্রান্সফিউশন। তাদের চাঁদা দিয়ে না তাজা করলে দুর্গাদেবী কি মৃত অসুরের ওপর খড়্গ চালাবেন? অতএব চাঁদাটা ওই চাঁদাসুরদের জন্য। এমনকি স্বয়ং চিফ মিনিস্টারও চাঁদাসুরদের কাছে হাত জোড় করে থাকেন। চাঁদা দিলে ভোট—নয়ত আউট। কি অসীম ক্ষমতা এদের।

এসবই এমনি অনেক অবাস্তব কথা ভাবে সুলেখা। আপিসের ছুটি—কিন্তু এ মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে বেরোবে কি করে। ঠিক আজই নরেনবাবুর সিক লিভ। ভদ্রলোক পুজো বাজারের জন্য সীক লিভ নিয়েছেন তাকেও দোষ দেওয়া যায় না। দোষ আর কাকে দেবে সুলেখা।

সুলেখার রাগ হয় কবিদের ওপর। শত সহস্র বছর ধরে বর্ষাকে পুজো করে করে বাংলায় তারা বর্ষাটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভক্তিভরে ডাকলে মহাদেবকে পাওয়া যায় আর তো বর্ষা। নিজেরা প্রিয় পরিচারিকা, অভিসারিকা, মনোহারিকা, পুরকামিনীদের নিয়ে মুড়ি চিবোতে চিবোতে আধাঅন্ধকারে বসে বর্ষামঙ্গল রচনা করেছেন আর জলে ভেসে গেছে বাংলাদেশ। আর ওই সাহেবগুলো? ইচ্ছে করে কলকাতা শহরে এমন হাইড্রেন করেছে যাতে একটু বৃষ্টি হলেই দুরন্ত মেজের থাই দেখতে পায়। নিজের দেশের মেয়েরা থাই

ঈশ্বরে এমন নেশা করে দিয়েছে যে বাংলার লাবণ্যভরা নরম থাই না দেখলে ব্যাটাদের চলত না। একটু বৃষ্টি হলেই কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে কোমর জল— আর সেখানেই বেথুন স্কটিশ সব কলেজগুলো। শাড়ির নিচের থাই দেখার এই সুযোগ। ইন্দ্র আর ইংরেজ এদুইই রসিক খচ্চর। নিজেদের অপ্সরায় চুলকুনি কমে না—জোটবেঁধে কলকাতার মেয়েদের হয়রানি করা।

কিন্তু এ কি! কি আবোল তাবোল ভাবছে সুলেখা।

নাঃ বেরিয়েই পড়তে হয়। বসে থাকলে চলবে না। ভেবে চটপট উঠে পড়ল সুলেখা। পিয়ন নারায়ণ বাইরের দিকে মুখ রেখে তাকিয়েছিল; সুলেখা উঠতেই ইশারা করে বলল, সুলেখাদি যাবেন কি করে?

—তাইতো ভাবছি—যাব কি করে। তা তুই একটা ছাতা যোগাড় করে দে না—অনুরোধ করল সুলেখা।

···ছাতা? একটু চিন্তা করল নারায়ণ। বলল, আচ্ছা দেখছি—মনে হয় সুব্রতবাবুর আলমারীর পেছনে দেখছিলাম একটা। সে আজ আসেনি। বর্ষা একটু হলেই অ্যাটেন্ডেন্স ওয়ান ফোর্থ হয়ে যায়। আজ দেখুন না আফিস ফাঁকা। একে বর্ষা তার ওপর পুজোর হাওয়া এরই মধ্যে বইতে শুরু করেছে।

বলতে বলতে বেরিয়ে গেল নারায়ণ। একটু পরে একটা ছাতা এনে সুলেখার কাছে রেখে বলল, আপনার লাকটা দারুণ। পেয়ে গেলাম। তবে ফিরিয়ে আনতে ভুলবেন না কিন্তু—

—না না, ভুলব কেন? কালই নিয়ে আসব—আশ্বাস দিল সুলেখা। তারপর ছাতা হাতে বেরিয়ে পড়ল।

আপিসের অনেকেই দ্বিধা ও বিরক্তভাবে তখন বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে। বাইরে তখনও খুব একটা জল জমেনি। শুধু জুতোটা খুলে হাতে নেবার মতো। কলকাতা শহর যে বৃষ্টি মাপক যন্ত্র তা কে জানে? রিপোর্টাররা স্কেল নিয়ে বসে আছেন—পরের দিন খবরের কাগজে বেরোবে কত ইঞ্চি বৃষ্টি হলো। তা সঙ্গে বেথুন বা স্কটিশের সামনের একটা ছবি। রবীন্দ্রনাথের সেই তেরশ দুর সালের কবিতাটি মনে পড়ে গেল।···ঝড়ের দিনে— আজি এই

আকুল আশ্বিনে—মেঘে ঢাকা দুরন্ত দুর্দিনে···কেমনে চলিবে পথ চিনে ? এ দুর্দিনে কি কারণে পড়িল তোমার মনে···।” সুলেখার মনে হলো বর্ষার আর্দ্র বাতাসে তার শিলার মতো কঠিন প্রাণেও নরম সুর বইছে। তাহলে এ বর্ষারও প্রয়োজন আছে। মানুষের কষ্টের সীমা নেই। তবুও সব কষ্টের শেষে যখন বাড়ি ফেরে তখন ওই ঝম্ ঝম্ শব্দ ওই শীতল আবহাওয়ার মধ্যে কেমন একটা অলৌকিক আনন্দের আবেশ আসে অলস বিবশ দেহে মনে। ব্যাক গ্রাউন্ড মিউজিকের সামনে অটোমেটিকালি দেহটা নেচে ওঠে তালে তালে। ঠেকানো যায় না। যার তেমন কিছু নেই সে ট্রেনের শ্লিপারের মতো অঘোরে ঘুমুয়। সৃষ্টির শুরুই বুঝি বর্ষণে তাই জীবকুল বর্ষণে যে তৃপ্তি পায় তা বুঝি কিছুতেই পায় না। সমুদ্র, নদী, ঝর্ণা—স্রোত-ঢেউ জলপ্রপাত দেখলেই মানুষের মনটা কেমন ভিজে নরম হয়ে উদাস হয়ে যায়।

সুলেখা অবাক হয়ে যায়। আগে কখনও এমন করে তো ভাবেনি সে। বাইরে তখনও বৃষ্টির ফোঁটার সাইজটা কর্পোরেশনের জলের থেকে কম নয়। সুলেখা এবার ছাতাটা খুলল—থমকে থাকলে চলবে না—চলতে হবে। থমকে থাকটা একটা নেশা—ওটায় পেয়ে বসলে চলতে আর ইচ্ছে হবে না। আবার চলার গতি পেলে চট্ করে ব্রেক করা যায় না—কিছুটা এগিয়ে তবে থামে।

একে একে অনেকেই দুর্গা নাম জপ করতে করতে কলকাতার বর্ষা সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুলেখাও ঝাঁপ দেব দেবে এমন ভাব। কিন্তু আর দেওয়া হলো না। ঠিক তখনই পাশ থেকে একটা নারীকণ্ঠের কলকলানি ভেসে এল। সুলেখা তাকাল।

—আরে তুই এখনও যাস নি ? প্রশ্ন করল জ্যানেট ওয়াকার। পারচেজ ডিপার্টমেন্টের স্টেনোগ্রাফার।—কি প্রচণ্ড বৃষ্টি দেখছিস না—একটু ধরলেই যাব—সুলেখা বলল।

—ইউ থিঙ্ক দিজ উইল স্টপ—নেভার—বলে খিলখিল করে হাসল। তারপর বলল, কাম—এই জেন্টেলম্যান আমাকে লিফ্ট দেবে—হয়ত তোমাকেও দেবে।

বলে আপাদমস্তক রেইনকোটে ঢাকা একজন পুরুষকে দেখলে, ওন্ট ইউ মি পল ? মিঃ পল তাকালেন সুলেখার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন পরিষ্কার বাংলায়, কোথায় যাবেন আপনি ?

—আমি ? প্রাচী সিনেমার কাছেই—আমতা আমতা করে বলল সুলেখা। তার রুচিতে বাঁধছে একটা অজানা লোকের কাছ থেকে লিফট নিতে।

— বেশ চলুন, আমি পেঁাছে দিচ্ছি—ওই তো···আমার ড্রাইভার এসে গেছে—

জ্যানেট হাত ধরেই টেনে সুলেখাকে তুলল।

—আচ্ছা এই জ্যানেটকেই আগে নামিয়ে দিই—এতো নিউ মার্কেটের পেছনেই থাকে—

—না না, আমি ডেকার্স লেনে যাব। খুব কাছে—ওই ওয়াটারলু রোডের কাছে—

—সে কি তুমি যে বললে চার্চ রোড একসটেনশনে থাক ?

—আজ আমি ড্যাডির বাড়ি যাচ্ছি। ডেকার্স লেনে—

—ও আচ্ছা—চল সুলেখান—এ দো মেমসাব কো পেঁাছাকে—ক্যালকাটা ক্লাব।

—ঠিক হ্যায় সাব—বলে সুলেমান সন্তর্পণে গাড়ি স্টার্ট করল। তার বুকে ভয়। চোখে উৎকণ্ঠা ছিটকে বেরুচ্ছে। এ ওয়েদারে ও বৃষ্টির জলে কার্বুরেটরে জল ঢুকলে হয়ে গেল। এ সব শহরে জলযান চলে স্থলযান নয়। পেছনের সিটে গরু চোরের মতো জবুথবু হয়ে বসেছিল সুলেখা। অজানা লোকের কাছে লিফট নেবার জন্যে অনুশোচনা ও লজ্জা হচ্ছে তার। কিন্তু সুযোগটাকে একেবারে ফেলে দিতেও পারে নি সে। জ্যানেট তার অনেকদিনের পরিচিতা—সে নিশ্চয়ই এমন লোকের গাড়িতে তাকে তুলবে না, যেখানে সিকিউরিটি নেই। আসলে কলকাতা যে পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ শহর তা জানে সুলেখা। এখানে স্টুপিড না হলে বিপদে পড়ে না। এখানে ইচ্ছে করে কাপড় না খুললে রেপও হয় না। এটা লস্ অ্যাঞ্জেলস নয়। কোনো দিন হবেও না। যদিও সাহিত্য সেবীরা কলকাতা শহরকে নিউইয়র্ক শিকাগো

ও জন্য ভদ্রলোককে হার মানিয়েছে, আসলে তা সবই দস্যুমোহনের কল্পনা মাত্র। অন্ততঃ সুলেখার তাই হয়। গত দশ বছরে একবার তার ভ্যানিটি-ব্যাগ ছিনতাই হয়েছে—তাছাড়া কিছুই হয়নি। অথচ লোকের কত ভয়, যেন ভূত প্রেত দৈত্য দানব ঘুরে বেড়াচ্ছে দিবারাত্র।

—বাই—গুড্‌ নাইট—সি ইউ টুমরো সু। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ মিঃ পল গ্রেট কাইন্ড—বলে একটু পরেই বিদায় নিল জ্যানেট।

একা পুরো পেছনের সিটটায় বসে বুকটা দুরু দুরু করে উঠল সুলেখার। বাইরে তখনও বেশ বৃষ্টি। জল জমেছে অনেকটা। গাড়িটা কুমিরের মতো ধীর গতিতে অতি সন্তর্পণে এগোচ্ছে। সামনের দুজনার মুখই বেশ গম্ভীর। তারা উৎকণ্ঠিত—ভীত। যদি গাড়ি আটকে যায়। হাড় বার করা গর্তে ভর্তি রাস্তাতো এক হাঁটু জলের নিচে। বাহাদুর ইণ্ডিয়ান মেড অ্যামসাডার অ্যামফিবিয়ান অ্যাকোয়াটিক ট্যাঙ্কের মতো ঠিক এগিয়ে চলেছে। একবার সি আর দাসের বক্ষে উঠতে পারলে আর ভাবনা কি?

মাথার দরজা দিয়ে যখন অনেকগুলো চিন্তা আসে আর যায় তখন চাবির গোছা হাতের মুঠোয় নিয়েই সারা পৃথিবীতে চাবি খুঁজে বেড়ায়। তাড়াহুড়ার পর হঠাৎ চমকে দেখে যার জন্য সারা জগৎ তোলপাড় করেছে তাই তার হাতের মুঠোয়।

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনুতে গাড়ি জল ছেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সুলেখা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, আমি বরং এখানেই নেমে যাই—কিছু একটা ঠিক পেয়ে যাব।

গাড়ি দাঁড়িয়েই ছিল ক্রসিং এ। ড্রাইভার ঘুরে তাকাল সুলেখার দিকে তারপরই মালিকের সম্মতির জন্যে। মালিক একটু চিন্তা করে গম্ভীর গলায় বললে, আমার তাড়া নেই। আবার যদি ভিজবেনই তবে আর এটুকু এলেন কেন? চলুন বাড়ির কাছেই নামিয়ে দেব। পরে ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বললেন, চল—প্রাচী সিনেমার কাছে। ড্রাইভার তেমন খুশি নয়। রাস্তা জ্যাম। জল খুব একটা না জমলেও খানা ডোবার অন্ত নেই। পাতাল রেলের জন্য শহরটাই পাতালে ঢুকতে বসেছে। তিন পুরুষের পিণ্ডি পড়ার পরে হয়ত

পাতালযান চলবে। ভেতরের অনিচ্ছাটা না প্রকাশ করে বলল, এই পাতাল রেলের খোঁড়াখুঁড়িতে আরও পানি জমছে। শুনেছি বাবা ইটালিতে আরও কোথায় রাস্তাই নেই শুধু খাল। তা এখানেও রেল লাইন পেতে সব খাল কেটে দিলেই পারত—সবাই নৌকো লঞ্চে যেত। পেট্রল খরচ হত না—বৃষ্টিতেও জল জমতো না—

বর্ষাতি খুলেছেন গাড়ির মালিক। সুলেখা আড়চোখে দেখল ভদ্রলোককে। হঠাৎ যেন মনের অরণ্য থেকে মূর্তি ভেসে এল। আরে—যাকে খুঁজছি—এই তো সে। এতক্ষণ কোন দুনিয়ার ছিলাম আমি? আরও ভাল করে দেখল, সেই লম্বাটে মুখ, সেই টানা টানা নাক আর নাকের পাশেই ইঞ্চিখানেক কাটা দাগ। এই তো সেই ফড়িংদা। সেই রোগাটে চেহারা—এখন সুপুরুষ হয়ে গেছে। খুব সান্নিধ্যে না এলে চেনাই অসম্ভব হত।

ড্রাইভার শম্বুক গতিতে চলেছে। মালিক তাকে তখন ভেনিস নামটা বলে দিয়েছে যেখানে অনেকটা জায়গায় গণ্ডোলা বা নৌকোই চলে, গাড়ি ঘোড়া নেই। তবে তা নিতান্তই বেড়াবার জায়গা। এমন ব্যস্ত শহরে গণ্ডোলা চললে আপিস কাছারি যা আছে তাও উঠে যাবে। ড্রাইভার সুলেমানের রাগ ট্রামের ওপরও কম নয়। তার ধারণা ওগুলোই রাস্তা নষ্ট করে আবার জ্যামও করে। ওটা থাকা মানেই আমরা একশ বছর পিছিয়ে আছি। কোনো বিজি সিটিতে ও লক্কর মারা জিনিস নেই। মালিককে সে কলকাতার যানবাহন সমস্যার সমাধান একে একে বলে যাচ্ছিল। তাই সে বলে—মালিক শুনুক চাই নাই শুনুক। নতুন আরোহিণী পেয়ে সে আরও ভাষা ও যুক্তি দিয়ে তা বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে রইল।

সুলেমানের গাড়ির থেকেও কথা অনেক দ্রুতগতিতে চলছে। তার এই কলকাতার উর্দু বাংলা ইংরেজী হিন্দি মেশান লেকচার যেন বৃষ্টির মতোই থামবে না। সে একটা গুণ্ডি দেয়া পান মুখে পুড়তেই সুযোগ পেয়ে মালিক ভদ্রলোক শুরু করলেন। তিনি ঠিকই বুঝেছেন একা সুলেখা খুব একটা স্বস্তি পাচ্ছে না। কার্টসির জন্যই জিজ্ঞেস করলেন; আপনি এই আপিসেই নিশ্চয়ই কাজ করেন? তা কোন ডিপার্টমেন্টে আছেন?

ভাবতে ভাবতে সুলেখার ততক্ষণে সেই বৃষ্টির দিনের একটা ঘটনা মনে পড়েছিল। বছর দুই আগে এক যুবক তার দিকে বাসে প্যাট প্যাট করে তাকাচ্ছিল আর দুষ্টুমির হাসি হাসছিল। ওর শাড়িটা তখন ভিজে গায়ের সাথে একটু লেপটেই ছিল। প্রথমে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে আবার কৌতূহল দৃষ্টিতে বাঁকা চোখে তাকিয়েছিল সুলেখা। খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। অনেক জোড়া চোখ টেবিল ফ্যানের মতোই তার দিকে দৃষ্টি বোলাচ্ছিল। এ তো মানুষের স্বাভাবিক স্বভাব। মানুষকে দেখা—কিন্তু ওই ছোকড়ার দুটো চোখ যেন সার্কাসের ফোকাস হয়ে উপচে পড়ছে। কিন্তু এ সব অসহ্য হবার কথা নয় এ বয়সে—এ শহরেই যার যৌবন মধ্য আকাশ ছাড়িয়ে গেছে। ছোকড়াও যেন রসিক নাগর হয়ে উঠেছিল। সে সময় তাই মনে হয়েছিল সুলেখার। প্রথমে সবাই ভাবতে চেষ্টা করে পরিচিত কিনা—সুলেখাও তাই চট্ করে মেমরির স্টোরটায় চোখ বুলিয়ে নিয়েছে কিন্তু পারনি খুঁজে। কিছুক্ষণ পরে ভীড়টা হালকা হতেই পাশের সিটটাও খালি হলো। ছোকড়া বসে পড়েই বলল, কিছু মনে কর না—তুমি সুলেখা দি না?

চমকে উঠে ভাল করে তাকিয়েছিল সুলেখা। তাও চিনতে পারে নি। তখন হেসে ছোকড়াটি বলেছিল, আমি মুকুল, আসাম থেকে এসেছি।

—আরে মুকুল—তুই এত বড় হয়ে গেছিস আমি ভাবতেও পারিনি। ওটা যে বাস—ওখানে যে আরও যাত্রী তা কখন ভুলে গেছে সুলেখা। মুকুলকে সেই ভেজা জামা কাপড়েই এক রকম জড়িয়ে ধরেছিল আনন্দে। তারপর অনেক কথা। বাড়িতে নিয়ে এসে কত আদর যত্ন। মুকুলকে বার বছরের পর থেকে আর দেখেনি সুলেখা। আর তখন সে সতেরো ছাড়িয়ে আঠেরোতে পড়েছে। বলিষ্ঠ গড়ন। সেই বার বছর বয়সের মুকুল ফুলে ফেঁপে ঝজালি আর্মাট হয়েছে তখন।

সেকথাই ভাবছিল সুলেখা। ট্রামে বাসে এখানে ওখানে যাদের সঙ্গে শুধু চোখের দেখা, তাদের মধ্যেও কত অজানা অচেনা অতি আপন আত্মীয় ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানলে অবাক হয়ে যাবার কথা। অনেক নিকট আত্মীয়ও পর হয়ে যায় আবার অনেক পরও আপন হয়ে প্রাণে বাসা নেয়।

যে ফড়িংদা একদিন তার একটু চাওয়া একটু ছোঁয়ার জন্য পাগলের মতো করত, যে তখন তার জন্য বিষধর সাপের ছোবল খেতে পারত, এই শহর কলকাতার বিশাল সংগীতের আসরে অথবা বিশাল রঙ্গশালায়, নাকি জীবনের স্রোতে সে তাকে চিনতেও পারছে না।

সম্বিত ফিরে পেয়ে আমতা আমতা করে সুলেখা বলল, অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট সেকশনে।

একটু নীরব থেকে মিষ্টি করে প্রশ্ন করল, এ আপিসে আপনার কাজ ছিল বুঝি?

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝেই এসে একটু নাড়া দিয়ে যেতে হয়। সহজ ভাবে তো ঘি উঠতে চায় না আমাদের দেশে। আমরা ধ্যানে বিশ্বরূপ দর্শন করি। তাই সবাই ধ্যানের ঘোরেই থাকে—কাজের রথ চালাতে গেলে মাঝে মাঝে হরি ওঁ বলে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিতে হয়। আপিস পাড়ার আপিসে সুযোগ পেলেই একটু বিউটি স্লিপ দিয়ে নেয়। দোষ এদের নেই। ভোরে উঠে বাজার-ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে চান, এসেই একপেট ডাল ভাত-তারপর লম্বা লাইন-আপিসে যখন পৌঁছোল তখন ভাত হজম-শক্তি খতম, ভীষণ ঘুম পায়। ক্ষিধে তেষ্টা পান আর জল দিয়ে নেভান। তাই দোষ এদের নেই না-শুধু মাঝে মাঝে ওয়েক আপ অর্থাৎ 'হরি ওঁ' বলে যাই। ওই 'হরি ওঁ' টা জানলে জাতটাই বাল্মিকী হয়ে উই ঢিবিতে হারিয়ে যেত। পরে মাপ চেয়ে বললেন-কিছু মনে করবেন না—আমি নিতান্তই জোক করছিলাম—

মাপ চাইছে ফড়িংদা। ভদ্র হয়েছেন। এক এক দিন এমন গাল টিপে দিত যে ব্যথা করত। এক একদিন এমন জোরে চেপে ধরত যে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যেত-তাও মাপ চাওয়া দূরের কথা, বলত বেশ করেছি, আরও করব-তোকে ওই চালতে মাথা, আম মাথার মতোই চটকে খেয়ে ফেলব। কি রেগে যেত সুলেখা আবার কাছে এসে আদর করলে রাগ পড়ে যেত অথচ আজ, অমন বকাটে বদমাস ছোঁড়াটা আজ ভদ্রভাবে মাপ চাইছে! হায়রে বিধাতার রঙ্গমঞ্চ! তবেই না বলে সৃষ্টিকর্তার রসিকতা! ভাবে সুলেখা। মুখটা কে যেন চেপে ধরেছে। কিছুতেই বেরুচ্ছে না, "আমি সুলেখা-সেই

পড়বে…"। বললে কি জানি হয়ত এখনই খোলস পাল্টে ঝাপটে ধরবে। মানুষের স্বভাব কি পাল্টায়!

ভদ্রলোক নিজেই বললেন, আপনার গলাটা কিন্তু শোনা শোনা মনে হচ্ছে। অবশ্য একই রকম গলা তো কত মেয়েরই আছে—নিজেই উত্তরটাও দিয়ে দিলেন।

—আপনার নামটা কি? জিজ্ঞেস করলেন গাড়ির মালিক।

কোনো উত্তর না দিয়েই সুলেখা বলল, এই তো এসে গেছে-আমি এখানেই নেমে যাই। বৃষ্টিটাও ধরেছে এখন।

দ্বিরুক্তি করলেন না মিঃ পন্ধ। একবার শিয়ালদহে পড়লে গাড়ির গতি শামুক হয়ে যাবে। আর জল যে কতটা জমেছে ফ্লাই ওভারের নিচে তার ঠিক নেই। সুলেখা অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে নামল। ভদ্রলোকও নামলেন ওর সঙ্গে। মেঘে ঢাকা আবছা আলোতেও সুলেখার মুখখানা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সামনা সামনি চোখা চোখি হলো দুজনার। ভ্রূ কুঞ্চিত করে অবাক দৃষ্টিতে মেলে তাকালেন। সময় না দিয়ে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে অসংখ্য ভেজা কাকের মতো মুমূর্ষু উৎকণ্ঠিত ডেলি প্যাসেঞ্জারের মিছিলের মধ্যে নিমিষে হারিয়ে গেল সুলেখা। একটু ইচ্ছে করেই সে তাড়াতাড়ি করে হারিয়ে ফেলল নিজেকে। দু'জোড়া চোখের মিলনে বিদ্যুতের আভাস ছিল। তাই বুকটা তড়িৎ শিখার তরল স্পর্শে মুষড়ে উঠেছিল। মনে হলো বৃষ্টির ফোঁটায় হয়ত শান্ত শীতল হবে মনটা। বৃষ্টি ছিল না—বাতাসটা শীতল। শরতের মেঘটা অনেকটা কেটে গেছে। পশ্চিম আকাশটা তখনও সদ্য বিবাহিতার কপালের মতো সিঁদুর লেপা। সুলেখার দেহে সে সোনালী আলোও ঠিকরে পড়ল। ওরা কি করে বুঝবে সুলেখার দেহেমনে অমন রঙ ধরতে নেই। ধরলেও প্রকাশ করা চলবে না। ভেতরে সে আগুন হয়ে জ্বলবে শুধু। দেহটা যেদিন বাইরের আগুনে নিঃশেষ হতে জ্বলবে—সেদিনই তুবড়ির মতো ফেটে পড়বে তার অন্তরের জমাট বারুদ। ভালমন্দর ব্যথায় আনন্দে মিলেমিশে ঠিক কেমন যে লাগছে তা, বুঝতে পারছে না সুলেখা। ভেতরের একটা চাপা চঞ্চলতায় বুকটা ধকধক করে উঠছে। পন্ধর কথা মনে পড়তেই

উড়ন্ত মনটা ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে আবদ্ধ হলো। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে মনে পুলকও লাগল। ছেলেবেলায় লুকোচুরি খেলায় যতোই জয়ের আনন্দ, আমাকে ধরতে পারেনি ফড়িংদা। ফড়িংদার টেলিস্কোপ আই দিয়েও তার একসময়ের অতিপ্রিয় শুকতারাকে চিনতে পারেনি।

কি ভাবছে সুলেখা তা সে নিজেই ভাবতে পারে না। কবেকার কোন পুরনো কথা টেনে এনে সে কি সুখের প্রলেপ দিচ্ছে কাটা ঘায়ে। আশ্চর্য— যে সময়ে যারা তার স্নেহমনের সংগে হয়ত জড়িয়ে ছিল, আজ তারাই চাবুক হয়ে যেন তাকে আঘাত করতে এসেছে। হঠাৎ যেন নিজের অন্দর মহলে মৌচাক ধরেছে। মৌমাছির হুলের ভয় আবার মধুর স্বাদ নেবার একটা আকাঙ্ক্ষা। এমন ভাবে ফেলে আসা মানুষগুলো এসে তাকে প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দেবে তা যদি কোনোদিন কল্পনারও আসত।

সুলেখা সেই বার তের বছর বয়সের মধ্যেই ডুবে রইল। মাঝে মাঝে পদ্মর দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়—না পদ্মটা ঠিক তার মতো বাড়ন্ত হয়নি।

সেদিন ছিল কালীপুজো।

সন্ধ্যে হতে না হতে সারা কলকাতার বারুদের শব্দে যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। কে বলবে এরা খেতে পায় না, গরিব। যারা [illegible] আর দীপাল একসঙ্গে পোড়াতে পারে তাদের নাকি কেরোসিনও জোটে না। [illegible] যেন [illegible] কে দিনের বেলায় মনের হরষে জ্বালায় [illegible] বাতি তার [illegible] [illegible] হয়ে যায়। সে তো লেখার একটা অ্যাকাউন্ট, অন্য অ্যাকাউন্টে [illegible] কোলকাতায়—কচু [illegible] [illegible] গুলি, বিড়ি, ভাঙ, গাঁজা তো [illegible] [illegible] [illegible] মতোই উড়ছে। [illegible] [illegible] আচ সে [illegible] [illegible] প্রতিযোগিতায় যোগ [illegible]।

এক ঝাড় উগ্র [illegible] যৌবন প্লাবিতা গোলাপ নিয়ে মহুয়া [illegible] বেগেই ঢুকল শ্যামল সেনের ঘরে।

—এ কি তুমি এখনও তৈরি হওনি? তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও—

শ্যামল সেন তাকালেন মহুয়ার দিকে। গোলাপের গন্ধে কেমন পারফিউমের উগ্রতায় তিনি কেমন বিভ্রান্তি বোধ করলেন। নিমেষে সারাটা ঘর সুবাসে ম ম করে উঠল। কে যেন সেন্ট ছিটিয়ে দিয়েছে।

মহুয়ার সারা গা থেকে কি দারুণ যৌবনের ঘ্রাণ বেরুচ্ছে। আলোর দিকে গলন্ত লোহার মতোই মহুয়ার সর্বাঙ্গ থেকে আগুনের সোনালী তাপ ঝলসে বেরুচ্ছে। জ্বলন্ত মশালের মতো দাউ দাউ করে জ্বলছে। পুরু ঠোঁট দুটো টকটকে লাল, কপালে বিরাট ভোরের সূর্য যেন দপদপ করছে। সিঁথিতে তারাই ছটা ঠিকরে পড়েছে।

মনে যাই ভাবুক তা উড়ন্ত মেঘের মতোই ভেসে যায়। [illegible] বৃষ্টি হয় তাই রক্ষা। শ্যামল সেন অবাক হয়েই বললেন, এই গোলাবারুদের মধ্যে বেরুতে সাহস হচ্ছে না। কেউ গুলি করে মারলেও হদিশ পাওয়া যাবে না।

—কেন ছোটবেলা দিয়ে বুঝি পটকা ছোড়ো নি? যত বয়স হচ্ছে তত ভয় বাড়ছে? চল, মনে নেই সুব্রত রায়ের বাড়িতে আজ পার্টি? ওঠ— [illegible] কাছে এসে হাত ধরে টানল মহুয়া। গত তিনমাসে মহুয়া অবাধ সান্নিধ্য পাচ্ছে। মাঝে মাঝে দৃঢ়তার বাঁধ ধসে যায় শ্যামল সেনের। কিন্তু উর্বশীর মোহিনী মূর্তির সামনে সব ভেঙেচুরে তলিয়ে যায়। শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান বিবেক সবই খড়কুটোর মতো বন্যার তোড়ে পড়ে মনের আকাশে ছুটে বেড়ায়। [illegible] উন্মত্ততার অনুরাগ [illegible] কোনো চিহ্ন নেই। মহুয়ার [illegible] [illegible] ভালবাসার [illegible] [illegible] নিয়েছে [illegible] [illegible] থেকে ভালবাসার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

আর, তার স্বামী রমণী মোহন পাল? স্ট্যাটাসের লেভেলে সোভিতার বিয়ে করে প্রথম রাতেই বলেছিলেন এমনটি সে চায়নি। মহুয়া নিজেই বলেছে সে আরেকজনকে ভালবাসত। রমণী মোহন পাল অর্থাৎ কড়িওলা তখন নিজেও কলকাতার মধুচক্রের একজন হোতা। বউ স্ট্যাচুর মতো ঘরে থাক—সেটা প্রেস্টিজ ও শো। মেয়েছেলের অভাব নেই এ দুনিয়ায়। চাইনিজ জাপানীজ—ইংলিশ—স্প্যানিস—যে চিকেন চাই সব ওভেন রেডি পাবেন। গত তো এভারেডি ব্যাটারি করেই তৈরি করেছে এদের—বেডের খোলে ফেলে সুইচ অন করলেই টর্চের মতো দপ করে জ্বলে উঠবে। কন্ট্রাসেপটিভের যুগে দশমাসের গর্ভব্রত করারও দরকার নেই। স্বতঃস্ফূর্ত নায়াগ্রার মতোই বারোমাস তারা উছলে পড়ছে। ঘর ও বার-এর বনিতারা এক হয়ে গেছে বিলেতের মতো।

—তোমার পালসাহেব কোথায়? কাটাঘায়ে নুনের ছিটে দিলেন শ্যামলা সেন আলতো করে।

—তিনি তার গাঁয়ে গেছেন। সেখানে নাকি ধুমধাম করে কালীপুজো হয়। জানি না হয়ত দুই বগলে নাগিনী যোগিনী নিয়েই হাজির হবেন।

—তার মানে?

—তার কাছে মেয়ে মানুষ তো কোলবালিশ—ওর মধ্যে মন প্রাণ আছে তা সে বিশ্বাসই করে না।

—সেটা কি তোমার ওপর বিরহ না কেউ আঘাত করে তাকে জড় করে দিয়েছে? অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালেন শ্যামলা সেন।

—জানি না—জানার সখ ছিল না কোনোদিন। তবে আমার ওপর তার দৃষ্টি নেই সেটাই বাঁচোয়া। কলকাতার মহাপুরুষ একজন।

—মহাপুরুষদের চরিত্র নিয়ে অমন টানাটানি করতে নেই—শাসনের সুরে বললেন শ্যামলা সেন, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের ত্রুটি দোষ মার্জনীয়—জোর দিয়ে বললেন তিনি।

—কেন সমালোচনা করলেই তো শুদ্ধোই সোনার মতোই মহাপুরুষদের [illegible] থাকে। এটা তো ভারতীয় ঐতিহ্য, ব্যক্তি ও যৌবনের ধন। [illegible]

নারীকুল হও সাবধান, আসিছে···' এমন কবিতা তো তাদের প্রশংসাই। ম্যাটিনি আইডল উত্তমকুমার তো আমার মোস্ট ফেভারিট। এই কার্তিকপূজা, কৃষ্ণ ভজন এই করেই তো আমাদের অতৃপ্ত মনের তৃষ্ণা নেভাই।

—বাঃ বেশ বলেছ। তার মানে পশ্চিমদেশে শত কার্তিকের শয্যা সঙ্গিনী হয় আর আমাদের দেশে এক কার্তিক নিয়ে ঘর করে আর নিরানব্বই কৃষ্ণ নিয়ে কল্পনায় রোমাঞ্চিত রমণ করে প্রাণকে তৃপ্ত করে। হ্যাঁ তা অসম্ভব নয় কিছুই। দেহ দিয়ে মনকে নিবৃত্ত করা যায়—আবার মন দিয়েও দেহকে তৃপ্ত করা যায়। সব পাওয়াই তো মনের ব্যাপার। তবে এমন করে তো এসব ভেবে দেখিনি।

—ওরে বাব্বা, তুমি দেখছি 'ব' বলতে বেদশাস্ত্র বার করলে। ওসব অদৃশ্য দর্শন থাক—ওঠো—প্লিজ দেরি হয়ে যাচ্ছে। কাম অন্ বয় ওয়েক-আপ। এই ব্যাটাছেলেগুলো শুধু ঘুমুতে পারে। দেশটা এজন্যই উচ্ছন্নে যাচ্ছে। এনার্জি বলে বস্তু নেই। আচ্ছা বাবা হার মানছি—এক কাপ কফি এনে দিচ্ছি—বলে হাতছেড়ে কিচেনের দিকে চলল মহুয়া।

আজ অপারেশন থিয়েটারে সারাদিন ব্যস্ত থেকে শ্যামল সেনের ক্লান্ত শরীরটা আর উঠতে চাইছিল না। ওয়ারলড্ ওয়ারের মতোই বোমা ও পটকায় ক্ষতবিক্ষত ছেলেছোকরাদের প্লাস্টিক সার্জারী করে টায়ার্ড হয়ে বসেছিলেন ডাঃ সেন। ঠিক তার একটু পরেই মহুয়ার টরচার শুরু হলো। শ্যামল সেনের চাকর ছোকড়াও একব্যাগ বাজি নিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে। তিনটে ছেলের হাত উড়ে গেছে—তাই মেরামত করতেই সারাটা দিন চলে গেছে। রাতে অবশ্য তার অফ্, তবে আবার ভোর থেকেই কলের ড্যাল্যার অন্ধকার। তবু নিজেকে লাকি মনে করেন ডাঃ সেন। এই কারণে তিনি পুল অফিসার হলেও এত কাজের সুযোগ পাচ্ছেন। অনেক জায়গায় পুল অফিসার মানেই আল্লার ষাঁড়। মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াও—সই করে মাসের শেষে বেকার ভাতাটি নাও।

মহুয়া কফি নিয়ে পাশে বসল। আদর করে জিজ্ঞেস করল, খুব পরিশ্রম গেছে মনে হচ্ছে?

—না—তেমন কিছু নয়—এড়িয়ে গেলেন শ্যামল সেন।

—সুব্রতর ছেলে হয়েছে—তাই ঘটা করে পার্টি। তাও আবার কালী পুজোর রাতে। জমবে বলে মনে হয় না—তাও চল একবার ঢুঁ মেরে আসি। বাঙাল বেটা যা কৃপণ হয়ত চা কফি খাইয়েই বিদেয় দেবে—বলে গেল মহুয়া।

—হ্যাঁ ও তো থার্ড ইয়ারে আমাদের সঙ্গে আসাম থেকে জুটেছিল। বঙাল খেদাও করে ওদের ভাগ্য খুলে গেল। গবাইহাটির বদলে কোলকাতার সার্টিফিকেট পেয়ে গেল। ব্যঙ্গ করে বললেন শ্যামল সেন।

—সে কথা আর বল না—এখন ওই গবাইহাটির দাম কলকাতার থেকে বেশি। কতদিন আর নাইন ক্যারেট গিনি সোনা বলে চালাবে? ঝাঁঝিয়ে বলল মহুয়া।

—নাইন ক্যারেট বলছ কেন? এখনও কলকাতা ইউনিভারসিটি থেকে পিওর গোল্ড বেরোয়। তাছাড়া একটু খাদ না থাকলে সোনাও পোক্ত হয় না—জোর দিয়ে বললেন শ্যামল সেন।

—আমি তা হলে বিয়েটা করে আরও খাঁটি হয়েছি বল? ওই তোমরা যাকে কলঙ্ক বল তার একটু দাগ না থাকলে চাঁদেরও সৌন্দর্য থাকত না।

শ্যামল সেন বলেন, কিন্তু এ তুমি ঠিক করছ না মহুয়া। প্লিজ আর এস না। এভাবে অনেকগুলো জবীনকে তছনচ করে ভাসিয়ে দিও না।

মহুয়া মানে না, বলে, যতদোষ নন্দ ঘোষ। কেন তোমাকে ভালবেসেছিলাম—নিশ্চয়ই তুমি আস্কারা দিয়েছিলে। কেন তুমি বোটানিকসএ···কেন তুমি সিনেমা হলে···কেন তুমি হাউস সার্জেন কোয়ার্টারে···সবই বুঝি আমার দোষ? নাকি মেয়েরা টুথব্রাস—যে ইউজ করে ত্যাবড়া হয়ে গেলে ছুঁড়ে ফেললাম। কী ভেবেছ তুমি? রাগে ক্ষোভে কান্নায় ফেটে পড়ে মহুয়া। আবার রাগ ভাঙানো, আবার স্নেহের উষ্ণতা দিয়ে ভালবাসার প্রকাশ—এক সময় দুটো মন একাকার হয়ে যায়। এই চলছিল ছ'সাত মাস ধরে। এখন দুজনেই সহজ হয়ে গেছে অনেক। ভাগ্যের স্রোতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছেন শ্যামল সেন। কিন্তু হৃদয় উৎপীড়ন, মনের ভয় ও হতাশা, আত্ম প্রবঞ্চনার ধিক্কার—সব বিদ্রোহ করে ওঠে প্রাণের অতলে। সুলেখার সম্পর্কেও

ভেবেছেন শ্যামল সেন কিন্তু মহুয়া যে ভাবে দেহমন ও ভালবাসা দিয়ে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধেছে—তাতে ভাল লাগলেও সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখির মতোই শুধু করছে।

সুলেখার সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে তার আনন্দের ও শান্তির সীমা থাকে না—কিন্তু অধিক আবেগ দেখাবার মতো শক্তি বা সাহস তার নেই। সুলেখা যাতে আশার প্রদীপ কোনোভাবেই না জ্বালায় তাই যাতায়াতটাও সীমিত রেখেছেন শ্যামল সেন। কিন্তু মহুয়ার যাতায়াত মাসে একদিন থেকে সপ্তাহে তিনদিন হয়ে গেছে। কারও কারও চোখেও পড়েছে। এই নিয়ে টিটকিরি শুনতেও হয়েছে। এখনও প্রকাশ্যে কেউ না বললেও, আকারে ইংগিতে বলতে কেউ ছাড়েনি। 'শ্যামল যে পরের গোয়ালের দুধ চুরি করে খাচ্ছিস?' 'তোরই ভাগ্য শালা—সাদা ঘোড়ায় চড়ছিস ভাড়া লাগে না।' বিলেতি অভ্যাসটা শ্যামলা ঠিক রেখেছে—খরচ তো দিতেই হয় না বরং ওকেই উল্টো দিয়ে যায়', 'আরে মেনটেনেন্স নেই—আর কি চাই', 'শ্যামল এখন কলির কেষ্ট—রাধিকার মৌ লুটছে'—ইত্যাদি অনেক, যার অর্থ একটাই। অথচ শ্যামল কান্তি সেনের কলেজে সুনাম ছিল খুবই। মন্দ জুয়ো মেয়ে—সব হোস্টেলেই চলে—চলবেও কিন্তু শ্যামল বইয়ের পোকা হয়েই থাকত। ও চিরদিনই একটু স্বল্পভাষী ও বিনয়ী গোছের ছেলে। কেউ মারলেও বলতে পারতেন না—জোর করলেও হটিয়ে দিতে পারতেন না। এককথায় মনের কথা মনেই লুকিয়ে রাখার মতো স্বভাব।

হই হুল্লোর—মাইকের অসহ্য কান ফাটান বুক ফাটান হিন্দি গানের তার বৃষ্টি—নানারকম বাজির অগ্নিবৃষ্টি বাঁচিয়ে একসময় তারা পার্টিতে হাজির হলো। প্ল্যান করেই পনেরো মিনিটের ব্যবধান। ততক্ষণ আর একটা পাকমেরে এলেন শ্যামল সেন। গাড়িতে উত্তেজক সেন্টের গন্ধ গম গম করছে।

মহুয়া ঢোকা মাত্রই সুব্রত ঠোকা দিয়ে বলল, এ কি তুমি একা? তিনি কই?

— তিনি? তিনিটি আবার কে? পরিহাস করল মহুয়া।

—বাঃ বিলেতি ফেরৎ রাধারমণ—শ্যামল বরণ—তোমার কেষ্টঠাকুর গো—

কপট রাগে হাত তুলে মারের ভঙ্গি করে মহুয়া বলল, বাজে বোকোনা—তারপরই একঝলক রসালো হাসি ছুঁড়ে বলল, কলির কেষ্টরা একটু লাজুক হয় বটে, কালো বিষ ঢেলে আমাদের পাগল করে নিজেরা আরামে ঘুমোয়—

—ছোবল খাবার জন্যেই যে তোমরা ছটফট কর—যতক্ষণ বিষ না পাও ততক্ষণ তো সাপখেলা চলে—ফোঁস করে বলল সুব্রত।

—কই ইন্দিরা কোথায় ? বলে ঢুকল মহুয়া। হাতের ফুলের তোড়া আর হুইস্কির বোতলটা সুব্রতর হাতেই দিল।

—থ্যাংক ইউ—এসব আবার আনতে গেলে কেন ? অভিমানের ভান করে বলল সুব্রত।

—চল ভেতরে—বলে সুব্রত মহুয়ার পিঠ আলতো করে ঠেলে দিল।

—বাঃ কালীপুজোর পার্টি, একটু ড্রিংক হবে না ? এই যে ইন্দিরা বাবাঃ হাতে এখনও মশলার গন্ধ। কি এত রান্না করছিলে ? আমি তো পার্টির দিন হেঁসেলেও ঢুকি না।

—তোমার তো কাজের লোক আছে—আমাকে নিজেকেই করতে হয়। আজকাল ঠাকুর চাকর কোথায় পাব ? কাউকে রাখলে একবার চুরি করে পালায় নয়ত কয়েক মাসের মধ্যেই পালিয়ে যায়। সেটা যেমন কষ্ট তেমনি অসহ্য লাগে। তার থেকে নেই—তাই ভাল। এ দেখ না ইলেকট্রিকের অবস্থা—একটু হাওয়া খাইয়ে বন্ধ করে দেয়—লোড শেডিং এ লাইফ শেডিং-এর অবস্থা। তার থেকে গ্রামগায়ে আলো পাখা নেই—তাদের দুশ্চিন্তাও নেই।

—ঠিক বলেছ—কি যেন কবিতাটা···পথিকে ধাঁধিতে···না বাবা মনে পড়ছে না। মানেটা ছিল বিদ্যুতের আলোয় রশ্মি আরও অন্ধকার হয়ে যায়।

—ও তুমি মাইকেলের সেই কবিতার কথা বলছ তো—দাঁড়াও, পরে মনে করে বলব। এখন বস তুমি একটু, আমি তৈরি হয়ে আসছি। ইন্দিরা বেডরুমের দিকে অন্তর্ধান করল।

তখনই বেল বাজল। কল কোলাহল করে সেই চেনা মুখ সব একে একে হাজির হলো।

—আরে জিলিস—মাইরি জিলিস—মহুয়া তুমি ক্ষণে ক্ষণে ফুটছ আর তোমার মধু উপচে পড়ছে—অজয় ডান হাত দিয়ে মহুয়াকে চাপ দিয়ে বলল।

লজ্জারাঙা হয়ে মহুয়া ওর হাতটা ছাড়িয়ে বলল, ডালিয়ার গুতো খাবে এবার। ডালিয়া তার সুস্বাস্থ্য দুলিয়ে হেসে বলল, আমার মধুতে আর মিষ্টির স্বাদ পাচ্ছে না গো। লেডি ডাক্তারের যদি মধু থাকে তা রিয়াল ঘন হানি।

—থাম—সব পরচর্চা পরকুৎসা করতে খুব মিষ্টি লাগে।···বলতে বলতে হুইস্কি জিন, ভদকার বোতল গ্লাস পরিবেশন করল সুব্রত ও ইন্দিরা, তার সঙ্গে মাংসের শিশ ও সামী কাবাব।

পার্টি সরগরম হয়ে উঠল। বিভিন্ন আলোচনা ও সমালোচনা টুকরো টুকরো গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বয়ে চলল।

সুব্রত একখানা বাঙাল গান জুড়ে দিল। টেবিল সংগত শুরু করল তপন চ্যাটার্জী। মিলন, শংকর, প্রসাদ, মৃন্ময় একে একে চারদিকে ঘিরে বসল পানপাত্র নিয়ে। মেয়েদের অনেকেই লম্বা সফ্ট ড্রিঙ্ক পছন্দ করে।

বাঙাল গানখানা খুবই জমল—

মরছি আমি মরছি রে, পদ্মমধু খাইতে গিয়া
হুলের খোঁচা খাইছি রে···।
ঝাঁকে ঝাঁকে সুন্দরীরা ছাড়ে আগুন বাণ
পাছা দিয়া মারছে গুতা—পোরায় যে পরাণ।

মৌমের ঘরে ঘরে জমা ফোঁটা ফোঁটা মউ
মধু মাসে বুকটা জ্বলে নেভায় না তো কেউ।

কাছে আইয়া জ্বালা মেটা দিব মিঠা মউ
পরান দিয়া বাঁধমু তোরে—করমু আমার বউ।

ধরাছি আমি ধরাছি রে
একটা মোমের পুতুল আমি
ঝপাং কইরা ধরাছি রে …॥

—বাঃ বাঃ…আর একখানা, আর একখানা…। সকলে উল্লসিত হয়ে বলে উঠল। সুব্রত কৌতুক করে বলল, যাও ছালা দুকান থিকা রেকর্ড কিননা হোন…

—কিনে তোর বাঙ্গাল গান শুনব? এই যে শুনেছি তাতেই তোকে প্রণামী দিতে হবে—বলল ব্যাচেলার দীপক।

—বিয়ে কর তাহলেই শ্বশুর বাড়ির প্রণামী পাবি—বলল সুব্রত।

—ও কি বিয়ে করবে, ওর এখনও প্রেমের বয়সই যায় নি—ঠাট্টা করল প্রসাদ।

—প্রেমের আবার বয়স আছে নাকি? বিলেতে আশি বছর বয়সে উনিশ বছরের মেয়েকে প্রেম করে বিয়ে করে। বললেন শ্যামল সেন।

—সেটা প্রেম নয়—বুড়ো যুবতী পেয়ে গঙ্গাযাত্রা করে আর যুবতী তার অর্থ নিয়ে ফুর্তি করে। অমন সুযোগ পেলে আমরাও অনেকে করতাম—বলল উপমা।

—ও সব কথা থাক মহুয়া, একটু মউ ছাড় এবার, রিয়াল ঘন রসাল আধুনিক মধু—

—আধুনিক মধু হয় না—মধু ছাড়তে গেলে বৃন্দাবনী পুরনো মধুপর্ক জোগাড় করতে হবে—বলল শংকর স্ত্রী গৌরী।

বিভিন্ন তামাসা রগর রসিকতা একে অন্যের চরকায় তেল দেওয়া ও ক্ষণে ক্ষণে কাচা পাকা খিস্তির মধ্য দিয়ে পার্টি জমে উঠল। ফাঁকে ফাঁকে মধুমাধবী ঢালা হচ্ছে। সবাই মৌজে আছে। মৌতাত দোষে এরা অনেকেই দোষী অর্থাৎ অ্যাডিকসন টু ড্রিঙ্ক অ্যান্ড পার্টি। প্রতিদিন অসুস্থ মানুষ আর তাদের রক্ত মেদ মজ্জা নিয়ে ঘাটাঘাটি করে ছুটির দিনে দেহমন আত্মাটাকে একটু ঝাঁকিয়ে নেয়া। এক একটা পার্টির পর আবার নতুন করে গতানুগতিক একঘেয়ে অর্থ আর নামের পেছনে ছোটা। হাঁপিয়ে উঠলে বা সুযোগ এলেই

আবার একটা রি-ইউনিয়ন। মাঝে মাঝেই নতুন কেউ আসে—আবার পুরনো কেউ আসতে পারে না। তবে সাধারণতঃ সবার সঙ্গে কনসালটেশন করেই ঠিক হয় হোয়ার অ্যান্ড হোয়েন। কেননা বেশির ভাগ না এলে পার্টি জমে না। অনেকটা ডেমক্রাট কানট্রির পার্লামেণ্টে ভোটের মতোই। বিল আসার আগেই তার সাপোর্টার গুনে নেয়া হয়।

মহুয়া হার্মোনিয়াম টেনে তার জমাট গান শুরু করল। মহুয়ার কিছু কিছু গান শ্যামলদারই সৃষ্টি। গুড়ি গুড়ি ভাব থাকলেও ভেতরে খুব রসময় ছিলেন শ্যামল সেন। ময়রার ছেলে তো—মিষ্টি খেয়ে বড় হয়েছে তাই ভেতরে মিষ্টি মধু জমা ছিল অনেক। তবে প্রকাশ করার দরজা কমই ছিল। মহুয়া বলত, গানে এত রস দিতে পার আর প্রাণটা মরুভূমির মতো রুক্ষ কেন? শ্যামল সেন বলতেন, যে আসবে সে রসে ভিজিয়ে নেবে। আমি ছানার লাড্ডু —স্ত্রী হবে রসের শিরা—আমাকে ফুটিয়ে ফুটিয়ে—মজিয়ে মজিয়ে রসাল করবে।

—তুমি ছানা না ছাই—তুমি একমুঠো পাথর—বলত মহুয়া।

—সবচেয়ে নরম—সবচেয়ে কঠিন পাথর। তাই তো শালগ্রাম শিলা সবার বাড়িতে পুজ্য—বলতেন শ্যামল সেন। সেইক্ষণে উত্তর বেরোয়নি মহুয়ার। পরে এসে বলেছে, শালগ্রাম শিলা নরম বলে আমরা পুজো করি না — সৃষ্টির আদিম শক্তির চিহ্ন বলে পুজো করি।

- হয়ত তাই—কথা ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গে আসতেন শ্যামল সেন। সে তো কলেজ লাইফের ইতিহাস।

পার্টি ভাঙল।

একে একে কুলায় ফেরার তাড়া। কালীপুজোর রাত—এখনও পটকা ফাটছে—উড়ন তুবড়ি উড়ছে। মনের মধ্যে ঢেউ উঠছে নামছে। জীবন চলছে। বেরোবার সময় আর লজ্জাদ্বিধার কুয়াশা ছিল না। মধুরসে তাদের দেহমন তখন সমাজ সংস্কারের তিমিরাচ্ছন্ন বাংলা থেকে অনেক উর্দ্ধলোকে। তখন তারা সব শিশুর মতোই সহজ সরল আদিম। সবার সঙ্গে হাত ধরে জড়িয়ে চুমুখেয়ে বিদায় নিতেও কারও একটুকু কুণ্ঠা বা শঙ্কা

ছিল না। সকলেই প্রাণের জ্বলন্ত উচ্ছ্বাসে টগবগ করছে। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর হয়ে একে একে কর্পূরের মতো পার্টি থেকে উবে গেল।

শ্যামল সেনের সঙ্গেই ফিরে এল মহুয়া। সবাই চোখ চাওয়াচায়ি করছিল। তারে পাত্তাই দেয়নি মহুয়া। শ্যামল সোহাগিনী মহুয়া তখন অন্য জগতে।

– তোমায় বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাই? প্রশ্ন করলেন শ্যামল সেন।

—ইউ মাস্ট বি ম্যাড্—একা ও বাড়িতে আমি রাত কাটাব—তুমি তাই চাও?

—আই ডোণ্ট মাইণ্ড—আমার মনে হয় উই কেইম টু ফার মহুয়া—এবার ইউ টার্ন না করলে আর ফেরা যাবে না—হঠাৎ কী হলো শ্যামল সেনের তার গো চেপে গেছে যেন। মহুয়া প্লিজ—আমরা ডালাসের লোক নয়—এটা কোলকাতা– তুমি আমায় স্বদেশে রাখতে চাইলে প্লিজ গো ব্যাক টু হোয়্যার ইউ বি লঙ্। এভাবে অনেকগুলো জীবনকে নিজের খুশির আগুনে বার্ন করিও না—

জ্বলে উঠল মহুয়া। ইফ আই বার্ন—লেট দ্যা ইউনিভার্স বার্ন। তোমরা ব্যাটাছেলেরা সব কিছুর শ্রেষ্ঠ—তোমরাই সূর্য চন্দ্র তারা গড্ আর আমরা কিছুই নয়? তোমরা জ্বললে সৃষ্টি জ্বলবে—আর আমরা শুধু সেই আগুনের পতংগ—যাস্ট এ ফ্লাই? তুমি সুযোগ পেলে পরস্ত্রীর শাড়ি খুলতে পার—তুমি যাকে তাকে ভালবাসলে দখল করতে পার—আর আমাকে সব মুখ বুজে সহ্য করতে হবে?

বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। মৌন হয়ে রইলেন শ্যামল সেন। বোবার শত্রু নেই। ফ্লাটে ফিরে এসে বেন নিজেরই সংসার তেমনি ব্লাক কফি করে বসল মহুয়া। শ্যামল সেন অনেক রোগের অনেক ট্রিটমেণ্ট জানে– কিন্তু এ ডিজিজের যে কি প্রেসক্রিপশন দেবে তাই ভাবছিলেন গত ছ'মাস ধরে। এই পুনর্জীবিত ভালবাসার যে ডেথ সার্টিফিকেটে কি ডায়গনেসিস লিখবে তা ঠাহর করতে না পেরে সে বিভ্রান্ত। এই বয়সে জীবন নিয়ে খেলা করাটা ট্রাজেডির নামান্তর। কিন্তু এই শ্রীরাধাকে তা কে বোঝাবে। ডাক্তার, ভালঘরের মেয়ে

—সব বোঝে শুধু আগুনটা বোঝে না। তাতে ঝাঁপ দেবার জন্য যেন উঠে পড়ে লেগেছে। এটা কি? স্বভাব—নির্মিত? প্রেম ভালবাসা? অজ্ঞতা? কিছু ভেবে হদিশ পায় না শ্যামল সেন। স্ত্রী চরিত্র···কু তো মানুষাম। এর স্বামী ভাল ব্যবসায়ী—কথায় কথায় বলেছে অত্যন্ত সুপুরুষ চেহারা—তবুও এ কী অ্যাবনরমাল সাইকোলজি। তাকেই চাই।

কফি খেতে খেতে ভাবছিলেন শ্যামল সেন। সে সত্যিই উৎকণ্ঠিত—ভীত-সন্ত্রস্ত। ভবিষ্যতের চিন্তায় আতঙ্কিত। ঘন হয়ে বসেছে মহুয়া। একসময় তার দেহলতা এলিয়ে দিল শ্যামল সেনের গায়ে। ডার্লিং—আর তোমাকে শ্যামলদা বলতে পারছি না। আই লাভ ইউ ডার্লিং। তুমি আমার—আমি তোমার—নো ইনবিটুইন। আজ আমাদের শুভরাত্রি। আজ আমার বলতে দ্বিধা নেই—আমি তোমার সন্তানের জননী হতে চলেছি। অনেক তপস্যা করেছি—আই ডিজার্ভ ইট—আই গট ইট্।—

—হোয়াট? চমকে মুখ বিকৃত করলেন শ্যামল সেন। ইমপসিবল্—বাজে বকার একটা সীমা আছে। থর থর করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন শ্যামল সেন।

—আই মিন ইট—দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বলল মহুয়া।

—হ্যাভ ইট আউট দেন—রেগে বললেন শ্যামল সেন।

—ইটস্ মাই বেবি—আমার সন্তান—আমি চেয়েছি এবং পেয়েছি। উদাস ঝাঁঝালো স্বরে বলল মহুয়া। তার মুখখানা কিংশুকের মতোই রক্ত-প্লাবিত।

—ইউ কাণ্ট প্রুভ ইট—পাগলের মতো বলে উঠলেন শ্যামল সেন।

—আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু—আমার সন্তান ইজ নট দ্যাট এলাফ্। কে তার বাবা তা বদি বলার মতো সাহস না থাকে তুমি কাওয়ার্ড ড্যাডি। তাই বলব আমার সন্তানকে। তোমার না হলে গত এত বছর স্বামীর সন্তান হয় নি কেন আমার? আর অ্যাবরশন আমি চাই না—এখন টুএইট উইকস—অতএব ইট উইল বি ডেঞ্জারাস—ডোণ্ট ইউ থিংক?

—আই থিংক নাথিং—ইউ মেড মি ম্যাড্—ক্রোধান্ধ হয়ে পারুষারী শব্দে

করলেন শ্যামল সেন।

—ম্যাড করব বলেই তো ম্যাড হয়ে ছিলাম অনেক দিন। ইউ মেড্ মি ম্যাড্—সো আই মেড্ ইউ ম্যাড্। দুই ম্যাডে মিলে এস বস কমপ্রোমাইজ করি।

—তুমি ব্লাক মেল করেছ—নো কমপ্রোমাইজ—রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে ক্রুদ্ধভাবেই বললেন শ্যামল সেন।

—হোয়াইট মেল হয় না—রাতের আঁধারে অত্যন্ত অন্ধকারে ব্লাকমেল তুমিই ডেলিভারী করেছ। আমি তো রিসিপিয়েণ্ট—ডোনারই ড্যাডি তার নামেই সন্তানের পরিচয়। তোমার সঙ্গে রি-ইউনিয়নের আগে বা পরে আমি স্বামীর সঙ্গে সহবাস করিনি—একটা রাতই তার সঙ্গে সহবাস করেছি· তাও সেক্স নয়। সে রাত্রেই তাকে বুঝিয়ে সব বলেছি ও তার ফানিশার হয়ে থাকব জানিয়েছি। স্বামী ভদ্রলোক প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও পরে মেনে নিয়েছেন। হয়ত সেও কাউকে প্রচণ্ড লাভ করত। অতএব সেক্স তোমার সঙ্গে ছাড়া হয়নি—আর তার শুরুটা তুমিই কলেজ লাইফে করেছিলে নিতান্তই খেলার ছলে। অতএব ডোণ্ট বি ম্যাড্—বি সেনসিবেল। আমি অলরেডি উকিলের সাথে পরামর্শ করেছি এবং মিঃ পালকে আকারে-ইংগিতে জানিয়েছি—মাই পারপাস ইজ ফিনিশড্ সো আই মে লিভ অ্যানি মোমেণ্ট।

—থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ—বাট নট উইথ মি। তুমি যা চেয়েছ তাই পেয়েছ—নাউ লিভ মি অ্যালোন—থর থর করে কাঁপছিলেন শ্যামল সেন।

—অলরাইট—তুমি যদি তাই চাও তবে তাই হবে। আর যেন তুমি ভেবনা আমি এক গ্রাম্য অবলা জীব—আই ক্যান স্ট্যাণ্ড অন মাই ওউন ফীট। আমি তোমাকে ভালবেসেছি—তোমার সন্তান আমি চেয়েছি। ইফ ইউ থিংক দ্যাটস রং, গো টু হেল—উচ্ছ্বসিত কান্নায় ফেটে পড়ল এবার মহুয়া। ছুটে দরজা দিয়ে সে রাস্তায় পালিয়ে গেল না বরং বেডরুমে ঢুকে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ছিটকিনি তুলে দিল। বেডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখবুজে ফুলে ফুলে উঠল। একসময় ক্লান্ত দেহটা নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল।

শ্যামল সেন বহুক্ষণ পায়চারী করলেন। এমন অযাচিত অভিশাপ কেন যে তাকে স্বর্ণলতার মতো ঘিরে ধরল সে জানে না। একটা বয়সে সুলেখার ওপর তার দুর্বলতা ছিল। কিন্তু লাজুক নম্র স্বভাবের জন্য সে এগিয়ে যায় নি। দূরে থেকে দেখেছেন ফাড়িং জোর জার করেই মুগ্ধ করেছে সুলেখাকে। কলেজ লাইফে ভাল ছেলের নাম ছড়াতে আর মন্দ হবার সুযোগ হয়নি—ইচ্ছাও হয়নি। গায়ে পড়ে মহুয়াই টেনেছে কাছে—সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। তাও ভাগ্যের জন্য তিনি বিতাড়িত প্রতারিত হয়ে পালিয়েছেন। বিদেশে ফূর্তি করলেও উচ্ছৃংখলতা করেননি, ভাল লাগলেও ভালবাসেনি কাউকে। ক্যারেলীন, মরীন, এলেইন এরকম অনেক মেয়ের সাথেই তিনি নেচেছেন—বন্ধুত্ব হয়েছে—ঘুরে বেড়িয়েছেন কিন্তু বিয়ে করে অর্ধাঙ্গিনী করবেন তা কল্পনা করতেও ভয় পেতেন। পোস্ট গ্রাজুয়েট কমপ্লিট করে দেশে ফিরবেন—গ্রামে নাম হবে—শহরে প্রাকটিশ হবে—সুনাম যশ অর্থ। নিজের দেশের মুক্ত আকাশের নিচে সেই তো পরম সাফল্য। ফিরে আসার আগেই বাবা মা চলে গেছেন। ভাই স্বার্থান্ধ হয়ে সব গ্রাস করেছে। সে গ্রাম এখন শহরতলীর মতোই নোংরা বস্তিতে পরিণত হয়েছে। আয়ের পথ সীমিত—চলার পথ কণ্টকপূর্ণ—সব দিকে অন্ধকার। সেই অন্ধকার গুহার মধ্যেও এই আনন্দরূপে অভিশাপের বোঝা।

আর ভাবতে পারেন না। সোফাতে শুয়েই অবশ অবশ দেহটা ঘুমের রাজ্যে হারাল।

বিধাতার এই দুনিয়াটা বড্ডই সরল সহজ। এক থেকে দশ আর অ থেকে হ—মাত্র এই কয়েকটি সংখ্যা ও বর্ণ দিয়ে তৈরি। ওর বাইরে তো কিছুই নেই। আশ্চর্য ওইগুলোই যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহজতম থেকে কঠিনতম সব শাস্ত্র তৈরি হয়েছে। ওই ইট কাঠ আর সিমেণ্ট দিয়ে সব তৈরি তবুও কুঠুরীগুলোর হদিশ পাওয়া যায় না। ও বর্ণ দিয়ে

বেদ থেকে বশীকরণ লেখা হয়েছে তবুও তার মর্ম বোঝা যায় না। ওই যে একটা মানুষ তার দুভাগ জল একভাগ স্থল। কয়েকটি সিমপেল অণু পরমাণুর সমষ্টি—তবুও সে অনন্ত অসীম।

আর সেই রসিক ব্যাটা হাতে একটা লেগো ধরিয়ে দিয়ে মজা দেখছে। এ রস আর মজার শেষ নেই। ফোয়ারার জলের মতো উঠছে নামছে। চলছে চলবে। লাট্টুর মতো ঘুড়িয়ে দিয়ে তামাসা দেখছে। আর আমরা? ঘুর্ণীয়মান লাট্টুর মতো ঘুরছি। শুরু হয়েছে অতএব শেষ হতেই হবে। ইংরেজরা বলে, ওয়ান্স আই স্টারটেড্ আই মাস্ট ফিনিশ। সেটাও পুরুষের ঔদ্ধত্য। রসিক নাগরের ঠিক কালীপুজোর দিনেই থিয়েটারের দরজা খোলার কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু ও ব্যাটার বুঝি আর কাজ নেই—মজা দেখা ছাড়া। লস অ্যাঞ্জেলিস, নিউইয়র্ক, টকিয়ো, লন্ডন কে গতানুগতিক পাক খাইয়ে দৃষ্টি ও কলকাতার ওপর। অমন তামাসা রসিকতা কোথায় পাবে? ড্রামা কি আর প্লাস ভেগাসের উলঙ্গ যুবতী নিয়ে চলে? ওদের না আছে দাঁত আর না আছে চুল। ওরা দোকানের মডেলের মতোই মৃত—ইলেকট্রিক ডল্‌স্। কাব্যও নেই, রোমান্সও নেই।—একটা বিরাট লাল শালমুলো। তার ফার্টিলাইজার অর্থাৎ কোকেন, হিরোইন, গ্যাজা, মদ—তার শক্তিতে ইলেকট্রিক পাওয়ারে চলে বিরাট লাল মুলো। অতএব রসিক রাজের দৃষ্টি এই নরম মাটির শহর কলকাতার চারধারেই।

যে ছেলেরা ছোটবেলা খুব গুন্ডা পাগল দুরন্ত থাকে তারা বড় হলে নাকি শান্ত নরম হয়ে যায়। যারা একাচোরা থাকে তারা শতেক বেটা নিয়ে চলে ইত্যাদি অনেক রকম বাদ প্রতিবাদ সব সমাজেই চালু আছে। কারও ক্ষেত্রে মিলে গেলে সেটা মনে পড়ে যায় আর না মিললে সবাই ভুলে যায়। কিন্তু স্বভাবটার পরিবর্তন হলেও স্রোতা পাল্টায় না, ঠিক সময়ে বেরিয়ে পড়ে। ঘটনা সময় সংঘাত শিক্ষা ইত্যাদির আবরণে তারা ঢাকা পড়ে রং পালটায় মাত্র।

আমাদের ফাড়ংদা কিন্তু সত্যি পালটেছেন। নরত প্রাচী সিনেমার সামনে তার অত্যন্ত ঈপ্সিত যৌবনের পালিয়ে যাওয়া শিকারকে যখন চোখের বিদ্যুত দৃষ্টিতে চিনে ফেলেছেন তখনই খপ করে ধরে গপ করে গিলে ফেলা দূরের কথা-

নাম ধরেও ডাকলেন না একবার—পন্টু বলে। হকচকিয়ে গিয়েছিলেন সত্যি— আর পন্টুরানীও ভীড়ে অদৃশ্য হয়েছিল তাও সত্য কিন্তু চকিতে সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকে ধরার মতো ক্ষিপ্রতা এখনও যায় নি ফড়িংদার। কিন্তু সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটের আকর্ষণ অবশ্যই কমে গেছে। দ্বিধা ও সংযম, বয়স ও সময় সে উদভ্রান্ত মনটার চারদিকে রাস্ট জড়িয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তিনি ভাবলেন। পেছনের গাড়ির হর্নেও চমক ভাঙে নি···ড্রাইভারের চেঁচামেচিতে গাড়িতে বসেও অনেক ভাবলেন এ অবিশ্বাস্য দেখা হওয়াটা। বার বারই অনেক বছর আগেকার উন্মত্ত যৌবনের দিনগুলোকে টেনে আনার চেষ্টা করলেন। জোড়া তালি দিতে বসে খেই হারিয়ে গেল বার বার।

ফড়িংদার জীবনটাও সহজ সরল যায় নি। রমণী মোহন পাল বি এস-সি পাশ করে দেখলেন ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বন্ধু সহযোগে গেলেন বম্বেতে সিনেমার হিরো হবেন। বছর দু'তিন হিরো হিরোইনদের জুতো পালিশ থেকে ফাই ফরমাস খাটার নেশায় মশগুল থেকে মদ ও মেয়ের অভাব হয়নি তার। কিন্তু ওই দুরন্ত বালকের ভেতরের বারুদ একদিন জ্বলে উঠল। ডাইরেকটর থেকে চাকর বাকর সবাইকে খিস্তি মেরে পথে এসে দাঁড়ালেন। গ্যারেজে কাজ করে বছর খানেক পর তার শুরু হলো ক্যালকাটা-বম্বে রুটে ট্রাক চালান। দৃষ্টি ছিল স্থির—লক্ষ্য ছিল ব্যবসা। বছর দুএর মধ্যেই নিজের চেষ্টায় পাঁচখানা লড়ির মালিক। একটা ছোটখাট কম্পেনি। চেষ্টা পরিশ্রম ধৈর্য ও বুদ্ধি থাকলে ভারতের মাটিতে সোনা ফলান যায় বই কি। তার বছর দুই পরেই বড়লোকের ডাক্তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে। তখন লড়ি, মোটর পার্টস ও গ্যারেজ ব্যবসায় বেশ দাঁড়িয়েছেন রমণী মোহন পাল। অফিস নিয়েছেন ক্যানিং স্ট্রিট—বাড়ি কিনেছেন বালিগঞ্জ। ততদিনে বাবা মা হারিয়েছেন। একটা বোনও বিয়ের পরে দিল্লীতে চলে গেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে রমণী মোহন পাল খুবই একা। তবে বম্বের স্টুডিও, গ্যারেজ ও লড়ির ব্যবসা করে মদ ও মেয়ে বস্তুটার ওপর আসক্তি আর তার নেই। কেননা এর অভাব সে কখনও ছিল করেনি। বুকের মধ্যে সুলেখার স্মৃতি দাউ দাউ করে জ্বলেছে অনেক বছর। কলকাতায় খোঁজ করার চেষ্টাও করে নি তা নয়। তবে

আউট অফ সাইট আউট অফ মাইণ্ড না হলেও উগ্র নেশাটা বা ভালবাসা স্তিমিত হয়ে গেছে।

প্রাচী সিনেমার সামনে সেই চিরাকাঙ্ক্ষী মুখখানি দেশলাইর কাঠি জ্বালাবার মতো বুকটা তার দপ্‌ করে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। চিন্তার তিমির তলে শান্ত থেকেছেন কয়েকদিন। পরে আপিসে যেদিন এসেছেন—সুলেখা আসেনি। কিন্তু সুলেখার কিছুটা খবর পেয়েছিল জ্যানেট ওয়াকারের কাছ থেকে।

জ্যানেট হেসে বলেছিল, একটা লিফট দিতে গিয়েই বর্ষায় গলে গেলেন!

—না-না—ভদ্রমহিলাকে মনে হলো খুব নোন ফেস। হয়ত রিলেটিভ হবে আমার অথচ চিনতে পারছি না। আই ফিল বিট গিল্টি। তাই মাপ চাইব ভেবেছিলাম।

জ্যানেট পুরো নাম ও সুলেখা যে উইডো সেটা জানিয়েছে। তবে ঠিকানাটা জেনেও দেয়নি। বলেছে কয়েকদিন পরে এসে নিজেই দেখা করবেন।

কাজেকর্মে পার্টিতে মিটিং-এ ছাড়াও একবার লরি করে বম্বেতেও যেতে হয়েছে রমণীবাবুকে। তাই সুলেখা প্রসঙ্গ দুর্গাপুজোর ঢাক ঢোল মাইকের নিচে চাপা পড়েই ছিল। মাঝে মাঝে মন বলেছে পোড়া কয়লাকে আর জোর করে জ্বালিয়ে লাভ কি? এমনিতেই সংসারে সুখ নেই। বিয়ে একটা ভুল করে করল স্ট্যাটাসের জন্য—সেটাও ভাঙো ভাঙো হয়ে কোনো রকমে সুতোয় ঝুলে আছে। প্রথম রাতেই যে স্ত্রী বলতে পারে আরেকজনকে ভালবাসে ও তাকে আঘাত করতে গিয়ে ভুল করে রমণীবাবুকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে—সে যে কী মেয়েছেলে তা ঈশ্বরই জানেন। রমণীবাবু হুইস্কির পুরো বোতল শেষ করে পাশের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়েছেন। নিজেই হাত জোড় করে বলেছেন—বাবা মা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন সম্ভব হলে তুমি থাক—নয়ত একটু আগে থেকেই আমাকে জানিও যাতে সীন ক্রিয়েট না করে দুপক্ষের প্রেস্টিজ রেখেই আমাদের ডিভোর্সটা হয়ে যায়। বিধাতার কি নিদারুণ অভিশাপ—পরক্ষণেই ভেবেছেন আমার এই ফেলে আসা পাঁকিজা

জীবনই এজন্য দায়ী। তাই ভেবেই মেনে নিয়েছেন। নিজেকে আধুনিক উষ্ণ স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছেন। বিদেশের দেখে শুনে মিশে ভালবেসে বিয়ে করাটাই তার মনে হয়েছে অনেক ভাল। কিন্তু সেখানেও তো এক বছরের মধ্যেই পঁচিশ ভাগ সেপারেটেড হয়। তাহলে নিয়মটা আমাদেরই ভালো—এটা আইসোলেটেড ব্যাড ল্যাক। যাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট। সে বউয়ের কথাও ভাবতে হয় নি বেশিদিন। অর্থ ও সামর্থ্য থাকলে নারীসংগের অভাব কি? পৃথিবীর সর্বত্রই এক ঝাঁক উড়ন্ত প্রজাপতি থাকে। রূপে রসে স্বাদে গন্ধে তারা অপ্সরাদেরই মডার্ন জেনারেশন। তাদের কাজই উপচান, ব্যথিত, ব্যাহত অসুস্থ যৌনধারাকে হজম করা। মনোরম রাজপ্রাসাদেও যেমন ড্রেন না থাকলে নোংরার প্লাবনে ভেসে যায়—সমাজেও এই রূপজীবিকা বা অতিরূপিতা রমণী না থাকলে সমাজ ভেসে যেত। সাধারণ সংসারী রমণীর থেকে এদের দান কিছু কম নয়। এরা অনেকেই হাফ্ গেরস্থ, হাফ্ মাদার। আমাদের ধর্মের সতীরাও অনেকেই তো তাই। তাই এদের কখনও অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেনি রমণী মোহন। বরং মনে হয়েছে এরা গৃহিণী হলে আইডিয়াল ওয়াইফ ও মাদার হতে পারত।

কালীপুজো পর্যন্ত রমণী মোহনের কাছে সুলেখা একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়েই ছিল।

কালীপুজোর রাত্রে অনেকেই একটু টিপসি থাকে। কালীভক্ত রমণী মোহনও সন্ধ্যা থেকে একটু টিপসি ছিল। মাদক রসের শক্তিতে হৈ হৈ করে প্যান্ডেল ঢাকী প্রসাদ পুরুত সবই সুপারভাইজ করে একদঙ্গল বন্ধুবান্ধব বা চামচে সমভিব্যাহারে খাঁটি স্কটল্যান্ডের সুধারস চাখছিলেন। তিনিই তার শহরে পরিবর্তিত গ্রামের প্রধান পুজোর উদ্যোক্তা—প্রধান চাঁদাদাতা পৃষ্ঠপোষক ও প্রেসিডেন্ট। অতএব পানের থেকে চুন খসলে চলবে না এবং শুদ্ধির পরিমাণটা একেবারে ঠিক ঠিক চাই। চ্যালা চামুণ্ডার অভাব নেই। এমন দিলদরিয়া গুরু কোথায় পাবে। এক ছিলুম খেয়ে চার ছিলুম অ্যালাউ করে কল্কি থেকে। রমণী মোহন সো কল্ড গ্রামের এখনও মোড়ল। ওটা ঢাকাই তার গর্ব তার সাকসেসের ওয়েইং মেশিন। রাইটার্স বিল্ডিং-এর সবে ...গত তিন

পার্টির সর্দারদেরও সেটা জানতে সময় লাগে না। লালুবাবু, বিজন ঘোষ, মনোহর গড়াই, সুধা মিত্র, পীযূষ বাড়ুই, রসুল হক—এই বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের পারমানেন্ট ক্লার্ক - লাল ফিতে দিয়ে ফাইল বাঁধতে বাঁধতে জর্দা দেয়া পান চিবোতে চিবোতে বুড়ো বয়সে নতুন প্রিন্সদের সে কথাটা জানিয়ে দেন। এটা স্পেশাল কেস—পার্টির ব্যাপার কিছু নয়—নিতান্তই পার্সন্যাল রিলেশনশিপ। ঝামেলা করলে পুরো গ্রাম 'ব্যারেল অফ দি গান' নিয়ে হাজির হবে। একবার নাকি তাই হয়েছিল। রাস্তাটা গ্রামের মানুষদের পছন্দ হয়নি—তাই মন্ত্রী সাহেবের গায়ে ডিম ছোঁড়াই শুধু নয়—তাদের পার্টির কয়েকজন বাইরের ক্যাডারও আহত হয়েছিল। এমন কি থানার বড়বাবুও অপ্রকাশ্যে এই রমণী বাবুকেই সাহায্য করেছেন। তবে রমণীবাবু যুক্তিহীন কিছু করেন না—প্রতিবারই গ্রামের মানুষের মতামত নিয়ে তবে কাজ করেন।

রাত দশটা নাগাদ রমণীবাবুর চমক ভেঙেছিল চার গ্রামের মানুষ ভিড় করেছে কালীপুজোয়। ধুমধাম হই হই পটকা তুবড়ি প্রতিযোগিতা ইত্যাদি চলছে। সবাই ব্যস্ত—পুজোয় বসে গেছেন পুরুত ঠাকুর। মায়েরা সারাদিন উপবাস করে প্রসাদ ভোগ ইত্যাদি করছেন। আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। তিনখানা ডিজেল জেনারেটর রেডি হয়ে আছে। কখন লোড শেডিং পাওয়ার কাট হয় তার তো ঠিক নেই। প্যান্ডেলের চারদিক আলোয় আলোময়। কিন্তু একটু দূরেই কৃষ্ণপক্ষের ঘন অন্ধকার।

হঠাৎ চমকে উঠেছিলেন রমণী মোহন পাল। নেশা ছুটে গেছে মুহূর্তের মধ্যে। কিন্তু মনটা উচ্ছ্বল আবেগে ভরপুর। হঠাৎ নেশার চটকা ভাঙলেও মনে হচ্ছে দিব্যদৃষ্টিতে কী সাংঘাতিক কিছু যেন সে দেখছে। দেখেছিল সুলেখাও। সে জানত রমণী বা ফড়িংদা এ রাতের প্রধান হোতা—হিরো। বহু বছর পর ইচ্ছে করেই তাই সে স্বরাজ ও মিতার বাড়িতে এসে উঠেছে। অবশ্য কাউকে বুঝতে দেয় নি। দুর্গা পুজোর পর এসে দেখা করেছে আবার সবার সঙ্গে। স্বরাজ মিতা নতুন করে বন্ধু হয়েছে। তারাও সুলেখার বাড়িতে এসে দুদিন কাটিয়ে গেছে। অনেক করে বলায়ই যেন সুলেখা এসেছে সেই গ্রামে কালীপুজোতে। পদ্ম আসে নি—সে সময়েশের বাড়িতেই

থেকে গেছে।

চামচাদের, 'তোরা সব দেখ আমি আসছি একটু পরে' বলে উঠে এসেছিলেন রমণী। সুলেখার কাছে এসে গম্ভীর লম্বা কঠিন এক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। মুখে ঈষৎ ম্লান গম্ভীর অভিমানের হাসি। 'পেয়েছি তোমায়'—এমন ভাবটাও হয়ত ছিল চোখে মুখে। সুলেখা বিনম্র ভাবে তাকিয়ে মিষ্টি মধির আলতো ঢেউ তুলেছিল অধরে। কোনো কথা না বলে হাতটা ধরে ফেলল রমণী—শান্ত কঠিন স্বরে বলল 'শোন'। সবাই নিজের ঘোরে ব্যস্ত। কেউ ঠাকুর কেউ মাইকের গান কেউ বা পটকা তুবড়ি। সবার দৃষ্টির সামনে অথচ অলক্ষ্যে জোর করে টেনে নিয়ে গেল সুলেখাকে তার ফড়িংদা। একটু বুঝি কপট বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল সুলেখা। প্রায় ছ'ফুট লম্বা গুণ্ডার মতো চেহারা কালাপাহাড়ের মতো মন্দির ধ্বংসকারী ফড়িংদা সারারাত একটাও কথা বলেনি। কয়েকশ গজ প্রচণ্ড আলো তার পরই কঠিন ঘন অন্ধকার—শত মানুষের চোখ ও সন্দেহকে ফাঁকি দিয়ে বার বার কতবার যে সুলেখা শুধু আলো আঁধারের সঙ্গে খেলা করেছে তা তার মনে নেই। চোখের জলে—দেহের অফুরন্ত নিঃস্রাবে—সে পর্বতটা যেন ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে লেপটে যেতে চেয়েছে সুলেখার মধ্যে! পটু—ফড়িংদা প্লিজ—কিন্তু দু'জনার কেউই চায়নি এই একহয়ে মিশে যওয়ার অন্য কোনো ভিন্ন রূপ সৃষ্টির ইতিহাসে লেখা থাক।

সুলেখার তখন রূপ যৌবনে প্লাবন এসেছে। শ্যামলসেনের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই তার দেহে ক্ষীণ যৌবনস্রোত বইতে শুরু করেছিল। মনই মানুষের দেহের ট্রাক্টর। সে চলতে শুরু করলেই ভূমি চাষিত কর্ষিত হয়ে নতুন রূপের জোয়ারে ফেটে পড়ে। সুলেখাও অনেকদিনের বাঁধ নিজেই যেন উন্মোচন করে দিয়েছিল এই ডানপিটে জেদী চাষীটার সামনে।

পুজো পার্বণ একসময় শেষ হয়েছিল। সেই রাত বনে বাদাড়েই বেশিরভাগ সময় কেটেছিল দুজনার। ভোর রাত্রে সুলেখা স্বরাজ ও মিত্রার সাথে ফিরে এসে শুয়েছিল তাদের বাড়িতে। ঘরে প্রাণ ছিল না সুলেখার—সারাদেহ জর্জরিত—ক্ষত বিক্ষত। মিত্রা কিছু বুঝেছে কিনা—তা চিন্তা করারও

ইচ্ছাও তার হয়নি। শুধু বলেছিল—'ওঃ দু'একবার টয়লেট করতেই শাড়িটা নষ্ট হলো।'

পরের দিন গাড়ি নিয়েই হাজির হয়েছেন রমণী মোহন পাল। 'তুমিও তো কলকাতায় যাবে—চল আমার সঙ্গে, নামিয়ে দেব।' কি ভদ্র ভালমানুষ যেন ভাজামাছ উল্টে খেতে জানেন না—ভাবছিল সুলেখা। এই বদমাশ ছেলের সুনামে গ্রাম পাগল। গতরাতে যা করেছে ভিডিওতে ছবি তুলে দেখালে দুনিয়া জানত—সুলেখাকে কি না করেছেন তার ভালবাসা নতুন করে প্রমাণ করতে।

কলকাতা ফেরার পথেই তাদের ফেলেআসা বছরগুলোর হিসাব নিকাশ হচ্ছিল। বার বার সুলেখার হাত ধরে ইয়ার্কির ছলে, শাসনের ভঙ্গিতে গালও টিপে দিয়েছেন দু'একবার। সে পরম উষ্ণ বিদ্যুৎ ঝলসানো রোমাঞ্চ নিশ্চয়ই নেই। সময়ের চাপে হাতের চামড়া যেমন আর স্পর্শকাতর নেই—গালও সেই ফুলের পাপড়ির মতো নরম লাজুক নেই। যা আছে তা দুর্বার প্রাণের টান। প্রথম যৌবনের প্রতিষ্ঠিত দেবী তার মন্দিরে নতুন করে প্রাণের স্পন্দন পেয়েছেন। ভীষণ খুশি রমণী মোহন আজ। বিদায়ের আগে করুণ কাতর ভাবেই জিজ্ঞেস করেছেন, 'ভবিষ্যৎ নিয়ে কি কিছুই ভাবনি? তোমার বয়সে এখনও তো অনেকে প্রথম পিঁড়িতে বসে।'

—না ভাবিনি—ভাবার ইচ্ছেও নেই। যেমন চলছে চলুক। বলেছে সুলেখা।

—তোমার খবর যদি আগে জানতাম!—দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন রমণী মোহন। সুলেখা ভেবেছে, আগে জানলে কোন স্বর্গে-তা তুলতে? মাতাল যৌবনের ঝড়ে ছিন্নভিন্ন করে হয়ত পালিয়ে যেতে। এখন জেনেছ তাই বা কী করেছ। কেঁদেছ? তোমার মতো ছফুট লম্বা পাথরের মতো শক্ত মানুষটা কেঁদে আমার মুখ গলা বুক ভাসিয়েছে—কিন্তু আমার অণু-পরমাণুর আস্বাদ নিতেও জোরাজুরি কম করনি। ঈশ্বরের তিনরূপই তো দর্শন করিয়েছ সারারাত ধরে। কিন্তু কই সব জানতেও তো মুখ খুলে বলার সাহস হয়নি, একদিন তোমাকে আমি অর্ধাঙ্গিনী করবই। হয়ত আজ অসুবিধা থাকতে পারে। কই

ইংলণ্ডের রাজাও তো সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন। আর আমাদের নরম ক্ষেত্রের দেশে সমাজভীতি তো বাড়ছে বই কমছে না। মুখে কিছুই বলেনি সুলেখা। প্রাচী সিনেমার সামনে নেমে যাবার সময় বলেছে, আমার মেয়ের বয়স হচ্ছে— বুঝতে শিখেছে। খুব দরকার কিছু হলে আপিসে এস— বাড়িতে নয়। আমার সংসসুখ ভোগ করার কোনো বাসনা নেই। আই অ্যাম সরি ফাড়ুংদা, সরি রমণীদা।

—বেশ তাই হবে—গাড়ি নিয়ে আবার গ্রামেই ফিরে এসেছিলেন রমণী পাল। তিনি জানেন তার স্ত্রী বিভিন্ন পার্টিতে খুবই ব্যস্ত। গ্রামে ফিরে আবার নতুন করে জীবনটাকে সাজাবার কথা বারবারই ভেবে চললেন রমণীবাবু।

গলির মধ্যে ঢুকেই সুলেখার খেয়াল হলো পদ্ম তো বাড়িতে নেই। সেতো নরেনবাবুর বাড়িতেই আছে। থমকালো সুলেখা—বাড়ির দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল আবার থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে রাস্তার দিকেই এল। কী সব ভাবল —আবার বাড়িতেই ফিরে এল। দ্বিধা বিভক্ত মনটা দেহটাকে এদিক ওদিক ছোটাল। পরে ঠিক করে নিল, 'থাক পদ্ম ওখানেই—সমরকে ভাইফোঁটা দিয়ে কালই বরং আসবে। আজ আমি একাই থাকি একটু।' দেহমনটা কেমন একা থাকতে চাইছে। নিরিবিলিতে বসে একটু ভাবতে চায়, স্বস্তি পেতে চায়। কখনও সখনও সন্তানকেও বোঝা মনে হয়—অসহ্য মনে হয়। মানুষ যদি পশুপাখি লতাপাতার মতো ঝাড়াহাত পা হতে পারত। পশ্চিমদেশেও নাকি—আগে নিজে পরে আর সব। কারও জন্যই কেউ স্বার্থত্যাগ করে না— আবার দোষারোপও করে না। আমাদের দেশে তন্ত খাওয়াবে রক্ত হাগাবে। সন্তানের জন্য মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত চুরি করে করলেও করবে—পরে হাহুতাশেরও অন্ত নেই। তেমনিই ভাই বোন বন্ধু বান্ধব—অথচ সবাই জানে উপকারীকেই বাঘে খায় অথবা উপকার করলেই ব্যথা পেতে হয়। তবুও

স্বভাব ও কর্তব্যজ্ঞান যার আছে সে না করে পারে না।

সুলেখা একা বাড়িতে অনেকদিনই থাকেনি। তাই প্রথমে গাটা একটু কেমন ছম ছম করল। তাও ঘিঞ্জি বাড়ি। নিজের একটা ফ্ল্যাট—তার নিজের আলাদা রাস্তার ওপর দরজা। দোতলা তিনতলায় উঠতে হবে রাস্তায় বেরিয়ে এসে উঠতে হয় অন্য দরজা দিয়ে। হয়ত ভাড়া দেবার জন্যই বাবা ডিটাচড্ ফ্ল্যাট করেছিলেন, পরে মেয়েকে লিখে দিয়েছেন। সুলেখা ভাইদের থেকে আলাদা ভাবেই থাকে যাতে কোনোরকম ঝগড়া বিরোধের সম্ভাবনা না থাকে। পুজো আচ্চা কাজকর্ম ছাড়া সত্যি বলতে কি সে তাদের ফ্ল্যাটেও যায় না। ভাইদেরও একটু হয়ত রাগ অভিমান আছে তবে প্রকাশ্যে তারা তা ব্যক্ত করেন না।

চট করে জামাকাপড় ছেড়ে ভাল করে চান করে নিল সুলেখা। সারা গায়ে এখনও পাড়ার গুণ্ডা সেই ছোটবেলাকার ফাড়ংবার দেহের গন্ধ লেগে আছে। বুকের বিভিন্ন জায়গায়—তলপেটে জমাট চাপ চাপ দাগ দেখে শিউরে উঠেছিল সুলেখা, লজ্জার ঘনমেঘে বিদ্যুৎ চমকালো। হৃদপিণ্ডটা ধকধক করে উঠল। সিসমোগ্রাফ যন্ত্রটি বসালে তার দেহের অণুকম্পন পরিমাপ করা যেত। সে কম্পন সমস্ত স্নায়ুমূল বেয়ে শিকড়ে শিকড়ে ধ্বনিত হলো। শির শির করে অনুরণিত হলো সুলেখা। মুখখানা দিগন্তের রক্তিম ছটায় ভরে উঠল। তার নিজেরও গত রাত্রে হুঁস ছিল না। মানুষ এভাবে বেহুঁস হয়ে যেতে পারে—অবশ হয়ে যেতে পারে দেহ। নয়ত কই, তার তো ব্যথাবোধ হয়নি দেহের এ সব কঠিন গভীর ক্ষততে। দেহের অভ্যন্তরের রাশিরাশি তৃষিত রক্তবিন্দু বাইরের কোষকে ডানলোপিলোর মতো স্ফীত করে অবশ করে দেয় দেহের বাইরের অংশকে—ভাবল সুলেখা। তার একবারও মনে হয়নি সাম বডি রেপড্ হার—সে একবারও ভাবেনি এর সাথে চরিত্রের কোনো সম্পর্ক আছে। এ যেন স্বাভাবিক একটি ঘটনা। ন্যায় অন্যায়র প্রশ্নই এখানে নেই। দুটি আকাঙ্ক্ষিত দেহের মিলন মাত্র।

দেহের চাপ চাপ নীলাভ সবুজ লাল দাগগুলোতে এখন একটু একটু ব্যথা ব্যথা করছে। মগের জল সারা দেহে ঢেলে সাবান ঘষল সুলেখা—শ্যাম্পু

করলা ভাজা করে। মনে পুলক উপচে পড়ছে—জোর করে অন্য মনগুলো একে শাসিয়ে থামিয়ে রাখছে। 'লজ্জা করে না এ বয়সে—তুমি না বাঙালী এক বিধবা—তোমার নিজের মেয়ে বড় হচ্ছে না? লোকে জানলে তোমাকে কী বলবে আজ?' বিভিন্ন মনেরা ঝগড়া করছে কিন্তু বিবেক—দেহ—হৃদয় প্রাণ তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে বলছে বেশ করেছি যা করেছি—ভালবাসি যাকে দেহ দিয়েছি তাকে। বিয়ের আগেই যার সাথে দৈহিক মিলন হয়েছে—পরে হলে আর দোষ কি? অনুরাগও হলো বই কি। ঠোঁটটা কেটেছে—বুকটা এখন জ্বালা করছে—হাড়গুলো মড় মড় করছে—পিঠটা ব্যথা করছে এমন কি উরুতেও মানচিত্র এঁকেছে। কেন, ক্ষত বিক্ষত না করে কি মধু লোটা যায় না। বদমাশ গুণ্ডা বকাটে ছেলে—যা ছিল তাই আছে। বয়সের ভারেও নরম হয়নি। আর একবার কাছে এলে মাথা ভাঙব। অনেকদিন পরে হঠাৎ একদিন প্রচণ্ড সাঁতার কাটলে সারা গা হাত পা ব্যথা তো হবেই। ভাবে সুলেখা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তার ভীষণ হাসি পেল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত আনন্দের ঢেউ—না কি অনুরণিত শিহরণ বয়ে চলছিল ক্ষণে ক্ষণে। এক এক সময় মানসপটে ভেসে আসছিল গত রাতের এক একটি ঘটনা। ফড়িংদার একদিনের ব্যথার ঝড়ে পড়া—আর একদিকে তার দেহের উল্লাস। সে যেন বহু বছর পর তার পুরনো রত্নভরা সিন্দুকের হদিশ পেয়েছে। পাগলের মতো অভিমানে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তার সোনা রুপো ও অলঙ্কার খুঁজে বার করেছে। আর উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য শুরু করেছে। গত রাতে রমণী মোহন পাল তার ফড়িংদা থাকাকালীন হারানো ধনরত্নের সত্যিই সন্ধান পেয়েছিল। নয়ত পুজোর মণ্ডব থেকে বার বারই সুযোগ মতো সুলেখাকে ইংগিতে তুলে এনে তার একান্ত গোপনীয় স্থানে নিয়ে পাগলের মতো আভভব করে আদর করতে পারত না। মরিয়া হয়ে উঠেছিল—শেষ পর্যন্ত হয়ত নেশার ঘোরে বলেছে, তুমি আমার সব। তোমাকে আমার চাই আরও কত। এটাও জানিয়েছে আমি তোমার সব জানি - তোমার স্বামী নেই—একটা মেয়ে—সব জেনেও বলছি তুমি আমার সব—তোমার জন্য আমি লাইফ দিয়ে দিতে পারি সুলেখা। বিলিভ, মি আই ন্টিল লাভ অনলি ইউ।

সুলেখাও তার বহুদিনের অব্যবহৃত সোনার সিন্দুকের ডালা উন্মোচন করে দিয়ে আকণ্ঠ তৃপ্তিময় সুধা পান করেছে। হোয়াই নট। ভেবেছে সে।

আয়নার সামনে চুলটা ব্রাই করতে করতে সে সবই ভাবছিল সুলেখা। দেহটাকে ভাবনা দিয়ে রোমাঞ্চিত করতে কে না চায়। গাছের ওপরটা যতটুকু —মাটির নিচে থাকে তার থেকে অনেকগুণ বেশি। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যা পাই তার থেকে বেশি পাই ভেতরের কল্পনা দিয়ে। আমরা বলি যা ভাবি তার থেকে শতসহস্রগুণ বেশি। আমাদের দেখা ও বলা সাগরের ওই ওপরের ঢেউটুকু মাত্র! তার অতলে অসংখ্য গুণ বেশি ঢেউ, আগ্নেয়গিরি, পাহাড় পর্বত ও অফুরন্ত সম্পদ। তারও রং রূপ সবই ক্ষণে ক্ষণে পাল্টাচ্ছে। কোনো মুহূর্তেই কিছু স্থির হয়ে নেই। চিন্তা ভাবনা কল্পনা দৃষ্টিভঙ্গি সবই প্রতি মোমেন্টে পরিবর্তিত হচ্ছে।

চলার পথে সূর্যের অজস্র অগ্নিবাণে জর্জরিত হয়ে বটগাছের শীতল ছায়ায় ক্ষণেক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সুলেখা। চৌরাস্তার মোড়। পথ হারাবে —না গতানুগতিক যেমন চলেছে মোটামুটি একটা জানা পথ ধরে তাই চলবে? অসংখ্য প্রশ্ন। এর উত্তর মাস্টার মশাইরা গুরুজনরা বা কোনো শাস্ত্র তো শেখায় নি। তাদের তো নানা মুনির নানা পথ। সে মুনিরাও তো শুধু যথেচ্ছাচার করে গেছেন আর পরবর্তী বংশধরদের জ্ঞান দিয়ে গেছেন। মানলেও কষ্ট না মানলেও ব্যথা। আর যত সমস্যা তো মেয়েদেরেই। অগ্নিপরীক্ষা সতী-দাহ বাল্যবিবাহ বহু বিবাহ আরও কত। লেখক ও ধার্মিকজন ওই মেয়ে জাতটার হাতে ফুল নয়ত প্রদীপ ধরিয়ে দিয়ে, ঠোঁটে কদম্ব রেণু নয়ত লিপস্টিক পরিয়ে, কপালে ব্যঙ্গ সিঁদুরের টিপ পড়িয়ে, চোখে নানা দৃষ্টির তীর ছুঁড়িয়ে অসংখ্য কাব্য লিখেছেন বাহবা পেতে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে নিতান্তই গল্প লেখার জন্যই গল্প লেখেন তারা। দরদ কিছু নেই। নিজেই বেপাড়ায় পড়ে থাকে নয়ত নিজের মেয়ে প্রেম করে বিয়ে করলেই মাথা খারাপ। থাক সে সব ভাবনা। আজ যখন মনটা কাব্য বিভোর তখন কাব্যই করি লুকিয়ে। কেউ কোথাও দেখার নেই। এমন সুযোগ তো মনটা পায় না। চারদিকের গ্রন্থিতে বাঁধা এই মানুষ শুধু পুতুল নাচের পুতুল। মোটা ভাগ্যের দড়ি

সব কনট্রোল করছে—আর চারদিক থেকে সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম, দেশকাল সংসার, শিক্ষা, মন, বিবেক—সূতোর শেষ নেই—সব ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে চালাচ্ছে। হায় রে স্বাধীনতা! মানুষের আবার স্বাধীনতা হয় নাকি? একমাত্র এই জীবটিই অসংখ্য দড়ি দিয়ে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা। একদিন নিজের বিছানায় চোখ বন্ধ করে থাক তো। যে একটা দিন আমি আমাকে একান্ত ভাবে আপনার করে রাখব। বিছানা ছেড়ে উঠব না। ও কথাটি ভাবার সাথে সাথে ঘটিবাবুর টুং টুং শব্দ, জলের শব্দ, পেটের ক্ষীয়মাণ ছবি—স্বস্তি। তারপর শ্রীমান উদর চর চর করে উঠবে—হাত পাগুলো বিদ্রোহ করে চ্যাচাবে—স্ত্রী পুত্র পরিবার আপিস অর্থ অণু—অসংখ্য আপন পর দেহ ও দেহাতীতেরা জীবনটাকে ত্রাতিষ্ঠ করে তুলবে। তবুও বলব আমরা স্বাধীন। চিন্তায় আমরা স্বাধীন? লেখায়? বলায়? করায়?—কোনো কিছুতেই নয়। তবুও ওই বলে শান্তি আমরা স্বাধীন।

যাকে চিনি না জানি না তার সঙ্গে বিয়ে হলো—তবু তাকে ভালবাসলাম, সে ছেড়ে চলে গেল—তার সঙ্গেই কেন আমার জীবনের সব কিছু চলে যাবে? এর কোনো যুক্তি আছে? অথচ সমাজ ছাড়াও নিজের মনেই এক প্রচণ্ড ভয়। বিবেকের দংশনের ভয়। একান্তই যুক্তিহীন—তবু মেনে নেয়া অসম্ভব। চিন্তা কল্পনা যুক্তির বাদানুবাদ মনের অসংখ্য ভগ্নাংশের অন্তর্দ্বন্দ্ব—এই করেই রাত কেটে গেল সুলেখার এপাশ ওপাশ করে।

সকালে উঠে তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়ল। বৈঠকখানা থেকে বাজার করে শর্মিষ্ঠার বাড়ি। আজ ভাইফোঁটা।

আরে তোমাকে তো চেনাই যাচ্ছে না—অবাক ঘন দৃষ্টিতে চেয়েই রইল শর্মিষ্ঠা।

—সে কি, কেন? আমার আবার কি হলো! ঈষৎ রক্তাভ মুখে তাকাল সুলেখা।

—নাঃ না, কিছু হয়নি—শ্যাম্পু করে সাজগুজ করে—বাঃ রূপ ঝলসে পড়ছে দেখছি।

রসিকতা করেনি শর্মিষ্ঠা। আজ উজ্জ্বল শ্যাম সুলেখা সত্যই

রূপে ফেটে পড়ছিল। একসময় তাকে তো দেখতে ভালই ছিল। ঘটনা, শোক, পরিশ্রম ও মনমরা হয়ে থাকার জন্যই আলতো কালির প্রলেপে ও শরীরের ক্ষীণতায় তার আগুন চাপাই ছিল।

—অনেক হয়েছে—আর লজ্জা দিও না—কেমন আছ বল। কথা ঘুরিয়েছে সুলেখা।

—না বাপু কারও তরঙ্গ বিকম্পনে—তোমার দেহে বান ডেকেছে। আতশী দৃষ্টিতে সত্যিই গভীর ভাবে চেয়েছিল শর্মিষ্ঠা। 'তোমাকে চেনাই যাচ্ছে না—মানে হাসপাতালে যাবার পর থেকেই তেমন করে তোমাকে দেখিনি—কথা বললেই মাথায় ছিল নিজের ও সংসারের চিন্তা। তাই ভাসা-ভাসা দেখেছি। কিন্তু বিলিভ মি—তুমি আর সেই সুলেখা নেই। ইউ আর অ্যাট লিস্ট টেন ইয়ারস্ ইয়ঙ্গার টুডে।'

—থাম, অনেক ফাজলামো করেছ। নরেনবাবু কোথায়? কথা ঘোরাতে প্রশ্ন করল সুলেখা।

—তিনি ওদের নিয়েই বাজারে গেছেন। বোস—এক্ষুনি এসে পড়বে। ভাইফোঁটার আয়োজন সব রেডি। রান্না রেডি। চল আমরা কফি নিয়ে বসি একটু।

—ও হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেলাম—কালীপুজো কেমন কাটল?

—ভাল—খুব ভাল—দারুণ ভাল। অনেকদিন পরে সেই পুরানো গ্রামে—ও দারুণ ভাল লেগেছে—হাসিতে উচ্ছল ছিল সুলেখা।

—ও, মিঃ পাল বলে এক রিচ বিসনেস ম্যান তোমার অনেক খোঁজ খবর করেছেন—সে নাকি ও গ্রামেরই ছেলে—শর্মিষ্ঠা বলল।

সুলেখার মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল ক্ষণকাল। তবে মা মেয়ে নয়—উঠতি বয়সের প্রেমেও নয়। তাই ক্ষণেকে সম্বিত ফিরে পেল সুলেখা। একটু চিন্তা করে হাসির ছটা এনে উর্ধ্বগলায়ই উচ্ছ্বসিত ভাবে বলল, "ও সেই মিঃ পাল—হ্যাঁ সেই ওখানকার প্রেসিডেন্ট। আলাপ হয়েছে। ছোটবেলা ও নাকি আমাকে দেখেছে। পরে আমাদের আপিসে আমাকে নাকি চিনেছেও। আমায় বলল আমার খোঁজ করেছেন। লোক খুব ভাল ও মিশুকে।

—তা ? ইঙ্গিত করল শর্মিষ্ঠা।

—তা—আবার কি ? তার ডাক্তার বৌ। সে বিরাট বড়লোক। সত্যি তুমি যে কি ভাব তা তুমিই জান।

— না না, আমি কি তাই ভাবি ! মনটা ভাবায়। যদি সুযোগ পাওয়া যায় তবে লড়ে যাও।

—নো, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ। তুমি বুঝছো না শমী—পদের জন্য আমাকে স্যাক্রিফাইস করতেই হবে। তাছাড়া আর আমি ভাগ্য নিয়ে খেলতে পারব না। বন্ধুত্ব—হ্যাঁ—ফ্যামিলী—অফকোর্স নট দৃঢ়কণ্ঠে টেবিল চাপড়াল সুলেখা।

তাতে বদনাম হবে। তৃপ্তি পাবে না। কোলবালিশে দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে জড়িয়ে ধরলে আরাম পেতে পার—আনন্দ পাবে না। কেননা ওটা ভালবাসবে না—আবার ঝগড়া করে লাথিও মারবে না। সাময়িক সঙ্গ দেবে—উষ্ণ রাখবে। বক্তৃতা দিল শর্মিষ্ঠা।

—তা জানি—কিন্তু বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ওর মধ্যে আমি নেই। একা থাকতে থাকতে নিজের স্বাধীনতা এত বেড়ে গেছে যে পুরুষ মানুষের পরাধীনতা আর টলারেট করতে পারব না। ইম্পসিবল্।

—ওই কারণেই ওয়েস্টার্ন ওয়ারলডে—অনেকের বিয়েই হয় না। মেয়েদের গাছের মতো পার্সনালিটি হলে তারাও ভেঙে পড়ে। লতা—লতাই ওই লতাতেই তাদের পরিচয়—ওই তাদের গর্ব। লতা যদি গাছ হতে চায় তবে সে ধরিত্রীর বুকে আছড়ে পড়ে হাহুতাশ করে। ঈশ্বর সবাইকে একভাবে করেন নি। যাকে যা করেছেন তাতেই তার সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। নিজেকে জড়িয়ে রেখেই কি আমাদের মা ঠাকুরমারা সংসারের কর্ত্রী হননি ? তারা সম্মান শ্রদ্ধা ভালবাসা কি পুরুষের চেয়ে কম পেয়েছেন ? বলতে পার তাদের বাইরে পরিচয় কম ছিল—পরিচয় তো মিথ্যা পেতলের মুকুট মাত্র। তাই পরাধীনতা কথাটা কাব্য রসিকদের জন্য। মেয়েরা চিরদিনই পুরুষের মা—তারাই সংসারের শক্তি—তাদের জন্যই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড—পুরুষেরা ক্যাটালিস্ট শুধু। তারা একটু গর্ব বোধকরে তৃপ্তি পায়—মেয়েরা মধ্যে

বিদ্যুতের মতো চমকে উঠে সাগরকে ভয় দেখায়—সাগর তার প্রতিফলিত রূপ দেখিয়ে হেসে উপচে পড়ে।

—বাঃ দারুণ দিয়েছে তো। রোগশয্যায় অনেক কাব্যের বই পড়েছ মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, তা পড়েছি। তবে আমার স্বামীটি নরম ভাল মানুষটি তো তাই মনে হয় না আমি পরাধীন। বলব আমরা দুই বন্ধু।

—'হু' সুলেখা কফিতে চুমুক দিল।

—তবে আই উইল টেল ইউ দিজ—থমকে কফিতে চুমুক দিয়ে শর্মিষ্ঠা একটু বুঝি ভাবল। তারপর বলল, এখনও তোমার দেহের চটক যা আছে তাতে অনেক পতঙ্গই উড়ে তোমার রানওয়েতে ছুটে এসে থামবে। সময় থাকতে গুছিয়ে না নিলে পরে রিপেণ্ট করবে।

—তা আমি জানি—কিন্তু ব্যাপারটা অত ঈজি ভাবছ কি করে তুমি। ভগবান না করুন আজ যদি নরেনবাবুর কিছু হয় বা হত—তাহলে তুমি কী করতে?

অর্জুনের হৃদপিণ্ড ভেদী তীর ছুঁড়ল সুলেখা। থমকে গেল শর্মিষ্ঠা। নিমেষে তার মুখটা গম্ভীর প্রস্তরখণ্ড হয়ে গেল। তবুও জোর করে সহজ করে নিল নিজেকে। বলল, আমি তো অসুস্থ—তবে পাঁচ সাত বছর আগে ওর কিছু যদি হত তবে হয়ত আমি দ্বিতীয় পুরুষের হাত ধরতাম। বলে গম্ভীর হয়েই রইল। অপরকে যুক্তি দিয়ে জ্ঞান পরিবেশন করা সহজ।

—হয়ত করতে—তুমি জান না সেটা তাই বলছি। ভিখারীকে ভিক্ষা দেয়া সহজ মানবিকতা—কিন্তু তার জঠরের অগ্নিজ্বালা ফিল করা ইম্পসিবল্। উপোস না করলে উপসীর দাহ বোঝা যায় না। তেমনই অন্যের চাহিদার সঙ্গে মিশ্রিত বিবেকের দংশন উপলব্ধি করাও সহজ নয়—গম্ভীরভাবে বলল সুলেখা। কোনো সুদূরে তার দৃষ্টি।

—হার মানছি বাবা—তোমার পথ তুমিই খুঁজে বার কর—সহজ গলায় বলল শর্মিষ্ঠা।

—পথ তো একটাই—খোঁজার কিছু নেই—ব্যথিতভাবেই বলল

সুলেখা।

—কি সেটা ? আনমনা ভাবে প্রশ্ন করল শর্মিষ্ঠা। সে ভাবছিল সত্যিই তার এমনটি হলে সে কী করত ?

—যেমন চলছি তেমনই চলব। চলুক যতদিন চলে।

—হ্যাঁ, প্রব্লেম সব দিকেই আছে।

—প্রব্লেম আছে বলেই মানুষ বেঁচে আছে।

—তা হবে।

তখনই দরজায় খটখট আওয়াজ—পদ্ম ও সময়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

ভাইফোঁটা ও খাওয়া দাওয়ার পাট তখন সবে শেষ হয়েছে। নরেনবাবুর ফোনটা ঝনঝন করে বেজে উঠল। শাপশাপান্ত মনে মনে গালাগাল দিয়ে নরেনবাবু বিরক্ত ভাবেই ফোনটা ধরেছিলেন। ভরপেট চর্বচোষ্য লেহ্য পেয় খেয়ে পেটটা আই-ঢাই করছে। সে সময় কথা বলার ত ইচ্ছে থাকে না। এরও পর আবার ফোন। লোকের সময় অসময় জ্ঞান নেই। এই ফোনবস্তুটি একটি বিরাট অংশ নিয়েছে মানুষের ভালমন্দ সুখ ব্যথার ধারক ও বাহক হিসেবে। ভাবুন রাত এগারটায় চার পেগ ডবল স্কাটিশ চাপিয়ে সবে নতুন সেতার রূপার ঘাটগুলো পরীক্ষা করছেন—ঠিক সেই সময় ফোনে খবর এল বাড়িতে আগুন লেগেছে অথবা শেয়ার বাজারে টি এস নস্যির দাম বেড়েছে। আপনার তো মশাই হয়ে গেল! তখন মনে হবে গান্ধীজীর ফোন, টেলী বিহীন চরকার ও গরুর গাড়ির ভারত কেন হলো না। কালিদাসের আমল হলে আহাহা নবরত্নের কবিতামালার পর সরোবরে পদ্ম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেও ফোন আসত না। ভাবতে আর ক'সেকেণ্ড লাগে। তারই মধ্যে তিনবার গ্রীষ্মের কর্কশ একদল. দাঁড়কাকের মতো ঘ্র ঘ্র করে গেল ফোনটা। অসহ্য।

কিন্তু ফোন ধরেই, হ্যালো—ও হ্যাঁ আপনি—বলুন বলুন ভাল আছেন তো। একেবারে বিনম্র কোমল দীনকণ্ঠে বললেন নরেনবাবু। তিনি যেন

মাখনের মতো গলে পড়তে পারলে বাঁচতেন। মানুষের মন কঠিন খেয়ালের রাগ থেকে কোমল কীর্তনে পেঁছুতে বিন্দুমাত্র সময় লাগে না।

—হ্যাঁ—ওরা এখানেই আছে—আপনি কথা বলবেন ?

উদগ্রীব উৎকর্ণ হয়ে শর্মিষ্ঠাও শুনছিল।

—হ্যাঁ, ধরুন আমি ডেকে দিচ্ছি—ফোন হাতে ধরেই উচ্চকণ্ঠে নরেনবাবু ডাকলেন, সুলেখা—তোমার টেলিফোন—

—কে ? সুলেখা অবাক কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল। তার তখন বুকে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ভাবুক মন ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে—কে হতে পারে ?

—শ্যামলবাবু—এস ধর কর্তব্যগলিত কণ্ঠে বললেন নরেনবাবু। গলায় তার কৃতজ্ঞতার ননী ঝড়ে পড়ছে।

ত্বরিতে প্রায় ছুটে এল সুলেখা, হ্যালো। হ্যাঁ বলো। এখন···। হ্যাঁ···হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ ঘণ্টাখানেকের জন্য যেতে পারি···হ্যাঁ ওদের নিয়েই যাব···। তুমি এস তারপর বরং ঠিক করব।—

—কি ব্যাপার ? জিজ্ঞেস করলেন নরেনবাবু !

—বললেন কথা আছে—যদি আমরা বেরোই একটু—চিন্তান্বিত ভাবেই বলল সুলেখা। কী বলবে—কী এত আরজেণ্ট বুঝতে পারল না সুলেখা। একটা গভীর উৎকণ্ঠার ছায়া তার মনের ওপর পড়ল। কত কিছুই তো হতে পারে। ভাবনা বাধাবন্ধ হারা। অসংখ্য পথে সে চলতে পারে। যুক্তি তর্ক কিছুই সে ধার ধারে না।

স্বল্প সময় গম্ভীর রইল সুলেখা। কেউ তাকে ইচ্ছে করেই বিরক্ত করল না। নরেনবাবু এসব ব্যাপারে চাপা। শর্মিষ্ঠাও ঘটনা না জেনে অহেতুক বিরত করার লোক নয়। তাছাড়া তারা শ্যামলবাবুর ওপর অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও অসীম শ্রদ্ধাবনত। তাই তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করারও উৎসাহ তাদের নেই। মানুষের চিন্তা কল্পনাও নির্ভর করে মনের প্রিকণ্ডিশনিং-এর ওপর। আজব জীব এই মানুষ। দুর্বলতার স্পর্শে মনও আর্দ্র হয়ে গতিপথ ভিন্ন হয়। একই ভালমন্দ বিশ্বাসের পাথরে আটকে অন্য পথ ধরে। ধর্ম, সমাজ,

সংস্কার, পরিবেশ, জাতি ইত্যাদি অনেক কিছুই—আধুনিক রাজনীতি চিন্তাধারাকে ভিন্ন পথে চালিয়ে দেয়। হিন্দু অতএব শতলক্ষ দেবদেবীকে বিশ্বাস করতেই হবে, বাঙালী এতএব···এইভাবে যুক্তি নতুন করে শেকড় গভীরতম করে। নিজের স্বামী বা সন্তান অতএব নিষ্পাপ নির্দোষ। এ মানুষটা আমার আপনজন অতএব···। দুর্বলতার বন্ধনে আমরা মূক বধির। স্নেহের স্বভাব···স্নেহ নিম্নগামী··· ইত্যাদি শতেক যুক্তির দড়িতে আমরা বন্ধ। স্বাধীন চিন্তা ও মত দেবার ক্ষমতা মনের নেই। ভয়শূন্য চিত্ত হয় না—তা হলে সে সমাজ সংসারের চিত্ত নয় তেমনি শির কোথাও মুক্ত হয় না—তার ওপর তিনশ মাইলের বায়ু স্থাপিত হয়েছে—সে ভাবেই সে জন্মায়। তাই নীল আকাশ—কালো মেঘ সব দিয়ে ঢাকা অসীম ব্রহ্মাণ্ড। এসব ভাবতে ভাবতে সুলেখা কখন দিবানিদ্রার সুপ্তিতে বিবশ হয়ে পড়েছে। তখনই এলেন শ্যামল সেন।

শ্যামল সেনের অভিনয় এখন ঢাকা পড়ে গেছে ভালপিটে বদমাশ কিন্তু দুর্বল মনের স্নেহধন্য ফাড়ুংদার উত্তাল উন্মত্ত বাস্তব অভিনয়ে।

অভিনয় কথাটা বললে আমাদের মনে হয় সহজ মেকী কিছু একটা। সে ধারণা ভুল। অত্যন্ত ভুল। লেখক যখন চরিত্রাংকন করেন—শিল্পী যখন একটি ভাব তার ক্যানভাসে সাধনায় ফুটিয়ে তোলেন—তা যেমন কঠিন সত্য-জীবনের অভিনয়—অভিনেতার অভিনয় তেমনি কঠিন রক্তের সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সব অভিনয়ই অভিনয়ের সহজ অর্থ বহন করে না। অনেক অভিনয় অসংখ্য সত্যের ধারক ও বাহক। তাই লেখকের চরিত্রাংকন—শিল্পীর ভাব পরিস্ফুটন ও অভিনেতার অভিনয় অসংখ্য মানুষের জীবনালেখ্য।

শ্যামল সেন ও ফাড়ুংদার অভিনয়ও তেমনি জীবন ইতিহাস গড়ার রক্তস্রোত। অসংখ্য মানুষের বাস্তব অভিনয়ের তারা সিম্বল। শ্যামল সেনের মুখে গর্জিত ভাঁড়তের হাসিটি ছিল। কিন্তু গভীর দীর্ঘ দৃষ্টি মেলে তাকালে বোঝা যায় ঈশানের উৎকণ্ঠিত আশঙ্কার পূর্বাভাস তার চোখেমুখে ছড়িয়ে আছে। চোখটা কেমন লালচে—গর্তে ঢোকা। হাসি থাকলেও মুখের স্ফীতি নেই। ঠোঁটগুলো কেমন কালো কালো।

সবাই পুরীক্ষ্ণ চোখে দেখতে পায় না—অর্থও বোঝে না। আরীহ

ভাষায় যা লেখা তা পণ্ডিতের কাছে আবর্জনা। আরব পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত শ্লোকের কোনো অর্থই বহন করে না। কালো কালো দাগ দেয়া কাগজ মাত্র। তাই নরেনবাবু শ্রাবণ প্লাবনের মতোই বকে গেলেন, শর্মিষ্ঠা শরতের মেঘের মতোই উজ্জ্বল হাসি দিয়ে কর্তব্য করে চললেন। কিন্তু সুলেখার বুকে তখন ওই ঈশানের পুঞ্জমেঘ। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের শঙ্কিত শিহরণ। তেমন কিছু বলার না থাকলে শ্যামলদা থার্ড পার্সনের বাড়িতে ফোন করতেনই না। কী সেই তেমন কিছু যা অপেক্ষা করতে পারে না। এমন কী হতে পারে যে মরীয়া হয়ে ছুটে এসছে শ্যামলদা মানসম্মান সুনাম বদনাম সব কিছু উপেক্ষা করে। শত সহস্র প্রশ্নের অগ্নিশরে বিদ্ধ হচ্ছিল সুলেখা। দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে, অস্বস্তিতে তার বুক থর থর করে কাঁপছিল। কিন্তু মনের পেছনের ক্রিস্টালে একটা বিজয় আনন্দের রামধনুর বর্ণছটাও ঝলমল করছিল। ব্যগ্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গভীরভাবে সুলেখা তাকিয়ে ছিল—যেন প্রচণ্ড বিপদে পড়ে আসা ক্লায়েন্টের কোষ্ঠী বিচার করছেন জ্যোতিষশাস্ত্রী। ভীত চিন্তিত শঙ্কান্বিত হলেও সুলেখা পদ্ম ও সমরেশকে উসকে দিয়ে সব পরিবেশটাকে সহজ করে দিল। 'চল—আংকেল এসেছে-আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।' 'হুররে' বলে দুজনেই চেঁচিয়ে উঠে অল্পক্ষণেই সব রেডি হয়ে গেল। সুলেখা নরেনবাবু ও শর্মিষ্ঠাকেও অনুরোধ করল বারবার—কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই ওরা বললেন, 'তোমরা ঘুরে এস—আমরা বরং একটু বিশ্রাম করি।'

—বড় আশা ছিল সু—বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল নিজের মাটিতে ছোট একটি তুলসী গাছ হয়ে থাকলেও থাকব। তাতেই সুখ শান্তি তৃপ্তি। তাই ইণ্ডিয়া মেড ঝকঝকে পেতলের পাত্রে সুসজ্জিত বসার ঘরের বিলেত না উজ্জ্বল করে অত্যন্ত গর্বের সাথে দেশে ফিরেছিলাম। যে বিলেত কে ক্ষুদিরাম থেকে বিনয় বাদল দীনেশ পর্যন্ত ঘৃণা করেছে—তাদের মাটিতেই গেড়ে বসব এটা মনে হত স্বার্থের কাছে মনুষ্যত্বের মহা পরাজয়। তাদের কাছ থেকে অনেক শেখার আছে, জানার ও বোঝার আছে। সেটুকু হলেই যথেষ্ট।

নিজের বারুদটুকু জ্বালিয়ে এনে নিজের মানুষ নিজের দেশকে বড় হতে সাহায্য করব— । এ রকম একটা উচ্চাশা ও দেশের ওপর গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল । কিন্তু ফিরে এসে দেখলাম আমরা অনাদৃত রবাহুত বিদেশী । আমাদের কোনো দামই নেই চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে । সকলেরই এককথা, মরতে এদেশে ফিরেছ কেন ? সাহায্য করার কাউকে পেলাম না । সহানুভূতি দেখাবারও নয় ।

—তুমি এসব বলে যাচ্ছ কেন ? কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল সুলেখা । চিন্তামগ্ন ব্যথাভরা চোখে চেয়ে রইলেন শ্যামল সেন । কিছুক্ষণ । তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু আন্দাজ করার চেষ্টা করল সুলেখা । শ্যামল সেন তখনও ভাবুক স্তব্ধ । সুলেখা বলল, তাহলে কি ভাবছ আবার ফিরে যাবে ?

—জানি না এখনও । কিন্তু মনে হচ্ছে না এখানে আমি কিছু করতে পারব বলে । ডিসিশনটা ভেবে নেয়া উচিৎ ছিল । খুব ভাল একটা সুযোগ পেয়েছিলাম । গিয়ে হয়তো আর পাব না—

—আর একটু ধৈর্য ধরে দেখই না । অনেকে তো তোমার মতো এসে— আজ ঠিকই করে খাচ্ছে । ভারতের মাটিতে শিকড় গাড়তে গেলে কালবৈশাখীর ঝড়, ভাদ্রের প্লাবন, বৈশাখের খর উত্তাপ—এসবই তার টেস্ট । এতে উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে আর সে দাঁড়ানটাই কৃতিত্বের দাবি । তখন আর ঠুনকো বাতাসে ভেঙে পড়বে না । তোমার চারদিকে তখন অসংখ্য প্রজা ও শুভানুধ্যায়ী । বিদেশের গৃহবন্দী ঝকঝকে টবের গোলাপ ফুল হয়ে রইলে ঝড় বাদলার মধ্যেও যে রোমাঞ্চ আছে, গান আছে তা উপলব্ধি করতে পারবে না । একটা জীবনের পর দেখবে বেঁচে থাকার অর্থই নিরর্থক হয়ে গেছে । এখানে আমাদের স্রোত একক একটি মানুষের ভেসে যাওয়া নয়— অনেককে নিয়ে একভাবে আমরা সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা ভাল মন্দ ভাগ করে চলি । নিজের মাটিতে একসময় অন্ততঃ ফিরে না এলে—অনুতাপ থাকবেই ।

—খুবই সত্যি—অনুতাপ আজও আছে । তাই তো বিদেশে সবাই বড় গাড়ির দামী বাড়ির ও অর্থের গর্বে নিজেকে মাতাল করে ভুলিয়ে রাখে । মনে একটা 'হয়েও যেন হলো না', 'থেকেও যেন নেই', 'এতো বিদেশ' এই বহন তো আছেই । যাক সে স্বদেশ বিদেশের কথা । আমার মনে হচ্ছে আমাকে চলে

যেতে হবে সু। আই অ্যাম স্যরি যে কোনোভাবেই তোমাকে সাহায্য করতে পারলাম না—

—সাহায্য ? কিসের সাহায্য ? আমার তো সব আছে—সাহায্য তো আমি চাইনি। পরিহাস ও অভিমান মিশ্রিত স্বরে একটু ঝাঁঝালো ভাবেই বলল সুলেখা।

—আমি জানি। আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না কী যে আমি বলতে চাই। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতাশ ভাবে বললেন শ্যামল সেন।

—তুমি যদি আমার সম্বন্ধে কিছু ভেবে থাক—তা তোমার ভুল শ্যামলদা। বন্ধুত্ব ছাড়া আমার অন্য কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা বা দাবি ছিল না—আজও নেই। আমি যেমন আছি—তেমনি সুখে থাকতে চাই। হয়ত তোমাদের মতো দরদী বন্ধুদের পেলে কলসীর ঢেউ লেগে মনটা ছটফট করে—তবে সেটা সাময়িক আত্মভ্রম। পরে বরং আত্মগ্লানিতে মনটা ভরে যায়—ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল সুলেখা। ভেতরের চাঁপা উত্তেজনাটা থমকে রাখল।

—একটা কথা বলব সু ? দূর থেকে যেন ভেসে এল প্রশ্নটা।

—হ্যাঁ—একটা কেন—যত খুশি—ঠাট্টা করে মিষ্টি হেসে ঘাড় দুলিয়ে বলল সুলেখা।

—তোমাকে দেখার প্রথম দিনের তুমি—আর কয়েকমাস পরের আজকের তুমির মধ্যে যেন অনেক তফাৎ—বাঁকা দৃষ্টিতে আর একবার চোখের লেহন করে বললেন শ্যামল সেন। লাজুক একটা চাপা হাসি বেরিয়ে এল সুলেখার। উজ্জ্বল চোখদুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হলো। মুখটা পশ্চিম সূর্যের আলোতে লালচে হয়ে উঠল। অনুরাগ মেশান হাসি দিয়ে বলল, তোমার চোখের দৃষ্টি পাল্টাচ্ছে। মেয়ে দেখতে গিয়ে যে মেয়েকে দেখবে—বিয়ের পরে তাকেও মনে হবে সম্পূর্ণ আলাদা। কুমারটুলির প্রতিমা আর প্যান্ডেলে পুজো করা ঠাকুরে অনেক তফাৎ। তাছাড়া তখন তোমার চোখে অসংখ্য শ্বেত বরণী রমণীর সৌন্দর্য উছলে পড়ছিল। তাই আমাদের মতো কুৎসিত দেখে হয়ত আঁৎকে উঠেছ।

...তা ওর কোনোটাই সত্যি নয়—যদিও যুক্তিগুলো অত্যন্ত সুন্দর।

—তবে কি? মজা করেই যেন জিজ্ঞেস করল সুলেখা।

—তা আমি জানি না। হয়ত পুরনো সেই ভাললাগাটাই তোমাকে সুন্দর করেছে আমার চোখে। সেই গ্রামে যদিও ফড়িং তোমাকে জোর করেই তার দিকে টেনে নিত—আমি লাজুক হাবাগোবা ছিলাম—কিন্তু খুব দুর্বলতা ছিল তোমার ওপর। তাই মোটা বললেই বড় ব্যথা পেতাম।

—তখন তুমি কিন্তু ওই আমুল বেবিফুডের ছবির মতোই মোটাসোটা ছিলে। ব্যঙ্গ করে বলল সুলেখা।

—হ্যাঁ তা ছিলাম। ডাক্তারী পড়ার চাপে আর নিজের আত্মসচেতনতার জন্য ব্যায়াম ও ডায়েট করে আমি পাল্টে ফেলেছিলাম চেহারাটা। পরে কলেজে কিন্তু বেশ হিরোই হয়ে উঠলাম। গান, থিয়েটার গল্প কবিতা স্পোর্টস—তাছাড়া পড়াশুনায়ও ভালই রেজাল্ট করলাম। সে মজার দিনগুলো ঝাপাঝপ চলে গেল। এখন বাস্তবের কষাঘাতে ক্ষতবিক্ষত—জর্জরিত। ব্যথিত ভাবুক স্বরে অনুশোচনা প্রকাশ করলেন শ্যামল সেন।

—হ্যাঁ, তোমার জীবনটা তো ভালভাবেই কেটেছে—তবে এতদিনে বিয়েটা করে ফেলা উচিৎ ছিল। যতই দেরী করবে বোঝা ততই ভারী হবে। কম বয়সে সংসার হলে প্রথম জীবনের মতো শেষ জীবনটাও ঝাড়া হাত-পা। রেসপনসিবিলিটি যত তাড়াতাড়ি ঘাড় থেকে নামে ততই ভাল। আবার সে বোঝা না বইলেও জীবনটা একদিন শূন্যময় অর্থহীন মনে হবে। ভাবুক ভাবে দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ফিসফিস করেই বলল সুলেখা।

—ভালমন্দ বলা কঠিন তবে এখনই বোঝাটা ভারী মনে হচ্ছে। কলেজে থাকাকালীনও নিজেকে সাধ্যবদ্ধ মনে হত। এখন এই দেড় বছরেই বুড়িয়ে গেছি। একটা পরাজয়ের কালিমা এসে পড়ল পড়ন্ত সোনালী রোদের ওপর।

একটা শ্বাস টেনে দাঁতে চেপে সুলেখা বলব না বলব না করেও না বলে পারল না। কাজীপুকুরের পিয়ালীজলা গ্রামে—হঠাৎ সেই ফড়িংদার সঙ্গে দেখা হলো। দুষ্টুমির হাসি দিল একটা সুলেখা।

—কী বললে ? ফাড়ুংদার সঙ্গে ? অসম্ভব—সে তো শুনেছি বম্বেতে না কোথায় আছে। অবাক বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন শ্যামল সেন। কৌতূহলে উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, আর ইউ শিওর—

—ইয়েস—আই অ্যাম শিওর। তার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হলো।

—তাই নাকি ? ওঃ, কত বছর দেখা হয়নি। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কোথায় আছে সে ? ওর তো পুরো নামটাও আমি ভুলে গেছি—কী যেন—মনে করার চেষ্টা করতেই সুলেখা নিজেই মিষ্টি স্বরে বলে উঠল রমণী মোহন পাল একজন বড় ব্যবসায়ী—থাকেন গড়িয়াহাটার কাছেই কোথাও। ঠিকানা দিতে চেয়েছিলেন আমি নিইনি—

—রমণী মোহন পাল—নামটা কেমন যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে—ভীষণ মুষড়ে পড়লেন শ্যামল সেন। তার মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। রমণী মোহন পাল—আর এম পাল—তবে কি ? আর ভাবতে পারছেন না শ্যামল সেন। বিশ্বাসও হচ্ছে না এ সম্ভব!

মনের ভেতরটা যতই তোলপাড় করুক— হৃদপিণ্ডটা যতই ধক্ ধক্ করুক—ওপরে হাসির প্রলেপ টানলেন শ্যামল সেন। কপালের ঘাম আরও জোরে বইতে শুরু করেছে। স্নায়ুগুলো চর-চর করে উঠছে। কষ্টের হাসি টেনে আফশোসের স্বরে বললেন, ঠিকানাটা জানলে এক্ষুনি ঘুরে আসা যেত—নিজেকে সহজ করার জন্য রাগের ভান করে বললেন, শালা—কলকাতায় আছে তাও দেড় বছরে একবার দেখা হলো না। অ্যাকচুয়েলি হলিডেতে এর আগের বার এসে শুনলাম ও বম্বে না কোথায় আছে। তারপর বেমালুম ও মন থেকেই উবে গেল। আসলে পরবর্তী জীবনের অন্য বন্ধু বান্ধব এমন জট পাকিয়ে যায় যে ফেলেআসা গুড ফ্রেন্ডদের কথা মনেই থাকে না। পরে অবশ্য এক লাইনের না হলে আর মেলামেশাও হয় না। ব্যবধানটা দিনে দিনে দুপক্ষেরই বাড়তে থাকে। একটা কমপ্লেকিসটি তো আসেই। তবে ওর খোঁজ আমি দেশ ছাড়া হবার আগে করবই।

—তা আর অসুবিধা কি ? নামকরা ব্যবসায়ী যখন তখন ফোন ডাইরেকটরীতেই হয়ত নাম পেয়ে যাবে—বলল সুলেখা। তার চোখে মুখে

একটা তৃপ্তির আভাস।

—আচ্ছা ব্যাটা ব্যবসা করে পয়সা করেছে। হ্যাঁ, চিরদিনই তো ও খুব চালু ছেলে ছিল। যা চাইত তা যে করেই হোক লুটতে ওকে হবেই। আর অমন সাহস ও আত্মশক্তি যাদের থাকে তারা পেয়েও যায়। লাজুক ছেলে একটু গায়ে গা ঠেকালে চাঁটির পেটাই খায় আর জবরদস্তি করা ডানপিটে ছেলের সাতখুন মাপ—সে সর্বস্ব হরণ করলেও অনুরাগের কপট রাগের ছোঁয়া পায়।—একটু বিদ্রূপ করলেন শ্যামলদা সুলেখাকে।

সুলেখা সে ইংগিত বুঝে মনে মনে হেসে ভাবল, এখনও সে কথা সত্য। পেতে গেলে শক্তি সাহস ও মন চাই। হাত বাড়িয়ে থাকলেই মোয়া হাতে পড়ে না। অনেক সময় কেড়ে খেতে হয়। মুখে শুধু বলল, হ্যাঁ—সেরকম ডানপিটেই আছে মনে হলো। বুকটা জ্বলে উঠল বুঝি শ্যামল সেনের। কিন্তু পড়ন্ত বেলায় রোদের তির্যক রশ্মিতে দহন কোথায়? তার মাথা ঘুরছে অন্য কারণে। তা তো সুলেখাকে জানান সম্ভব নয়। ভীরু কাপুরুষ হয়ে থাকা অনেক ভাল দুশ্চরিত্র নাম নেবার থেকে। সুলেখাকে বলতে পারল না, মনুষ্য চরিত্র শতসহস্র উপন্যাসেও অঙ্কন করা যায় না। একটি চরিত্রকে অঙ্কন মাত্র ঈশ্বরই করতে পারেন। লাইন ড্রইং করে একটি মানুষের পরিচয় দেয়া যায় মাত্র। একটি ছবিতে তার অবয়বের প্রতিফলন দেখান যায় কিন্তু সমগ্র মানুষটার সেটা লক্ষকোটি ভাগের হয়ত এক ভাগও নয়। একটি মানুষের ভগ্নাংশকে নিয়ে যারা কাব্য করে, চিত্রাঙ্কন করে—তারা ভাবেন কী দারুণ জীবন চরিত্র, আলেখ্য বা সামাজিক ইতিহাস রচনা করেন। আসলে নিউটনের মতো তাদের বলতে সাহস নেই সে সাগরপারে নুড়ি কুড়ুচ্ছে বা রবিঠাকুরের মতো বলতে পারে না তার লেখা সর্বত্রগামী হয় নি। মনের ক্রিস্টালে অসংখ্য ফ্যাসেট—তার একটি ফ্যাসেটের থেকে অসংখ্য আলো বিচ্ছুরিত হয় – তার একটি রং যে শিল্পী ধরে রাখতে পারে তার কালি কলম তুলি দিয়ে সেই পরমস্বার্থক। কারণ সৃষ্টিকর্তা তার অধিক ক্ষমতা তাকে দেননি। তাই চরিত্র সৃষ্টি সমাজ অঙ্কন বলতে যা আমরা বুঝি তা চলন্ত সাগরের বুকে একটু রং ছড়ান।

সে সব কিছুই না বলে গাড়ি স্টার্ট দিলেন একসময় শ্যামল সেন। মুখ ফুটে বললেন, জান সু—মানুষ যখন যা চায় তখন তা সব পায় না—পরে যখন তার থেকেও ভাল কিছু পায় তা হয়ত তার কাছে বিষধর সর্পের ছোবল। যেমন ধর ছোটবেলা অনেকেই একটা রসগোল্লা খাবার জন্য উদগ্রীব লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত, পরে যখন তার পয়সা হলো তখন এক নয় তার রুচি পালটে গেল নয় ত তার ডায়াবেটিস বেরোল। মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়ও প্রতিক্ষণে পাল্টে যাচ্ছে। পরিবর্তনশীল এই দুনিয়ায় কিছুই যেন সত্য নয় আর কিছু সত্য এমন ঘটে যায় যে প্রাণ নিয়ে বাঁচা শক্ত। গভীর দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে পড়ল গাড়িতে।

—তোমার মতো ডাক্তারের হেয়ালী দর্শন আমি কিছুই বুঝলাম না। রমণী মোহন পালের কথা উঠতেই তুমি যেন ভুল ভাল বকতে শুরু করেছ। —টিটকিরি দিয়ে বলল সুলেখা।

উত্তর দেবার শক্তি ইচ্ছা সাহস কোনোটাই নেই। কথা ঘুরিয়ে শ্যামল সেন বললেন,—বাংলার মাটিতে পা পড়লেই কাব্যের কাদায় ডুবে যাই। বিলেতের শীত গরম পানীয় আর গরম সঙ্গিনীর কথা ভেবেছি। এখানের গরমে শীতল কাব্য ও শীতল ডাবের জল। তা কী বলল ফড়িং ?

—কী আর বলবে ? কয়েক বিন্দু জীবন ইতিহাস ছাড়লেন। অনেক কষ্ট করে একটু একটু করে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠেছেন। সিঁড়ির চিহ্নও দেখতে পায় নি। এখন ব্যবসা খুব ভাল। বিয়ে থা করেছেন। সুখেই আছেন। তবে ছেলেমেয়ে হয়নি এখনও। বাস—এই কথাগুলোও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন—বাঁকা দৃষ্টিতে একঝলক হাসি দিয়ে বলল সুলেখা। সে ফড়িংদার কথা বলতে বেশ যেন মজা পাচ্ছে। শ্যামল সেনের বুকে একটু টিকের আগুনের ছ্যাঁকা লাগুক। তার ওপর দরদ করুণা মমতা হয়ত বা ভালবাসাও আছে—কিন্তু কই জোর করে তো বলতে পারেন নি আজ তোমাকে আমার চাইই। সেও তো ব্যাচেলার—ওয়েস্টার্ন ওয়ার্লড থেকে সবে ফিরেছেন—সংসার বলতেও কেউ নেই। তবুও কত জড়তা। কৃপাদৃষ্টি আছে—হয়ত ইচ্ছাও আছে কিন্তু অন্ধকার সলিলে ঝাঁপাবার সাহস নেই। এই তো

বাঙালী—শিক্ষিত—উদার। অথচ ডিভোর্সড্—দশবিছানায় শোয়া সেপারেটেড মেম পেলে তার পা চেটে বিয়ে করব বলতে দ্বিধা হত না। রং—পরিবেশ। যে দেশে যা। তার ওপর দু'শ বছরের পরাধীনতার মেরুদণ্ডহীনতা।

একটু গোম হয়ে কী সব ভাবছিলেন শ্যামলদা। তার দৃষ্টি অনেক দূরে। সুলেখা ঠিক ভেবে উঠতে পারছিল না—পুরনো হিংসা না অন্য কিছু।

—যদি বিলেতে ফিরেই যাও যাবার আগে দেখা করে যেও একবার।

—নিশ্চয়ই যাব সুলেখা—দৃঢ়স্বরে বললেন শ্যামল সেন।

সমরেশকে তার বাড়িতে নামিয়ে পদ্ম ও সুলেখাকে প্রাচীর সামনেই বাই বাই করলেন শ্যামল। তার চোখে মুখে কালি ভেঙে পড়েছে। তাকালেই বোঝা যায় উদাস উদ্বিগ্ন চিন্তামগ্ন সে। বেশি ঘাটাল না সুলেখা। ভাবনার বোঝা যদি কারও চেপে থাকে—তাকে নিজেকেই তা সহজ করে তুলতে হবে। তবে সুলেখার মনে হলো যে কথা বলতে শ্যামলদা ছুটে এসেছিল তা সে বলতে পারে নি। মনের সিন্দুক সে খুলতে পারে নি।

খুলেও লাভ হত না তোমার শ্যামলদা। সেই ফড়িংদা ঠিক সময় হাজির হয়ে আমার দুর্বলতার সব মেঘ উড়িয়ে দিয়েছে। এখন আমার মনের আকাশ শরতের আকাশের মতো নীল—নীল—ঝলমলে পরিষ্কার। ভাবল সুলেখা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আবার ভাবল সুলেখা বাড়িতে ফিরে। পদ্মকে শাসনের সুরে বলল, আর নয়—পুজোপার্বণ আজ সব শেষ এবার থেকে লেখাপড়া। পদ্মর ভাল নাম রণিতা। চেহারাটা রুগ্ন। একসময় খুবই ফর্সা ছিল, এখন রোদে পুড়ে পুড়ে কালচে হয়ে গেছে। মেয়েটা সুলেখার মনে হয় বড্ড অবাধ্য আর ছেলেমানুষ। বার বছর বয়স হলো তাও হুসতাপুস নেই। ছুটছে খেলছে। পড়তে চায় না একেবারে—কিন্তু বলার কিছুই নেই পরীক্ষার ভাল রেজাল্ট। দিদিমণিরা খুশি। সুলেখার চিন্তা ভাবনা কম নেই কিন্তু কী করে যে মেয়েটাকে ভাল পুতুল বা প্রতিমার মতো করবে তা বুঝে উঠতে পারে না। নিজেও দশটা পাঁচটা কাজের চাপে অনেক সময়ই যতটা যত্ন করা দরকার তা পেরে ওঠে না। কিন্তু এখন মনে হলো সেটাই বড় দরকার। আর সব ধোঁয়া কুয়াশার মতোই উবে যাবে।

ভাবতে ভাবতে চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল পদ্মর। ভাল করে সাবান মাখবার পর সুলেখার মনে হলো পদ্মর এই কালচে প্রলেপের নিচেও সোনা আছে। একটু মাজা ঘসার দরকার। তার নিজেরও তো কয়েক মাস আগেও কালির ছোপ ছিল সব জায়গায়। এখন আয়নায় নিজেকেই মনে হয় রূপ তার অন্য যুবতীদের চেয়ে কম নেই। নিজের দেহটার দিকে তাকিয়ে নিজেরই খারাপ লাগে। কী দুর্ভাগ্য এ দেহটার—ঢেউয়ে আছড়ে পড়ছে বিন্তু বাইবার মতো মাঝি কই।

সেদিন আমার ব্যথার সীমা ছিল না—আজ আমার আনন্দ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও ধরে না। আমি জানি এ অপ্রকাশ্য। যা প্রকাশ পায়নি তার তো আর আলোচনা বা সমালোচনা হয় না—তাই তার ভালমন্দ নেই। সমাজবাসী মনটা ব্যথায়ও আনন্দ পায়—আনন্দেও সুখ পায় না। সবই নিজের দেহ মন ও আত্মার স্বার্থে জড়াজড়ি করে আছে।

আমি ইংলিশ বিয়ে করে ইংলণ্ডের মাটিতেই শিকড় গাড়লাম আর আমারই বন্ধু মুক্ত বিহঙ্গের মতো আবার স্বদেশে ফিরে গেল। তখন নিজেকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির থেকেও অসহায় ও অপমানিত মনে হয়েছিল। এমন কি জেন অর্থাৎ জেনিফার আমার মনের কথা বুঝতে পেরে সহানুভূতি জানিয়ে বলেছে, কাম অন, আপসেট হবার কী আছে? তোমাকে বিয়ের আগেই তো বলেছি—তুমি যেখানে যেতে চাইবে আমি এগ্রি করব। আজই তুমি চল ইণ্ডিয়াতে, আমি তৈরি। আমাদের লক্ষ লক্ষ ইংরেজ এককালে ভারতে থেকেছে, আজ তোমরা স্বাধীন হলেও আমি তো তোমারই ওয়াইফ। একটু সময় ধৈর্য ধর—কিছু পয়সা জমিয়েই আমরা চলে যাব—কিন্তু আমি জানতাম তা সম্ভব নয়। বড়লোকের ছেলে এসে জলপদ্ম তুলে নিয়ে দেশে গেল সে অন্য কথা। আমার মতো যাকে রুটির চিন্তা করতে হবে—যার পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিও হয়নি তার পক্ষে মেমসাহেব পালন করা তো—সাদা হাতী পোষা। এখানে জেন যতই সাধারণ হোক—কমপেয়ার করলে সে স্টাণ্ডার্ডও কোয়াইট হাই। টয়লেট পেপার কিনতেই হয়ত মাসের আয় চলে যাবে। তবে জ্যানেট বড় ভাল মেয়ে। সিগারেট খায় না, ড্রিঙ্ক—অকেশনাল, কত কম

খরচে সংসার চালাবে তার চিন্তা। নিজে কাজ করে, বাড়ি সাজায়। শাক চচ্চরি থেকে সব ভারতীয় খানাই প্রায় রান্না করতে পারে। যদিও আমি নিজেই সহজ জীবনযাত্রার জন্য কৌটো কেটে খাই সপ্তাহে পাঁচদিন—একদিন হোটেল রেস্টুরেন্ট—একদিন দেশী খানা। এককথায় জেনিফার ইংরেজ থেকেও ইংরেজ আবার বাঙালী ন্যাকা ছিঁচকাদুনীর থেকে অনেক ভাল বাঙালী। স্বভাব মন ভালবাসা শিক্ষা ধৈর্য এসব তো আর রংএর উপর নির্ভর করে না। গার্লফ্রেন্ড থেকে ফিয়াসে আর ফিয়াসে থেকে স্ত্রী পৌঁছুতে জেনিফার সহস্রবার অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে। কতবারই তো আমি ছাড়াতে চেয়েছি কিন্তু ওর নরম উষ্ণ ভালবাসার কাছে এই অত্যন্ত স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়ও হার মেনেছে। ভারতীয় রমণীর থেকে জেনিফার ব্যবহারে কোনো তফাৎ পাইনি। বরং যে ভারতীয় যুবতীর সান্নিধ্য আমার দেহেমনে নিতান্তই কল্পনা মনে হত—জেনিফার তাদের দলে। রূপ গুণে কথাবার্তায় সে শিক্ষিতা রূপসী শান্তিনিকেতনের যুবতীকে হার মানায়। ভারত সম্বন্ধে তার জ্ঞানও অনেক ভারতীয় মেয়ের থেকে বেশি। সোসিওলজিতে গ্রাজুয়েট। তারপর চাকরি করতে করতে হেলথ ভিজিটর কোর্স করে—প্যারা মেডিক্যাল স্টাফ হয়ে হাসপাতালে এল। পরিচয়, প্রেম—ভেসে গেলাম।

তবুও প্রাণের বন্ধু শ্যামল যখন তল্পি-তল্পা গুটিয়ে গর্বিতভাবে নেতাজীর মতো স্বদেশ অভিমুখে চলল তখন ব্যথায় আমার বুকটা ফেটে গেল। ওকে যেতে আমিই তাগাদা দিতাম। বলতাম, আবে পরদেশে ভিক্ষা-বৃত্তি—এখানে মরবি তুই—নিজের দেশে ফিরে যা। একদিন সে সত্যি ফিরে গেল—আমি রইলেম পড়ে··· । হিথ্রো এয়ার পোর্টে ওকে সি অফ করলাম—পিঠ চাপড়ে আশা দিলাম। বললাম, আমি রব নিষ্ফলের হতাশার দলে। বিজয় উল্লাসে—নতুন দৃষ্টি নিয়ে বাই বাই জানাল শ্যামল কান্তি সেন—ডবল এফ আর সি এস। 'ফাটি বাওত ছাতিয়া'—এয়ার পোর্টের কারপার্কের থার্ডফ্লোরে এসে—আর কান্না থামাতে পারিনি। এই বয়সে আমি হাউ মাউ করে কাঁদলাম। শ্রাবণের ধারা মেঘের গর্জন—বিদ্যুতের চমক। রুমাল দিয়ে চোখ মুখ মুছলাম। বুকটা পাথরের মতো শক্ত—ব্যথায় যেন ফেটে

পড়তে চাইছে। মনটা বেশ কিছুদিন শরতের সজল উদাস হাওয়ার মতোই ঘুরে বেড়াল। আবার কিছুদিন পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ঝলমলে বিলেতী অন্যান্য প্রবাসী বাঙালীর মতোই একটানা একঘেয়ে জীবন চলছিল। প্রচণ্ড শীত আর কম শীত—এই দুটো ঋতুই বিলেতে। অন্যগুলো নিতান্তই মনকে সান্ত্বনা দেয়া। তবে হ্যাঁ, এমন ঘন সবুজ দেশ পৃথিবীতে কম আছে। টপ টু বটম সবুজে ছাওয়া। অল্প বসন্তেও ফুলে ফলে ছেয়ে যায়। তখন আবার মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

কিন্তু শ্যামল আবার ফিরে আসবে তা কল্পনার চোখেও ভাবিনি কখনও। তার চিঠি মাঝে মাঝেই আসত। 'চলছে—হচ্ছে—হবে।' তারপর ঝপাং করে টেলিগ্রাম এল হিথ্রোতে এইদিন এইসময় আসছি—তোকে আসতেই হবে।' যাঃ বাবাঃ। তবুও মনটায় একটু আনন্দের ঢেউ বয়েছিল। খারাপও লেগেছিল ব্যাচারা অমন গর্ব করার মতো সিনিয়র রেজিস্টারের কাজটা সুভাষ বোসের আই সি এস এর সার্টিফিকেটের মতো ছিঁড়ে ফেলে চলে গেল—সে সুযোগ আর পাবে না। চ্যারিংক্রস্ টিচিং ইনস্টিটুটে—সার্জিক্যাল ডিপার্টমেন্টের 'এস আর' হলে সে কনসালটেন্ট হবেই—এমন সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে আবার তার প্রত্যাবর্তন। ব্যাচারা। আবার আনন্দও হয়েছিল—আমার দলেই ভিড়ল ভেবে। এই যে এল আর শালা ফিরতে পারবে না। একবার খারাপ অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশ থেকে ফিরে এলে তার পক্ষে ব্যাক টু ইণ্ডিয়া—ইমপসিবল। সেটা ভাল কি মন্দ সে যুক্তিতর্কের খোঁজ খবর মন করতে চায়নি। ফাঁকি দেয়া প্রেমিকার বিধবা হয়ে ঘরে ফেরার খবরের মতোই শ্যামলের ফিরে আসার খবরটা আমার কাছে অম্লমধুর মনে হয়েছিল।

মনের মধ্যে যতই দুশ্চিন্তা থাক আমাকে দেখামাত্র শ্যামল উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভরে গিয়েছিল। হিথ্রো কাস্টমস থেকে বেরিয়ে ট্রলি একধারে রেখে হাত বাড়িয়ে দুবন্ধু দুজনকে জড়িয়ে ধরেছি। যত চট করে শ্যামল আনন্দের আতিশয্যে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল তত চট করে তার হাতদুটো আমায় ছেড়ে দিল। যেন বাঁধনটা কেউ ছুরি দিয়ে ঝপ করে কেটে দিল। আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? ক্লান্ত শ্রান্ত শ্যামল

যেন চোখে ভূত দেখেছে। ব্যাপারটা কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না। হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে দেখি পাটিয়সী তন্বী এক বিবাহিতা সুন্দরী ললনা একটু দূরে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ ওর দিকে তাকিয়ে স্বল্পস্বল্প দুষ্টুমির হাসি হাসছে। অনেক বছর কলেজের অনেককে না দেখলেও 'ওই দুটি চোখ' আর 'ওই বিজলির হাসি'—তা তো আর এ জীবনে ভোলা যায় না। তাই আমিই চেঁচিয়ে উঠে বলে উঠলাম, 'তুমি এখানে—তুমি আবার কবে এলে?' মহুয়া হেসে জবাব দিয়েছিল, 'দুদিন আগে এসে গৃহকর্তার জন্য ঘর সাজিয়েছি।' মহুয়ার চোখে মুখে দারুণ আত্মতৃপ্তি ও বিজয়ের উল্লাস। কম অবাক হবার কথা নয়। বিস্ময়ে বিভ্রান্ত হয়ে সারেন্ডার করলাম। নরম সুরে ঢোক গিলে বললাম, 'স্যরি, আমি কিছুই বুঝলাম না।'

—ইট উইল টেক টাইম—সবই বুঝবে। ঈষৎ ভ্রূ বাঁকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল মহুয়া। তারপর চোখের সামনেই টুক করে একটি চুমো খেল শ্যামলকে। তুমি ভীষণ টায়ার্ড—চল গাড়ি অপেক্ষা করছে কার পার্কে। মেসোমশাইর বাড়িতে তোমার থাকার ব্যবস্থা করেছি। পরে কাজ পেলে ভুলনার। চল। আমি হতভম্ব হয়ে টাল্‌স টুল্‌স দুজনকে দেখছিলাম। শ্যামলের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। নিজেকে জোরজার করে সংবদ্ধ করার পর বলল, 'আমি জয়দীপের সঙ্গে যাব—আমার জন্য এ বেচারা ছুটে এসেছে'—শ্যামলকে মনে হলো ঝড়ে পড়া উৎকণ্ঠিত বিধ্বস্ত বাজপাখি। তার মুখ থেকে যেন তার কথা বেরুচ্ছে না। নিজেকে সে প্রচণ্ড ভাবেই স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছিল —সেটা তার ব্যবহারে পরিস্ফুট ছিল।

বাঃ এ ব্যাচারার দয়ায় উছলে পড়ছ—জয়দীপদা এসেছেন ইংলণ্ডেরই কোনো জায়গা থেকে আর আমি এসেছি সেই কলকাতা থেকে। তাছাড়া অলওয়েজ লেডিস ফার্স্ট। ন্যাকামো ছাড়—মেসোমশাই ওয়েট করছেন অনেকক্ষণ। জয়দীপদার ঠিকানা তো জানই। দুএকদিন বিশ্রাম করেই যাওয়া যাবে। এত তাড়া কিসের! বলে মহুয়া নিজেই শ্যামলের ট্রলি ঠেলতে উদ্যত হলো। সে একটু এগোতেই আমি ইংগিতে শ্যামলকে জিজ্ঞেস করলাম—কী ব্যাপার? শ্যামল নিম্নস্বরে বলল, পরে বলব।

আমি আর জোর করলাম না। ভেতরে উৎসুক মনটা ছটফট করছিল। ড্রামাটা মন্দ জমে নি। নিজেই বললাম, তুই ওর সাথেই যা—আমার ওখানে পরে আসিস। এত করে বলছে যখন ওকে ফিরিয়ে দিস না। অনিচ্ছায় কি ইচ্ছায় জানি না শ্যামল মহুয়ার সাথেই যেতে বাধ্য হলো। সুন্দরী রূপসীর আবাহনে না করা অসম্ভব—আমি শুধু এটুকুই বুঝেছিলাম।

শ্যামল ও মহুয়ার সম্বন্ধে কানাঘুষো শুনেছি কলেজে পড়াকালীন। সে তেমন কিছু নয়। মহুয়ার সঙ্গে অমন মেলামেশা আমি নিজেও করেছি। আমার সঙ্গেও মহুয়াকে নিয়ে একসময় ছাত্রছাত্রী কলগুঞ্জন করত। কিন্তু পরে আমি ও তারা সবাই বুঝেছিলাম ওটাই মহুয়ার স্বভাবসিদ্ধ ব্যবহার। ওর মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছাড়া প্রেম ছিল না।

মাঝে একবার এক নিমেষে একগুচ্ছ হাসি ছড়িয়ে বলেছিল, সব কথা পরে হবে জয়দীপদা। দেখা হলো—খুব খুশি হলাম। আজ আর কথাবলার সময় নেই। মেসোমশাই অপেক্ষা করছেন—বলে একরকম চোর ধরে নিয়ে যাবার মতোই হিথ্রোর প্যাসেঞ্জার অরণ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। শ্যামল মনের আগ্নেয়গিরির ওপর ঢাকনা চাপিয়ে ম্লান হেসে বিদায় নিয়েছিল। আর আমি ভাবতে বসেছিলাম—এ কী করে সম্ভব হতে পারে!

অনেকের মন বড্ডই একরোখা হয়। নয়ত শিক্ষিতা ভাল ঘরের বর্ধিতা রূপ ও গুণের সীমা নাই এমন একটি ভাল রমণী কেন দেশ সমাজ সংসার সুনাম সব পরিত্যাগ করে তার প্রেমাস্পদের আসার দু'দিন আগেই বিলেতে এসে হাজির হবে।

খবরটা পেয়ে উগ্রচণ্ডী হয়ে গিয়েছিল মহুয়া। হাসপাতালের বেয়ারা সুধীরই খবরটা দিয়েছিল কথায় কথায়। এমন ভাল ডাক্তারবাবু—টিকলেন না। এদেশে কে আর টিকবে। বলে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে গোটা কুড়ি ডাক্তারের নাম গড় গড় করে বলেছিল সুধীর। শুনে চমকে গিয়েছিল মহুয়া। রাগে

ক্ষোভে দিশেহারা হয়ে আবার বাড়িতে ফিরে এসেছিল। পাসপোর্ট করাই ছিল—তা নিয়ে ব্রিটিশ হাই কমিশন। ফিরে এসে মেসোমশাইকে লণ্ডনে ফোন। ব্যবস্থা হতে সময় লাগেনি।

স্বামী রমণীবাবুর সাথে হঠাৎ রাত নটায় দেখা। দেখাসাক্ষাত তাদের হত না বললেই হয়। ফেস সেভ করার জন্য একসঙ্গে থাকত তারা—সহবাস করত না। এও সম্ভব? দুনিয়ায় কী না সম্ভব। রমণীবাবু সুগার কোটেড কুইনিন হুকুম করলেন। বললেন, অল দ্যা বেস্ট ইন ইউ কে। তবে বিয়ে করলে আমাকে জানিও। অফ কোর্স আই উইল। চোখে তরল বিদ্যুতের ঝলসানি দিয়ে বলেছে মহুয়া। তার মাথায় তখন শত চিন্তা। তার দৃষ্টি তখন ঈগলের মতোই একরোখা। তার প্রধান আনন্দ সে শ্যামলদাকে চমৎবিদ্ধ করে চমকে দেবে হিথরোতে। শ্যামলের প্রতি এই অদমনীয় রীরংসা—তার দেহের তটেতটে রোমাঞ্চের ঢেউ বয়ে তুলল। একাই বিলেতে সে শ্যামলকে পাবে। তবে আগেই সে চলে গেল না কেন? ভাবল মনে মনে। এতগুলো বছর এভাবে জেলখানায় পচে মরল কেন মনটা? তখন সে বয়সে সমাজ ভাঙতে সাহস হয়নি। নিজের প্রাণের জোরটা তখন জানত না। তাই অন্য ইনডাইরেক্ট অস্ত্র ছেড়েছিল। নিজের নাক কেটে শ্যামলকে পাবে ভেবেছিল। কিন্তু শ্যামল মান-অভিমান বোঝে না। চলে গেল। আর এই ক'বছর ধরে কাটা নাকের ব্যথায় ছটফট করেছে মহুয়া। কিন্তু এখন আর ছাড়া নেই। সেই ভেবেই হিথরোতে চলে এসেছিল মহুয়া—ঝড়ের বেগে। সে খবর শ্যামলও জানতেন না। তাই ভূত দেখেই যেন চমকে উঠেছিলেন।

মহুয়া অশান্তির কারণ হলেও ঝকঝকে আসবাবপত্রের মতোই গৃহসজ্জা হয়ে বিরাজ করছিল রমণী মোহনের সুসজ্জিত বাসস্থানে। স্বামী-স্ত্রীর মতো জড়িয়ে না থাকলেও দুটো রেল লাইনের মতো পাশাপাশি দূরত্ব রেখে দু'জনে জীবন কাটাচ্ছিল। অন্য মানুষ জনের কাছে সেটা সহনীয় ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। এমন দম্পতির আর অভাব কি বর্তমান সুসভ্য স্বাধীন সমাজে।

রমণী মোহনের মর্যাদা থাকলেও তার প্রকাশ বোতল ও অন্য রমণীর ছিপি

দিয়ে বন্ধ ছিল। আত্মসুখ পাবার সে উপকরণগুলো তার অনেক আগে থেকেই দেহে লেপ্টে ছিল। বিয়েটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে এসেছিল—ঝট করে সে মৃগতৃষ্ণায় ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের ভুলভ্রান্তি বুঝে নিয়েছেন। কিন্তু তার চলার পথের সাথীরা তাকে বিবাগী হতে দেয়নি। কাব্যের ও কল্পনার ধার তিনি ধারেন না। অল্প সময়ে আবার নিজের বলয়ে ফিরে এসেছিলেন। তাই মহুয়াও স্বস্তি পেয়েছিল উপগ্রহ হয়ে আপন পথে চলতে পারার স্বাধীনতা পেয়ে।

পিসফুল কো একসিস্টেন্স। পঞ্চশীল মেনে নিয়ে তারা মোটামুটি ঝগড়া বিরোধ বাঁচিয়ে চলছিল। কিন্তু অনেক দিন একটা পথ ধরে হাঁটলেও সে পথটার ওপর একটা আর্দ্র স্নেহ ভালবাসার দুর্বলতা পেয়ে বসে। তাই মানুষ ভাবে···তার সেই গ্রাম···সেই চালতে গাছ, গাব গাছ, কলার ঝোপ বাঁশের ঝাড়। মহুয়া হঠাৎ চলে যাওয়ায় রমণী মোহনের তেমন কিছুই ভাবান্তর হয়নি। সে রাত্রে তিনি তাড়াতাড়িই ফিরে এলেন। সবাইকে সারাটা দিন গর্ব ও আনন্দের অভিনয় করে বলেছেন, মহুয়া এফ আর সি এস না কী সব কর্তে বিলেত গেল। ব্যবস্থা করতেই আমি এক সপ্তাহ হিমসিম খেলাম। ইত্যাদি অনেক ছোটগল্প মনগড়া তৈরি করে যেখানে যেটি সম্ভব ছাড়লেন। ওটাও তার স্বভাব। ঝটপট যুক্তিপূর্ণ গল্প বানিয়ে চালিয়ে দেয়া ও তার সঙ্গে কিছু উপমা যোগ করে শক্তপোক্ত করে দেয়া।

বাড়িতে ফিরে প্রথমেই মালি ব্যাটার কান্নাভাঙা আপশোস ভাঙাতে হলো। তারপর টমি কুকুরের দীর্ঘ আর্তনাদ। সে ঘেউ ঘেউ বড় একটা করে না। আজ সুদীর্ঘ কণ্ঠে তার ব্যথাও বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বেচারা মানুষ তো নয় তাই অন্য চিন্তার জল ছিটিয়ে টিয়ার গ্যাস ডাইলুট করতে জানে না। ব্যথায় কাঁদে আনন্দে চটে।

প্রতিটি ঘর যেমনটি ছিল প্রায় তেমনটিই পড়ে আছে। শুধু মহুয়ার ঘরটি শূন্য। এমন কি ছেঁড়া চটি জুতোও নেই। কোথাও এতটুকু চিহ্নও নেই যে এঘরে কোনো নারী কোনোদিন বাস করেছে। বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। মহুয়া চলে গেছে, ঠিক তা নয়···কত সময়ই তো মহুয়া বাড়িতে

থাকেনি। মাঝে বছরখানেক দিল্লীতেও ছিল কী সব কোর্স করতে। কিন্তু ছুটিতে এখানেই থাকত। নিজের বাড়িই নিশ্চয়ই ভাবত সে। অথচ এবার কোনো স্মৃতির একবিন্দু ধুলো রেখেও যায়নি। তার অর্থ তো একটাই সে আর ফিরবে না। মাথায় রক্ত উঠেছিল রমণী মোহনের। মানুষ এত বেইমান হতে পারে? এত স্বার্থপর…নীচ হতে পারে? সেই তো তার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। সে তো তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়নি, কখনও অপমান করেনি…কোনো কিছুতে কার্পণ্য করেনি…জোর করে রেপ করেনি। নিজের স্ত্রীকে তো অসংখ্যবার রেপ করে মানুষ। পারমিশন ছাড়া পেনিট্রেশনই অনেকটা রেপ। কেউ তো বাধাদেবার ছিল না। হয়ত ওই ভুলটাই করেছি …হয়ত জোর করে ওকে ভালবাসান উচিৎ ছিল। দৈহিক সুখ ও পরে সন্তান হলে সব মা-ই পাল্টে যায়। ভ্রমরকে জোর করেই ফুলের মধ্যে পরাগ মিলন ঘটাতে হয়। ভুল…সবই ভুল। ভুল দিয়ে ভুলটাকে বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত দুটো পাখা লাগিয়ে দিলাম ওই স্টুপিড ভলে…আমারই ভুলের আগুনে দগ্ধ হতে ছুটল সে বিলেত। মাথায় হাত দিয়ে রমণী মোহন ভাবতে বসেছিলেন। তিনি ভাবলেন…ভাবতে ভাবতে কোথায় হারিয়ে তলিয়ে গেলেন। একসময় স্কচ্ হুইস্কির বোতলও খুললেন। নিবারণ এসে জিজ্ঞেস করল, আলোটা দেব?

তখন রাত হয়েছে। বাইরের রাস্তার আলো এসে পড়েছে। আলো আঁধারে ঘরে কালো কালো ছায়ার ভূত পেত্নীতে ভরে গেছে। তারা যেন পাতালের নৃত্য করছে মাঝে মাঝে। দূরে ভেসে আসা ভাবে ব্যাকুল সুর ভেসে বাবু বললেন, টেবিল লাইট দুটো জেলে দে।

জেনারেটর চালিয়ে টেবিল লাইট জেলে নিবারণ আবার জিজ্ঞেস করল, কিছু খাবেন এখন?

আনমনা ভাবেই বললেন, কী আছে?

কম্পিত করুণ স্বরে নিবারণ বলল, তন্দুরী চিকেন আর রুটি…নয়ত মাংসের চপ ভেজে দিতে পারি।

বাঃ…নিয়ে এস তবে।

কর্মচারীদের এনারা বহাল তবিয়তেই রেখেছেন। পয়সার অভাব নেই অথচ বাচ্চাদেরও ঝামেলা নেই। সংসার বলতে পার্টি আর ব্রেকফাস্ট। বেশির ভাগ সময় দুজনেই বাইরে খায়। কিন্তু অর্ডার সব সময় ফ্রিজে যেন কিছু সুখাদ্য ও মিষ্টি থাকে। মাঝে মাঝেই দুজনার গেস্ট তো আসেই। তবে কিছুদিন কাজের পরে তাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না এটা দুটো আলাদা মানুষের সেমি ডিটাচড্ বাড়ির মতোই। তারা অবাক হয় প্রথমে কিন্তু পরে স্বাভাবিক হয়ে যায়। কেননা এতে খাওয়া থাকা বখশিস ডবল···আর নির্ঝঞ্ঝাট। তাই নিবারণ আছে পাঁচ বছর হয়ে গেল। কিন্তু ডাক্তার দিদিমণি চলে গেল এখন তারও ভাববার সময় এসেছে। যদিও কেন গেলেন কবে ফিরবেন·· তা কেউ জানে না। কিন্তু যেভাবে কুড়িয়ে কাছিয়ে সব বাপের বাড়ি পাঠিয়েছে তাতে দিদিমণি ফিরবে কিনা সে সন্দেহটা নিবারণেরও হয়েছে।

নিবারণ গরম গরম মাংসের চপ, স্যালাড ও চিকেন সাজিয়ে এনে বাবুকে দিল। তার সঙ্গে বরফ সোডা ইত্যাদি। একটু সময় সে থমথমে মুখখানা নিয়েই অপেক্ষা করল। গদি আঁটা ইজি চেয়ারে শুয়ে···পাদানির ওপর পা রেখে বাবু চুপ করেই ছিলেন। উঠে বসে তাকালেন নিবারণের দিকে। নিবারণ মাটিতে মিশে গেল, 'কতদিন ধরে যাবার তোড়জোর করছিলেন দিদিমণি ?' একটা অজানা সন্দিগ্ধ তীর বিঁধল নিবারণের বুকে। বাবু যে জানেন না সেটা জেনেই সে অবাক হলো। পরিষ্কার গলায়ই বলল, তা দিন তিন চার হবে।

—কই আমাকে জানাও নি তো ? প্রশ্ন করলেন বাবু।

—সে কি, আমরা তো ভেবেছি আপনি সবই জানেন দাদাবাবু। নিবারণ যেন আকাশ থেকে পড়ল।

···ঠিক আছে যাও···আমার কিছু দরকার হলে জানাব। দেখো রাত্রে দরজাগুলো যেন ঠিক মতো বন্ধ থাকে।

—দেখব—বলেই অন্তর্ধান হলো নিবারণ। এটুকু সে বুঝল দিদিমণির যাবার ব্যাপারে দাদাবাবুর ঠিক মত ছিল না। রমণী মোহনও বুঝলেন এ ব্যাচারাদের ঘাটিয়ে লাভ নেই—তাতে ব্যাপারটা আরও তিক্ত হবে। কিন্তু কেন হঠাৎ মহুয়া বিলেত হাওয়া হলো সেটাই বিরাট প্রশ্ন হয়ে বার বার ঘুরে

আসছে। কিছুদিন ধরে তিনি লক্ষ্য করেছেন মহুয়ার দেহের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছিল। তাকে বেশ নবযৌবনার মতো উচ্ছল মনে হয়েছে। সে প্রায়ই কারণে অকারণে গান করত। অনেকদিনের দেয়াল ভেঙ্গে সে তার কাছে কোনোভাবেই যেতে পারেনি। ডানপিটে দুরন্ত ছেলেও হঠাৎ চমকে ভয় পেলে বা অভিমানে কাতর হলে সেদিকে পা বাড়ায় না—উদ্ধত মন পরাজিত হতে চায় না। তারা সব সময় ছিনিয়ে নিতে চায় কিন্তু মানবিকতার আঘাত পেলে সে পথের থেকে দূরে থাকে। তাই ছিলেন রমণীবাবু। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সব ভুল—সব ভুল। এমন বেইমান দুশ্চরিত্রা স্বার্থপর নীচ মেয়েছেলেকে তার শিক্ষা দেয়া উচিৎ ছিল।

রাগ, অনুশোচনা ও অপমানের দাহে বুকটা জ্বলে উঠেছিল রমণীবাবুর। হুইস্কি ও মাংসের চপ খেতে খেতে সিংহের মতোই তার ভেতরটা গর্জে উঠেছিল। সমাজের এই বাঘিনীর রক্তদন্ত ও নখগুলোকে কেটে রাখা উচিত ছিল তার। বাঘের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে ভেড়ার চামড়া পরাতে তার অসুবিধার কিছুই ছিল না। কিন্তু ওই মান অভিমান সমাজবোধ তাকে পশু করে রেখেছিল। আজ তাঁর চোখ খুলেছে। এর বদলা তাকে নিতেই হবে। কিন্তু ধীর ও শান্ত ভাবে। অতি নিঃশব্দে···রাতের অন্ধকারে। মহুয়াকে পেলে তাকে ছিন্নভিন্ন দগ্ধ করে টুকরো টুকরো করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে পারতেন। নিজের আগুনে নিজে দগ্ধ হন। তবুও নিজেই সান্ত্বনা দেন নিজেকে—এই দহনে আমি আরও বাস্তব আরও কঠিন হব। মানুষই মানুষকে আঘাত করে পশু করে তোলে। মানুষের আঘাতেই ভাল মানুষের ভাল মানসিকতা ক্ষয়ে ক্ষয়ে ঝড়ে পড়ে।

ভাবনায় নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করতে করতে একসময় ঘুমিয়েই পড়েছিলেন রমণীবাবু। নিবারণ গায়ের ওপর চাদরটা বিছিয়ে আলোগুলো নিভিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বাবুকে ডেকে বেডরুমে যাবার জন্য বলার সাহস হয়নি।

শয়নটা কমফোরটবল নয়। রাতের কোন প্রহরে ঘুম ভেঙে টলতে টলতে টয়লেট সেরে নিজের কোমল ঠাণ্ডা বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছিল আবার, সে জানার মতো অনুভূ অনেক রাত্রেই থাকে না রমণী মোহন পালের। সেই রাতের

ভোর হবার ঠিক আগে অর্থাৎ ব্রহ্মমুহূর্তে স্বপ্ন দেখছেন রমণীবাবু। তার পুষ্পশয্যার স্বপ্ন। চরিত্রে যতই দোষ থাক···তা স্বভাবের নয়···সময়ের। চেয়েছিলেন ম্যারেজ উইল এণ্ড ইট অল। পরনারী···সরাব সব শেষ করে দেবেন। একটি বিয়ে একটি স্ত্রী বাস। এবার ঘর বসাবার সময়। তার নিজের বিদ্যে বেশি হয়নি···ভাগ্যে ব্যবসা ও অর্থ হয়েছে। সুখ নিজেকে করে নিতে হবে। অনেক ভেবে চিন্তে হঠাৎ সম্বন্ধ এল মহুয়ার সঙ্গে। ডাক্তার—ভালই। অর্ধাঙ্গিনীর অর্ধেক যোগ করে তিনি পরিপূর্ণ হবেন। স্ত্রীর শিক্ষা···নিজের অর্থ। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রে মহুয়ার অভিনয়ের ত্রুটি ছিল না। সে পায়ে পড়ে বলেছে, আমাকে ক্ষমা করুন···আমি একজনকে ভালবাসি। সে আমায় ছেড়ে চলে গেছে। আমি তাকে ছাড়া কাউকে ভালবাসতে পারব না। থমকে গিয়েছিল ডানপিটে চঞ্চল ছেলেটি। ক্ষণকাল। তার পরই অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছে সে।

মহুয়া কোনো ফুলই এক মধুমক্ষিকার ভালবাসার জন্য ফোটে না···তার সঙ্গে অসংখ্য ভোমরার দলও ছুটে এসে তাকে স্বাগত জানায়···আদর করে। সব মিলে মিশে এক সৃষ্টির বীজ তৈরি হয়। তুমি কাউকে ভালবাস···তা বেশ তো···তাকে মনের অন্দর মহলে লুকিয়ে রাখ। আমার বিয়ে হয়েছে আজ রাতে তোমার সাথে। আজ তুমি আমার আমি তোমার। তুমি বালিকাবধুর মতো স্ত্রীর অভিনয় করে যাও···নয়ত তোমার চিৎকারে তোমারই বাবা মা খুশি হবেন···যে তাদের জামাই শুধু সুস্বাস্থ্যেরই নয়···সু পুরুষও বটে। সে তা.দর মেয়েকে ছিন্ন ভিন্ন করে উম্মত্ত করে তুলতে পারে।

স্বপ্নের মধ্যেই মহুয়াকে বিবস্ত্র করে বুকে নিষ্পেষিত করল। নরম তুলাপুতুলের মতো মহুয়া একসময় তার বুকের নিচে চেপ্টে গিয়ে শুধু রতি তৃপ্তির শব্দ করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ চলল সেই কন্দর্পআশীর্বাদের ঝড়। ঝড় জলের পর শ্রান্ত মহুয়া রমণী মোহনকে আষ্ঠে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে বলল—“ইউ আর গ্রেট। আই ওয়াজ জাস্ট জোকিং।” “জোকিং?” ফুলশয্যার রাত্রে বাংলার এক নববধূ যদি বলে সে আরেকজনকে ভালবাসে···সেটা ঠিক জোকিং নয়। তেমন ঠাট্টা-তামাসা আগুনের মতোই ভয়ংকর। এরপর চলল সেই

মাদকতা···রমণী ও মহুয়ার রমণ যুদ্ধ। যেন তোলপাড় করে দেবে তারা প্রথম রাতেই। রমণী শক্ত হতে হতে একসময় যেন পাথর হয়ে গেল। "আঃ লাগছে···প্লিজ বি ইজি···প্লিজ আর না···প্লিজ লাগছে···তুমি হার্ট করছ আমাকে" "হার্ট তুমি করনি? ভাল সব মেয়েই অনেক কিছু অনেক মানুষকে বাসে···সেগুলো এমন রাতে যে প্রকাশ করে তার গতি তো একটাই।" ক্রুর হেসে বললেন রমণী মোহন।

—হোয়াট ডু মিন···ওঃ ইউ আর হার্টিং মি—প্লিজ—আই মিন ইট—লাগছে···উঃ···

—লাগবে। যে স্বামীকে ব্যথা দেবার জন্য···ঠকাবার জন্য···নিজের স্বার্থের তাগিদে বিয়ে করে···তাকে তো ব্যথা পেতেই হবে···বলেছেন রমণী বাবু।

—আমি তামাসা করছিলাম···উঃ উঃ প্লিজ···নো মোর···কর্কশ কঠিন কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মহুয়া।

—এটা তামাসার সময় নয়···ইউ সিলি বিচ্···আরও কঠিন ভারী গলা বেরিয়ে এল। আর একটা হাত বজ্রের মতো চেপে ধরেছে মহুয়ার গলাটা··· আর একটা হাত মহুয়ার দুই নিষ্পেষিত উরুর মধ্যে বাঘের থাবার মতো নখদিয়ে নিষ্পিষ্ট হয়ে আছে।

—আঃ···ইউ আর কিলিং মি···করুণ আর্তনাদে রজনীগন্ধার স্তবক কেঁপে উঠল। "উঃ···ছো···সোনালী নিরাভরণ ভরপুর যৌবন স্রোতস্বিনী রমণী মোহনের দামোদর বাঁধের চাপে থমকে গেল। সারাঘর নীরব নিস্তব্ধ।

হঠাৎ আঁৎকে উঠলেন রমণী মোহন। সারাদেহ ঘামে চপ চপ করছে। বাইরের রোদ ঘরে এসে পড়েছে। চারদিক তাকালেন। এমন দুঃস্বপ্ন দেখা অসম্ভব তো কিছুই নয়। এবার ভাবনাগুলোকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বালিশে মুখটা ঢেকে আবার চোখ বুজলেন রমণী মোহন।

যা করা উচিৎ ছিল তা আমরা স্বপ্ন দেখি, তাতেই তৃপ্তি—নাকি তাতে আরও জ্বালা। তবুও একচিন্তা আবার মাথায় ঘোরে—আমি ছাড়ব না। বদলা আমাকে নিতেই হবে। ভাবেন আর ঘুমোন, ঘুমোন আর ভেবে চলেন।

সে ভাবনার ফাঁকে ফাঁকে জীবনের ফেলেআসা দিনগুলোও বার বার ফিরে আসতে থাকে। মনের গতি সরল রেখায় চলে না। ক্রিস্টালের মতো শত শত ফ্যাসেটে আলো পড়ে শত সহস্র রঙের মেলায় চলতে থাকে। তা না যায় কালিকলমে আঁকা—না যায় ছবি তোলা। ছবি—রং তুলি—কাগজ পেন্সিল এ দিয়ে পোট্রেট আঁকা যায় কিন্তু ভাবনা কল্পনা চিন্তাকে বশীভূত করা যায় না। রমণী মোহন এসব আবোল তাবোলই ভেবে চলেছিল ভোর বেলাটায়। আজ নিজেকে বড়ই ছোট···বড়ই একা মনে হলো। তাই যেন আর বিছানা ছেড়ে তার পৃথিবীর আহ্নিক বার্ষিক গতির সাথে তাল মেলাতে ইচ্ছে হলো না। অথচ তার কি কোনো যুক্তি আছে? যে বরং বিজেতার মতো তোমাকে খর্ব করে অপমান করে এ বাড়িতে ছিল···আজ চলে যাওয়ায় তোমার তো আত্মতৃপ্তি হওয়া উচিৎ ছিল। যে বিষধর সর্পের ছোবলে তোমার কল্পনার জীবন ভস্মীভূত হয়েছে—তার পালিয়ে যাওয়াটাকে তুমি নিজের পরাজয় ভাবছ কেন? ভাবছি এজন্য—সে আমার স্ত্রী হিসেবে ছিল। অনেক সময় সন্তানের সঙ্গেও এমন মতবিরোধ হয় যে পিতা মাতার কাছে সে সন্তানও শত্রুর মতো। কিন্তু সেই যদি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে অবজ্ঞা করে ঘর ছেড়ে বিদেশে চলে যায় তখন বাবামায়ের অনুতাপের সীমা থাকে না। আশ্চর্য মানুষের মন। সে বিষধর সাপ নিয়ে ঘর করবে···কিন্তু নিজের আত্মসম্মানে আঘাত সইবে না।

শ্যামল মাস তিনেকের মধ্যেই সিনিয়র রেজিস্টারের পোস্ট পেল। তবে জেনারেল সার্জারীতে নয়। অর্থপেডিকস ও ক্যাজুএলটিতে। লণ্ডনে নয় সুদূর স্কটল্যান্ডের নর্থ-এ। মনে মনে শ্যামল হয়ত খুশিই হয়েছে। মহুয়ার ওপর দুর্বলতা ও আকর্ষণ থাকলেও মহুয়াকে তার ভাগ্যের দুষ্টগ্রহই মনে হত। তাই মনের দিক থেকে শ্যামল খুবই আহত। অল্প সময়ের মধ্যে তার বুঝতেও অসুবিধা হলো না মহুয়া তার বাল্যবন্ধু ফাড়িংএর স্ত্রী। যে ফাড়িং সুলেখাকে তার অব্যক্ত প্রীতির বন্ধন থেকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছিল···

ভাগ্যচক্রে তার বিবাহিতা স্ত্রী হলো মহুয়া তাও তার ওপর অভিমান করে। সব একটা জড়োপাকান উলের দলা হয়ে উঠল শ্যামলের কাছে। ভাবলে তার মাথা ঝিমঝিম করে। চিরদিনই যে ঝুট ঝামেলা থেকে দূরে রাখে নিজেকে··· তার জীবনেই বিষের লতা ধেয়ে উঠেছে। অথচ নিজেকে সে জট থেকে ছাড়ান এ জীবনে সম্ভব নয়। মহুয়ার কঠিন দুর্বার ভালবাসার স্রোতে গা না ভাসালে সেও কী কর্ম যে করে বসতে পারে তা কল্পনা করলেও শিহরণ বয়ে যায় শ্যামলের সারা দেহ ভেদ করে। অনেক বুঝিয়ে ফেরত পাঠাবার চেষ্টা করেছে শ্যামল কিন্তু এ ঘরভাঙা সমাজ ভাঙা অবোধ···শুধু হেসেছে। মুখে বলেছে···এ রাহুর প্রেম। মৃত্যু ছাড়া বিচ্ছেদের কোনো উপায় নেই। তাই যদি চাও···একবার মুখ ফুটে বল। তারপর শিশুর মতোই কান্না। এই হাসিকান্নার উথাল পাথাল থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য শ্যামল আত্মসমর্পণ করল একসময়। মহুয়ার ভালবাসায় ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল না। তার ব্যবহারে কোনো অতীতের স্মৃতির রুক্ষতার চিহ্নও ছিল না। এই যেন সে তার স্বামীর ঘর শুরু করেছিল। এতদিন যেন গত শতাব্দীর শ্বশুর শাশুড়ী ননদ দেওরের ঘর করে হঠাৎ নিজের আপন স্বামীর চাকরির জায়গায় নিজের স্বাধীন বাংলোতে একান্তই আপন সংসার পেতেছে। মুক্ত বিহঙ্গের মতো সে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা। প্রায়ই যারা অ্যালবাম ওল্টায় তাদের চোখে পরিচিত লোকগুলো একই রকম থাকে। হয়ত বয়সটা একটু বাড়ে। তাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, বাব্বা বল্টুটা কত বড় হয়ে গেছে বা সোনাকাকা কত বুড়ো হয়ে গেছে। তেমনই যার ছবি মানসচক্ষে সবসময় ভাসে ও যাকে অহরহ নিজের সঙ্গে জড়িয়ে স্বপ্ন দেখে বা কল্পনা করে—তাকে পেলে মনেই হয় না নতুন কেউ। সঙ্কোচ বা লজ্জার দ্বিধা সেখানে থাকে না। তাই মহুয়া শ্যামলদার স্রোতে অক্লেশে মিশে যেতে পেরেছে। যে ভাবে সে একাত্মা হয়ে হারিয়ে গেছে—তাকে ছাড়াবার উপায় নেই শ্যামলের। প্রথম থেকেই আমিই তোমার স্ত্রী—এই দাবি ও ভালবাসার প্রারণ্যে শ্যামল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। শ্যামল ভাগ্যের অসহায় চূর্ণিত শিলার মতোই নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু মন থেকে মানবিকতা বোধ, বিবেকের দংশন

ভাগ্যের পরিহাসের তিরস্কারকে উড়িয়ে দিতে পারেনি। তাই জড়তা ও আড়ষ্টতা তার মধ্যে যথেষ্টই ছিল। আমাকে তাই তার বিষোদ্গার হজম করতে হয়েছে। এক বিকেলে 'চল তোকে আমার হাসপাতালটা দেখিয়ে নিয়ে আসি' বলে মহুয়াকে কোনোরকম রান্নার উজুহাতে বাড়িতে রেখে আমাকে ক্লাইড ব্যাঙ্কের ধারে নিরিবিলি এক পাড়ে এনে বসিয়েছিল। অক্সিজেন সিলিণ্ডারের মতো প্রেসারাইজড ভাবে জমা ছিল তার মর্মবেদনা। আর চেপে রাখতে পারেনি। এলোমেলো ভাবে আগে পিছে করে তার দেশের জীবন-চরিত বলেছিল। শুনে আমি থ' হয়ে জমাট হয়ে গিয়েছিলাম। শেষ সময় প্রশ্ন করল, তোর ক্ষেত্রে এমনটি হলে তুই কি করতি? আমার বাল্যবন্ধুকে ঠকিয়েছে—পরে আমার সঙ্গেই সে চলে এল। এবার আমার কী উপায় বল।

আমি শুধু বলেছিলাম, এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া অসম্ভব। দেশে হলে মহুয়াকে ফেলে আমি পালাতাম। তবে দুজনে যখন এদেশে আর মহুয়া যখন প্রেগনেন্ট—তখন তাকে অ্যাকসেপ্ট করা ছাড়া উপায় নেই।

—এমনটি হতে পারে কল্পনা করলেও আমি দেশেই ফিরতাম না—সেই দেশে ফিরে ভাল এস আর জবটা গেল এখন অরথোপেডিকস করে পচে মরছি তার ওপর জীবনেরএই দুর্ঘটনা। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল শ্যামল।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, তোর তো হাহুতাশ করার কিছু নেই। মহুয়া ডাক্তার ও সুন্দরী এবং তোকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। কতলোক বিধবাও তো বিয়ে করে।

—তা করতে পারলে তো বর্তে যেতাম। তোকে বললাম না, ছেলেবেলায় যে মেয়েটিকে মন চাইত অথচ বলতে পারিনি বলে ফড়িং তার দিকে ফেরাল তাকে—সেই সুলেখা গত পাঁচবছর বিধবা হয়েছে, তাকে আমার বিয়ে করতে কোনো আপত্তিই ছিল না। বরং তাকে হয়ত অ্যাপ্রোচও করতাম। ঠিক সেই মুহূর্তে ঝড়ের মতো আমায় উড়িয়ে নিয়ে গেল মহুয়া। চিন্তা করারও সুযোগ পাইনি। এমনকি আমি যদি ঘুনাক্ষরেও জানতাম ও ফড়িংকে বিয়ে করেছে—তাহলে প্রথম রাতেই আমি পালিয়ে আসতাম কেননা মহুয়ার দুর্বার প্রীতির কাছে আমি কলকাতায় থাকলে টিকতে পারতাম না। আমার ব্যাপারে

ওর লাজ লজ্জা দ্বিধা ভয় কিছু নেই। সি ইজ ম্যাড্ ইন ওয়ান সেন্স—সি ইজ ম্যাড্। নয়ত এত বছর স্বামীর ঘর করেছে তার ঘরণী হয়নি—এ সম্ভব? কিন্তু আমার মনে হয় সত্য! নয়ত ওর জড়তা ও অনুশোচনা থাকত। কিন্তু আমাকে পেয়ে ও যেন হাতে স্বর্গ পেল আর নিজেকে ঢেলে দিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। নয়ত ওইভাবে যতই ভাক্তার হোক সব ছিন্ন করে এখানে আমার আগেই এসে অপেক্ষা করত না। এবং আই অ্যাম সিরিয়াস, ওকে চলে যেতে বললে টুডে অর টুমরো ও সুইসাইড করবেই। অথচ সর্বব্যাপারে ফ্রাকশন অফ এ সেকেন্ডে সি ইজ অ্যাবসলুটলি নরম্যাল। প্রথমে আমার মনে হয়েছে সি ইজ নট রাইট—নিশ্চয়ই এটা মানসিক ব্যাধি। কিন্তু তুই দেখবি এখন ও কাম কোয়ায়েট অ্যান্ড হ্যাপী—থামল শ্যামল।

ফাড়ং-এর কিছু কিছু খবরও সংগ্রহ করেছিল শ্যামল ফেরার প্রাক্কালে। আমার মানসচক্ষু তখন সেই রমণীবাবু ও সুলেখার জীবন প্রবাহের কল্পনা করে চলেছিল। শ্যামল এও ব্যক্ত করল যে রিসেন্টলি রমণীমোহনের দেখা সাক্ষাতও হয়েছে সুলেখার সঙ্গে। রমণীবাবুর ব্যবসা পত্তর ভাল তবে উড়ো খবরে তার স্বাভাবিক দুটি বস্তুতে আসক্তি আছে; অতএব পার্থিব সুখের তার অভাব নেই। কিন্তু বউ পালানোটাকে বা একটা মেয়েছেলে তার ঘর ছেড়ে চলে গেছে সেটাকে কী দৃষ্টিতে দেখবে তাতো বলা শক্ত। খুব ভাল কথায় বলতে গেলে মন্দির থেকে প্রতিমা চুরি হলে তাতে নাস্তিকেরও মাথায় বাজ ভেঙ্গে পড়ে আবার খারাপ কথায় বলতে গেলে আকবরের তিনশত সুন্দরী যুবতী রক্ষিতা উধাও হলে সারা ভারতবর্ষে রক্তগঙ্গা বয়ে যেত—হয়ত নিতান্তই গোনার ভুল—রমণী মোহনের রমণ পার্টনার না হলেও তার সামাজিক স্ত্রীর এভাবে চলে যাওয়াটাকে সে স্বীকার নাও করতে পারে এবং সেও তো খবরাখবর নিয়ে সুগ্রীব, বিভীষণ হনুমান ইত্যাদিদের নিয়ে এই দূরের লঙ্কা দ্বীপে আসতে পারে তার মনের মন্দিরের সীতাকে উদ্ধার করতে। সে অসম্ভব সম্ভাবনাকেও এই জেট যুগে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাই ছোট করে সে সম্ভাবনার কথা আমি বললাম। আঁৎকে উঠেছিল শ্যামল। তার মুখটা দপ করে জ্বলে উঠেছিল। বলল, 'ইমপসিবল, ও বিলেতে আসতে

সাহস করবে না। এখানে তো আর সেপারেশন ও উইলিংলি অন্যের সাথে থাকাটা ইল্লিগ্যাল নয়। বরং এটা তো প্রাউড অ্যান্ড প্লেজার। যতই মনকে সান্ত্বনা দিক শ্যামল যে ভয় পেয়েছে ও সে ভয়ের চিহ্নগুলো আমি দেখছি তাতে সে আরও লজ্জিত হলো। এ অসম্ভব কল্পনা তার মাথায় আসেনি। তাই বিড় বিড় করে বলল, এলে এই তিনমাসের মধ্যেই আসত—এখন আর আসবে না মনে হয়।

আমি বললাম, না না আসবে নিশ্চয়ই নয় তবে ওয়ারস্ট এর জন্যও মনটাকে রেডি করে রাখা উচিৎ।

—হ্যাঁ পয়েন্টটা ভাল বলেছিস—প্রথমেই এটা ভাবা উচিৎ ছিল—গম্ভীর গলায় শ্যামল বলল। সে তখনও বেশ ভীত সন্ত্রস্ত ও ভাবনায় তন্ময়।

—তুই এসব ভাবিস না। এনজয় ইয়োরসেলফ্। পৃথিবীর সব বিয়েই টোপর মাথায় দিয়ে সাত পাক ঘুরিয়ে হয় না। হলেও অনেক ভেঙে চুরে যায়। এমন ওয়াইফ পাওয়া গর্বের ও ভাগ্যের। বি হ্যাপি উইথ হোয়াট ইউ গট। তুই তো আর সমাজ নেতা বা মরালিস্ট নয়। একজন ভালবেসে যখন তোর সন্তান ধারণ করেছে – তখন অন্য সব চিন্তা তুই ভুলে যা। বৌ বাচ্চা নিয়ে নতুনভাবে জীবনটাকে সাজাবার চেষ্টা কর। প্রতিক্ষণেই পৃথিবী সর্বতোভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। আমরা তো নিমিত্ত মাত্র। সে পরিবর্তনকে মেনে নিতেই হবে। আর পরিবর্তনগুলো কিছু কিছু মানুষের ওপরই প্রকট হয়ে দেখা দেয়। হতে হতে তখন চোখ সওয়া হয়ে যায়। এ নিয়ে তোর এতটা চিন্তাভাবনার কোনো মানে হয় না—আমি সহজ করার চেষ্টা করলাম ব্যাপারটাকে।

—দ্যাটস রাইট—আই এগ্রি—এ পয়েন্টটাও অ্যাকসেপ্টিবল। গ্রহণ-যোগ্য। ক্লাইডের আবছা আলোতে দূর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শ্যামল। দূরে হেলেসবরার আকাশে পশ্চিমসূর্যের রক্তসোনা ঝলসাচ্ছে। বাতাসটা বড় ঠান্ডা। কিন্তু দিনটা বেশ। পেছন দিকে আরস্কিন ব্রিজটা কালো মনস্টারের মতো দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটা ভারী সুন্দর। আর একটু এগোলেই লক্ লমণ্ড ও তার পরই লক্ লেস। উত্তর স্কটল্যান্ডটা লেক আর পাহাড় শুধু।

প্রতি ইঞ্চিই ছবি তুলে বাঁধিয়ে রাখার মতো। শীতে যেমন রুক্ষ—বরফে ঢাকা—বসন্তে কাঁচ সবুজ রঙের আভাস আর গ্রীষ্মে ঘন সবুজ। প্রতিটি পদক্ষেপে ধরিত্রীর অপূর্ব সৌন্দর্য উপচে পড়ে। আর তেমনি ন্যাচারাল সৌন্দর্য বহাল রেখেছে এখানকার মানুষরা। যেটা বড়ই শক্ত।

মহুয়ার চলে যাওয়াটাকে সহজ ভাবে তো নিতে পারেনইনি রমণী মোহন পাল বরং তার সম্মান পুরুষত্ব আত্মগর্ব ও প্রতিপত্তিতে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল। এই প্রথম যেন তার মনে হয়েছিল বিরোধী দুনিয়া তার বুকে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড ছুঁড়ে দিয়েছে। মাথা নিচু করেও ফিল্মস্টারদের তিনি জুতো পরিষ্কার করেছেন—ফাইফরমাস খেটেছেন। সামান্য নোকরের কাজ করেছেন। কল্পনা তখন সুদূরপ্রসারী ছিল। এই ছোট খাট সুখদুঃখের চার দেয়ালে আবদ্ধ ছিল না। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ফিল্মস্টারের রাতারাতি মিলিয়নেয়ার হবার স্বপ্ন ধূলিসাত হলেও অন্যদিকে উন্নতি হচ্ছিল। তাই পরাজয়টা গায়ে লাগেনি। ব্যবসার পাশাপাশি জীবনের অর্থাৎ দেহে মনের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের রসদের অভাব হয়নি বরং পর্যাপ্ত ভাবেই পেয়েছেন। হুইস্কি ও নারী সান্নিধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে একসময় সম্বিত ফিরে পেয়েছেন। গা ঝাড়া দিয়ে ভদ্র অফিস করে নিজে ম্যানেজার হয়ে ডিগিটি বাড়িয়েছেন। এবার মধ্যবয়সে মধ্যগতি। অতএব কোয়াটেন ডাউন—অ্যাণ্ড সেটেল ডাউন—সংসার ধর্ম করার সময়। সেখানেই গর্বের আগুনে ঝাঁপ—কিন্তু যার হৃদপিণ্ড ঝামার মতো সে অভিমান অনুরাগের আগুনে তো দাহ্য নয়। তাই সংসার জ্ঞানহীন অথচ মানবিকতার সিম্বল হতে গিয়ে স্ত্রীকে তার ছোঁয়া হয়নি। অনুতাপ হয়েছে কিন্তু অনুকম্পাও ছিল। তাই কষ্ট হয়নি। যতক্ষণ পকেটে নস্যির ডিবে আছে—ততক্ষণ না টানলেও চলে—তা যদি অন্য কৌটো থেকে পাওয়া যায় তবে তো কথাই নেই। কিন্তু পকেটের সোনার কৌটো হারিয়েছে—তা ভাবলে মাথা ঠাণ্ডা রাখা অসম্ভব। আর এতো শুধু একটা কৌটো নয়—নিজের স্ত্রী। সমাজ বন্ধু-বান্ধব ছাড়াও নিজের আত্মচেতনা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে অপমানে জর্জরিত হলো রমণী মোহন। প্রতিক্ষণেই তার এক চিন্তা—এক ব্যথা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

ধৈর্য অনেকক্ষেত্রে না থাকলেও কতগুলো ক্ষেত্রে রমণীমোহনের জবাব নেই। নয়ত এত বছর সে নিজের সোনার ডলপুতুলটাকেই বা জোর করে নিষ্পেষিত করে প্রেগনেন্ট করেনি কেন? আজ মহুয়া তার সন্তানের মা হলে কি সে পালাতে পার তো? হয়ত পারতো—কিন্তু চান্স খুবই কম ছিল। নারী স্বামীর কাছে ব্যাভিচারিণী বা রূপোজীবা হলেও সন্তানের কাছে সে পরিচয় দিতে বাধে।

রমণী মোহন বেশ কিছুদিন ধরে নিজের মনেই ভেবে যাচ্ছে কি ভাবে সুকৌশলে এই অপমানের বদলা নেয়া যায়। কিছুতেই তিনি ভাবতে পারছেন না এ কী করে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তার মনে দৃঢ় ধারণা যেহেতু তিনি কোনো অন্যায় করেননি তখন মহুয়াকে এই অকারণে আঘাতের শাস্তি ভগবান দেবেনই এবং হয়ত তার হাত দিয়েই দেবেন। চিড়িয়া অনেক দূরে—নাগালের বাইরে। নয়ত ঈগলের মতো কঠিন বাঁকা চঞ্চু দিয়ে ওই চিলকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে সারা দেশে তার পংকিল পালক ছড়িয়ে দিতেন। আরও কত ভাবেন আর নিজের মনে মনে গর্জন করেন—ফোঁস ফোঁস করেন। কোনো কিছুতেই এখন যেন তার রুচি নেই। সব সময়ই একটা বিবাগী বেদুইনের মতো উস্‌খুস আপনভোলা চিন্তিত ভাব। যুক্তিহীন হয়তো। কিন্তু যুক্তি তো কিছু মানুষের পথের নিদর্শন মাত্র। মন অনেক সময়ই তা' প্রয়োজন মতো চলে, যুক্তির ধারও ধারে না। কেননা যুক্তি তর্ক ও অনেক সময়ই এক সরল রেখায় চলে। মনের গতি ইনফাইনিট।

শিকারীর মতো স্থির দৃষ্টিতে রমণীমোহন তার শিকারের দিকে ওঁত পেতে চেয়ে রইল। এবার জাল বেছাবার পালা।

উত্তর মেরুর খুব দূরে নয় স্কটল্যাণ্ড। তাই শীতের অর্ধবছর আঁধারেই ঢেকে থাকে। যখন তখন দিবাকর সাহেব একটু উঁকি ঝুঁকি দিয়েই কর্তব্য সম্পাদন করেন ও তিনিই যে রক্ষণকর্তা সেটুকু জানিয়ে দেন বৃদ্ধ পিতামহের মতো। কিন্তু তার দৃষ্টিতে না থাকে তেজ নাশ্থাকে আলো। সেই সুযোগে চাঁদমামা ও নক্ষত্ররা তাদের সাময়িক শক্তি প্রচার করে যায়। জমাট বরফের ওপর দূরে দিগন্তের একটি বিন্দু তারকাও আলোয় আলোময় করে তোলে এক

সময়ের এই উত্তর মেরু। বর্তমানে ওই নামগুলোই বহাল আছে—কিন্তু পৃথিবীর এই অংশেও ইণ্ডিয়ান সাবকণ্টিনেণ্টের বাদামী মানুষের সংখ্যা কম নেই। তারা এখানকারই নতুন অধিবাসী এবং মাল্টি রেসিয়াল ও মাল্টি কালচারাল ব্রিটেনের অংশীভূত। ব্রিটেন এখন আর হোয়াইট কাণ্ট্রি নয়—সতরঞ্জির মতো বিভিন্ন সুতোর বুনোট। দিনহীন রাত্রিময় শীতকালটা কর্কশ কঠিন বাতাসের ঝড় বরফ, ফ্রস্ট নিয়েই কাটল। কুয়াশার ঘন আবরণে নিজেকে হাসপাতাল টু বাড়ি ও বাড়ি টু হাসপাতাল, একটু শপিং ও কখনও সখনও জানা কারও বাড়ি যাওয়া আসার মধ্যেই কেটে গেল। শীতের দেশে তাই যায়। একরাতের মতো একটা শীতকাল কাটিয়ে দেয়া—তাও বিজ্ঞানের উন্নতিতে এখন বাড়ি বাড়ি সেণ্ট্রাল হিটিং। প্রায় সবারই গাড়ি—দোকান পাট গরম। তাই শীতটায় এখন আর সে কষ্টের দিন নেই। পাব, ডান্স ক্লাব, হোটেল ইত্যাদি শীতেই বরং ভাল চলে। গরম পড়লেই তো সব সাগর পাড়ে নয়ত লেকের পাড়ে। সে এক অন্য জীবন। বিলেতে ঋতু তো দুটোই—আর ঋতুর সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাই জীবনধারাও বিপরীত দুই ঋতুতে। দেশ থেকে বিদেশকে যতটা ভিন্ন মনে হয়—তাতো আর মনে হয় না প্রবাসীদের। অল্পসময় পরে তারাও নতুন সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংগ হয়ে ওঠে। মেয়ে দেখে পছন্দ করার দিনটা আর বিয়ের দুএক বছর পরে সেই পছন্দ করা বর্তমান স্ত্রীর মধ্যে তো আকাশ পাতাল তফাৎ। তখন মনে হয় কেন অমন চুলচেড়া বিচার করে নিজের স্ত্রীকে ছোট করেছি বা পণ নিয়ে (যৌতাতের খরচ) নিজেকে অপমানে জর্জরিত করেছি। সে টাকাটা নিয়ে এখন মাথা কাটা যাচ্ছে। সে তো সম্পূর্ণ আলাদা কথা।

খুবই সুখবর। শ্যামল-মহুয়ার ছেলে হয়েছে। মিষ্টি খাবার নিমন্ত্রণ। তবে এই তিলবঙ্গে মিষ্টি খাওয়া মানেই স্কচ্ ওয়াটার দিয়ে শুরু আর রসগোল্লার শেষ। পার্টি মানেই তো চর্ব চোষ্য···পেয় ইত্যাদি। প্রথমেই এলেন মিস্টার অশোক সমাজপতি। তিনি স্কুলের টিচার। সরকারী স্কুলই প্রায় সব বিলেতে এবং সবই কো-এডুকেশন। অবাধ মেলামেশা। তাই মাস্টার মশাই তার ভারতপ্রেমী স্ত্রীকে বছরের অর্ধেক সময় দেশেই রাখেন। একদম

টাকার নোট ভাঙ্গাবার ইচ্ছে তার নেই তাই দেশের স্টেট ব্যাঙ্কে সেটি ডাম্প করে স্কটিশ ললনা ভাঙ্গিয়েই খরচ করেন। ষোলবছর সতেরো বছরের নিত্য নতুন না হলেও মাসে মাসে নতুন তো পাওয়াই যায়। মাস্টার বলে কথা! তবে এটা বিলেত, এখানে মাস্টার মশাইর ভোগে না লাগলে অকালপক্ক নাবালকরা ওই নিয়েই ছিনিমিনি খেলবে। রমণী যোড়শীরা তাই ও ব্যাপারে ভারতীয় ব্রাউন টিচার 'অ্যাশোক' কে কম পছন্দ করে না। অশোকবাবুও তার ইংগীত জানাতে পারলে খুশিই হন। অবশ্য তিনি সিলেকটিভ মুগোলের বাচ্চা ছাড়া ছোন না—সারাটা স্কুলে একজনই ভারতীয় মাস্টার। অতএব সে একটু চুজি হবে বই কি। সবই ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই। সম্প্রতি আড়াইশ পাউন্ড খরচ করে তিনি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করেছেন। তাই বয়স তো বিশ বছর কাট করে কমে গেছে। স্ত্রীকে কম করে সপ্তাহে তিনটে চিঠি লেখেন। সবগুলোই ভারতের প্রশংসা স্বামীজীর থেকেও অধিক পরিমাণে সরবরাহ করেন। স্ত্রীকে তিনটি সন্তান দিতেও কুণ্ঠা করেননি আর টাকাপয়সা যা পাঠান তাতে ভারতের স্ট্যান্ডার্ডে গভর্নর সাহেবের মাইনে। অতএব স্ত্রীপুত্র পরিবার ও মাস্টার মশাই নিজে—পুরো ফ্যামিলী অত্যন্ত সুখী। বিলেতের টাকা আর দেশের প্রেম ললিতাদেবীও এর বেশি কিছু চাননি। সে ললিতা দেবীর কথা বরং থাক।

পরের গেস্ট মিস্টার গণেশ চন্দ্র ঘোষ ও তার স্ত্রী জুলি। চোস্ত মানিয়েছে। নাম গণেশ হলেও ফিগারটি মডার্ন স্মার্ট কার্তিকের। জুলি চিকণ তল্লাবাঁশের মতো স্লিম কিন্তু যৌবনের ঢেউগুলো বাস্ট রাইট ফর অ্যাপ্লীকেশন। এক লহমায় হৃদপিণ্ডের পোলারয়েড ক্যামেরায় ছাপ পড়ে যায় ও বেশ কিছুক্ষণ সে ছবিটা থির হয়ে থাকে। গণেশ বার অ্যাট ল করতে এসে পথ হারিয়ে রেস্টুরেন্টের ব্যবসা করছে। স্বয়ং গণেশ হয়ে এখন ভাল বাড়ি ও মার্সেডিস গাড়ি। যদিও সে স্বীকার করে না তবে তার নাকি পশ্চিমবঙ্গের এক গ্রামে একটি স্ত্রী ছিল। এখন তার কী যে গতি হয়েছে তা সে নিজেও হয়ত জানে না। জুলিকে বিয়ে না করলে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। সেই ভাবেই আলাপ। বার অ্যাট ল তে বছর চারেক নষ্ট করে বুঝল এ তার দ্বারা হবে না। হোম

আফিস বর্শা দিয়ে ঘন ঘন খোচাচ্ছে 'গো হোম'। ভীষণ ডিস্টারবড্ মাইণ্ড নিয়ে কথাগুলো একদিন-ডান্স ক্লাবের গার্ল ফ্রেণ্ড জুলিকে বলেছিল কাঁদো কাঁদো হয়ে। জুলি নিজেই তখন পথ বাতলে চলেছে, আমার সঙ্গে এনগেজড্ হলে হয়ত ওরা তোমাকে তাড়াবে না, থাকতে দেবে। স্বর্গ পেয়েছিল গণেশ। রেস্টুরেণ্টে ছুটিছাটায় কাজ করে ও কানাডার দাদার পাঠান পয়সা যোগার করে রেস্টুরেণ্ট খুলল সে গ্লাসগোর কাছেই। জুলির অক্লান্ত পরিশ্রম ও গণেশের ভাগ্যে ফুলে ফেঁপে ঢোল হতে সময় লাগেনি তাদের। থাকার পারমিশনই শুধু নয়—এখন সে ব্রিটিশ সিটিজেন। ভেতরে অব্যক্ত চাপা একটা তুষের আগুনে ভরা তাওয়া যে জ্বলছে না তা নয়—সে তো বেশির ভাগ বিদেশ-বাসীরই জ্বলে তবে অর্থের শ্রীবৃদ্ধিতে হি ইজ হ্যাপি। এই গত মাসেই নিজের গ্রামে বাবা মাকে দশ হাজার টাকা পাঠিয়েছে। ওর বেশি সে ব্যক্ত করে না—কেউ আর ওর বেশি জানতেও চায় না। বিদেশে আপনজন পাওয়া দুর্লভ তাই খারাপ হোক ভাল হোক—ভাল লাগুক চাই নাই লাগুক—ওই তোমার জগৎ, ওই নিয়েই তোমাকে বাঁচতে হবে—ইউ হ্যাভ নো চয়েস। অতএব বিষোদ্গার করা যেখানে সম্ভব নয় সেখানে সবাই নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর উপায় কি!

পরের গেস্ট সদাহাস্যময় মিস্টার অনাথ জানা। ভদ্রলোক প্রৌঢ়। বছর আটান্ন বয়স। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো মাথায় তিনদিকে জল। ওপর সামনে তাই টেনে এনে শীতে মাথাটা বাঁচিয়েছেন। একাই এসেছেন কেননা ছোট বাচ্চাটি বড্ডই ছোট। ভদ্রলোকের আপশোসের সীমা নেই। সেই কবে জাহাজ থেকে নেমে লেবারার হয়ে আই সি আইতে ঢুকেছেন। মার্গারেটকে পাগলের মতো তছনচ করে ছয়টি সাদাকালো সন্তান বাগিয়েছেন—সব ব্রিটিশ। হঠাৎ খেয়াল হলো তার ভারতীয় হবার। মার্গরেটের তখন ইউটেরাস অর্থাৎ সন্তানধারণের থলিটি বাদ হয়ে গেছে অর্থাৎ হিস্টেরেকটমী হয়েছে। জানা সাহেব পঞ্চাশ বছরেই ছুটলেন ধানপাট ও রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের দেশে। পাত্রের অভাব নেই। বিলেতে থাকা পাত্র অতএব পাত্রীর অভাব কি। জানা সাহেব তিনবছরে তিনটি কন্যা তুলে দিলেন পিতৃদায়গ্রস্থ বর্ণশ্রীর কোলে। ছোট

কন্যাটি বড়ই ছোট। তাই বনশ্রী দেবী তিনকন্যা সমভিব্যাহারে আসতে পারেন নি। মিস্টার সদাহাস্যময় জানা অকপট স্বীকার করলেন ও বেচারা বেড়োতেই পারে না। স্কটল্যাণ্ডে এত ঠাণ্ডা তার ওপর তিনকন্যার বয়স এক দুই তিন। আর বর্ণশ্রী! বিলেতবাসী ইঞ্জিনীয়ার জানাসাহেবের স্ত্রী—যা ভাগ্যে ছিল তা হয়েছে—দেবদাসের পারুর চেয়ে তো ভাল। তাছাড়া সে কি করে জানবে যে জানাসাহেবের আগের পক্ষের ছটি ছেলেমেয়ে আছে আর জানা সাহেব এখনও প্রতি রাত্রে সাদাকালো দুইই নিয়ে খেলা করবে। বেচারা সদাহাস্যময় সবার প্রিয় জানাসাহেব জন্মেছিলেন হয়ত একটু পরবর্তী যুগে নয়ত তার ঠাকুর্দাদার দুটো নয়—সাতটি সহধর্মিণী ছিল। হয়ত তার মধ্যে কেউ কেউ সহধর্মিণী হলেও সহরীতিনী ছিলেন না। কে জানে? জানা সাহেবের বড়ই দুঃখ তার তিনটেই মেয়ে। অথচ আগের পক্ষের ছটার মধ্যে চারটেই ছেলে। তার দুটো জেলে আর দুটো তার বাড়িতে খায় আর স্কিনহেড হয়ে ঘুরে বেড়ায়। দুটো মেয়েই পালিয়েছে। অবশ্য পালিয়েছে বলা যায় না—একটার খোঁজ নেই আর একটাকে জানা সাহেবই বিয়ে দিয়েছে রবার্ট মুরের সাথে। পরে সেই জোয়ানও রবার্টকে ছেড়ে এক সর্দারজীর সাথে থাকে। কমন ল ওয়াইফ অর্থাৎ বিয়ে না করলেও স্বামীস্ত্রীর মতোই। কোর্ট অনেক সময় তাদের সেভাবেই মেনে নেয়। সে সব গোল্লায় গেছে যাবে বা যাবার পথে। তাই জানা সাহেবের হানড্রেড পারসেন্ট একটি ভারতীয় পুত্রের বড়ই চিকির্ষা ছিল। অনেক ডাক্তারের সাথে পরামর্শও করেছেন অন্ততঃ একটা মেয়েকেও যদি ছেলে বানানো যায়। কিন্তু ডাক্তাররা সম্মত হননি। যত সহজে ছেলেকে মেয়ে করা যায় তত সহজে তো আর মেয়েকে ছেলে করা যায় না। মেয়ে নিউটার—পুরুষের বৈশিষ্ট্য যে অনেক। পুরুষ নারীর ওপরও অনেক কিছু।

শেষ পর্যন্ত অ্যাঞ্জাইনা ও একটা মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হলো মিস্টার সদা—হাস্যময় অতিভাল মানুষ সবার অতিপ্রিয় জানার। সেই দুশ্চিন্তায় বিভ্রান্ত হয়ে তিনি ঠিক করলেন ভারতীয় পরিবার ও একটা ইঙ্গবঙ্গ ছেলে নিয়ে তিনি ভারতেই ফিরে যাবেন। আপাততঃ তাই ইচ্ছেও সেরকমই, সব তোড়জোড় চলছে। অতি গর্বের সাথে মিস্টার জানা তাই বলেন সবাইকে। সবাই

ডাউটফুল— সত্যি কি মিস্টার জানা কোনোদিন ফিরতে পারবেন তার দেশে ? তিনটে মেয়ে ও মিথ্যে বলে একটা যুবতী বিয়ে করে এনে এ বয়সে সে ফিরতে পারবে—তা কেউই বিশ্বাস করেন না—মিস্টার জানা ছাড়া। বিলেতটা 'মাছধরার চাঁই' তার একটাই রাস্তা—এস আটকে যাও—ফেরা অসম্ভব।

একসঙ্গেই দুটি দম্পতি ঢুকলেন এবার। দুটি পুরুষোচিত পুরুষ ও দুটি ভানাকাটা পরি। সবে যেন নন্দনকানন থেকে নামলেন। হাসির ফোয়ারা চলকে পড়ছে। সেই সঙ্গে মনমাতানো প্যারিসের পারফিউম।

একটি দম্পতি দু'জনেই ডাক্তার। স্বামী আসামের ও স্ত্রী সিংহলচ্যুত। খেদিত। অতএব তাদের পক্ষে বিলেতও যা পশ্চিমবাংলাও তাই। কতবার আর রেফ্যুজী হতে মানুষের ইচ্ছে করে ? পূবের বাংলা থেকে কত লোক সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিল কিন্তু ঘাঁটি ছিল পদ্মামেঘনার পাড়ে। হঠাৎ রাজনীতির ক্রূর দানবীর পৈশাচিক প্রলয় বানে অসংখ্য মানুষের সেই স্বপ্নময় শ্রদ্ধের দেশ আর নিজের রইল না। তাদের কাছে বিলেত আমেরিকাও যা পশ্চিম ভাগও তাই। অপর্ণা ও অমূল্য দাস সুখেই ঘর বেঁধেছে স্কটল্যাণ্ডে। দুজনেই জেনারেল্ প্রাকটিশনার। দুটি বাচ্চা নিয়ে মাঝে মাঝেই কলকাতা যায় দাদাদিদির বাড়িতে। তবে ফেরার কোনো প্রশ্নই নেই।

অন্য দম্পতি কলমলে যুবক যুবতী। ছেলেটি সেই চার বছর বয়সে এসেছে বাবার সঙ্গে বিলেত। বাবা অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট। নিজের ক্লাসের মেয়ে নুরজাহানকে ভালবেসে বিয়ে করেছে বিবেকানন্দ চৌধুরী। বাপ মা আর তার মুখদর্শনও করে না। বিলেতে হলেও বিবেক পশ্চিমপাকিস্থানী বাপ মায়ের ব্রিটিশ তনয়াকে শাদি করবে তা কল্পনাও করেননি বিবেকের বাবা। নুর জাহান—সত্যিই মশাল একটি। ঘরটা আলোকিত হয়ে গেল তার আতসী দেহের আলোর বিচ্ছুরণে। নাক চোখ মুখ যেন কুমোরটুলিতে গড়া প্রতিমা। বিবেক বলে—মুসলমান ধর্মে মেয়েদের মনও নেই ধর্মও নেই-তারা নাকি ধরিত্রীর মতোই ধর্মহীন। শুধু সৃষ্টির আধার। অতএব নুর জাহানের সঙ্গে বিয়ে হলেও তার বর্ণ ধর্ম সব একই আছে। নুর জাহানের নাম পাল্টে হয়েছে রানী। সবাই রানী বলতে শিখে গেছে এতদিনে। পৃথিবীর

নতুন সমাজ—নতুন সভ্যতা এইভাবেই তো মিশ্রণে সৃষ্টি হয়। কে জানে তার দশপুরুষের মধ্যে কত মিক্সার হয়েছে। তার মূল্যই বা কী। নতুন মাটিতে নতুন বনস্পতি হয়—আবার একসময় সেখানে আগাছা ছাড়া কিছু হয় না—মরুর কোনো অংশ উর্বর হয়ে ওঠে। এবারে এলেন তরুণ যুগল ফ্রাঙ্ক ম্যাগোয়ার ও তার সদ্যবিবাহিতা নার্স সরস্বতী দেশাই। বিয়ে হলেও সারনেমটা তারা পাল্টায়নি। ফ্রাঙ্ক হাসপাতালের ইঞ্জিনীয়ার অর্থাৎ হিটিং লাইটিং ইত্যাদির তত্ত্বাবধায়ক। এই বিলেত দেশে মিস্ত্রিকেই বলে ইঞ্জিনীয়ার। আর পাশকরা হলে বলে প্রফেশন্যাল ইঞ্জিনীয়ার। হাসপাতালে কাজ করতে করতে প্রেম—ইনগেজমেণ্ট ফর থি ইয়ার্স—স্টং অ্যান্ড স্টেডি। অতএব ম্যারেজ। একজন খোদ হাইল্যাণ্ডের স্কটিশ আর একজনের বাবা মা ভেজিটারিয়ান গুজরাটী। সো হোয়াট। তারা খুব স্বতঃস্ফূর্ত কাপ্‌ল। তারা খুশি ও সুখী অতএব ব্রহ্মাণ্ড খুশি। তাছাড়া তাদের বাবা মা ও খুব খুশি। ফ্রাঙ্কের বাবা রবার্ট সাহেব ভারতে বহুবছর কাটিয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে। ফ্রাঙ্কের জন্মও হয়েছিল নাগপুরে। তাই জন্মহিসেবে ফ্রাঙ্ক ভারতীয় ও সরস্বতী ব্রিটিশ। হোয়াট এ কো ইন্সিডেন্স। অতএব এক্ষেত্রে, ফ্রাঙ্ক অন্তত তাই বলেই আনন্দ পায়, যে ভারতীয় বর স্কটিশ কনেকে বিয়ে করেছে। শুধু রং টাই উল্টো। তবে সরস্বতীর রংটা সরস্বতী দেবীর মূর্তোই ঝকঝকে মেটালিক আইভরি হোয়াইট।

উত্তর মেরুর কাছে স্কটদেশে হলেও গেস্টরা কেমন মিকস্‌ড্‌ তাই-ই ভাবছিল স্কটিশ কলেজে পড়া শ্যামল কান্তি সেন। পশ্চিমবঙ্গের এক গ্রামের ছেলে ভাবতেই পারবে না এই সুদূরের মানুষরা কত পাল্টেছে। সে হয়ত বইয়ে পড়েছে স্কটিশ ড্রেস এরকম, তারা ব্যাণ্ড পাইপ বাজায়, পুরুষেরা কিল্ট পরে যেটা হাঁটু পর্যন্ত লুঙি, তারা টার্টান তৈরি করে, হ্যারিস টুইড নামকরা উলের কাপড় ইত্যাদি। কিন্তু ভারতীয় কথক নৃত্য বিশারদিনী অভিসারিকা পালের কিন্তু এই স্কট দেশেই জন্ম ঘর বাড়ি সব কিছু।

একে একে আরও কয়েকটি দম্পতি ও ছাড়াছাড়া পুরুষ রমণী এলো। সবার ডিটেইলস খবর এখনও শ্যামল সেনের নেয়া সম্ভব হয় নি।

ড্রিংকস—ক্রিচপ—নাটস—মহুয়া অফার করল সবাইকে। মহুয়ার আনন্দ ও উচ্ছলতা উপচে পড়ছে। সে নিজেও বেনারসী ও নিউ হেয়ার স্টাইলে ঝলসাচ্ছে। শ্যামল গম্ভীর হলেও ঈষদ হাসির ছটা ঠোঁটে আটকে রেখেছে। তবে দেখলেই বোঝা যায় সে ক্লান্ত। অথচ সে ক্লান্ত মোটেই নেই—দেহের দিক থেকে। মানসিক একটা টাগ অফ ওয়ার চলছে তার প্রতিটি কোষে কোষে। সর্বক্ষণই মনে হচ্ছে এ সবই মেকি, মিথ্যা। অনাচার, অবিচার যুক্তিহীন ইত্যাদি অনেক কিছু। মনটা সে শক্ত করেও করতে পারেনি। মাঝে মাঝেই সে উদভ্রান্ত, আনমনা উদাসীন হয়ে পড়ে। সহজে সে যেন কিছুই মেনে নিতে পারে না।

চোরাদৃষ্টিতে চেয়ে সে অবাক হয়ে যায় মহুয়া কেমন পুরনো ইতিহাস জলের মতো ভুলে গেছে। এই পুকুরে টলমল—এই কলসীতে কলকল এই শ্যামলের গ্লাসে উচ্ছল। আশ্চর্য মেয়েদের মন—ভাবে শ্যামল। এত সহজে ভাল হোক মন্দ হোক যাই হোক—কী করে গত এত বছরের সব স্মৃতিকে মুছে দিয়ে ফাউণ্টেনের জলোচ্ছ্বাসের মতো সে শতবর্ণে রঞ্জিত হয়ে নৃত্য করছে? কিন্তু কই সে তো পারছে না। সে যে পুরুষ—সে পর্বতের মতো স্তব্ধ দর্শক। তার বুকে নৃত্য করে ঝরনা, সে ধারক বাহক হলেও অপরিবর্তনীয়। তাই কি? থাক ওসব চিন্তা—ভাবেন শ্যামল সেন। হাসিটি নকল গোঁফের মতো টাঙিয়ে রেখে অতিথি আপ্যায়ন করে যান। ছেলের দ্বিপাক্ষিক ষষ্ঠী। ছদিনের মাথায় তো মহুয়াই হাসপাতাল থেকে ফেরেনি। অতএব সময় ও স্থানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন পঞ্জিকাকেও কম্প্যুটারাইজড ভাবে পাল্টাতে হয় বৈকি! প্রফেশনাল রমণীদের সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা সমাজে নারীশিক্ষার সময় থেকে প্রচারিত ও প্রবর্তিত হয়ে আছে। তারা স্ত্রী, মা বা গৃহবধূ হিসেবে সাকসেসফুল হয় না। তাদের বাইরের কাজে যথেষ্ট সময় দিতে হয়, বাইরের বড় চিন্তায় ছোট কাজগুলো এলোমেলো হয়ে যায় হয়ত তার জন্যই এই কল্পনাপ্রসূত বদনাম। মানুষের কর্মক্ষমতা—স্বভাব, চরিত্র, তার সংসার, শিক্ষা, পরিবেশ এর সব কিছুর ওপর নির্ভরশীল হলেও সর্বোপরি জন্মগত অর্থাৎ জেনেটিক। তাই একই মাতৃজঠরের পাঁচটি সন্তানই ভিন্ন। যেমন

কুমোরটুলির খরমাটির লেপ পাল সাহেব যেমন করবে—রং ও প্রসাধন সামান্য আবরণ। ডিম্মাদ। কৃপণ মিতব্যয়ী ও দাতা যেমন অর্থের ওপর নির্ভর করে না ঠিক তেমনই গৃহকর্মনিপুণা হওয়া বা স্ত্রী ও মা হিসেবে কৃতকার্য হওয়াও অনেকটা জন্মগত। এই চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার, অ্যাকাউন্টেন্ট, উকিল, রাজনীতিজ্ঞ মহিলারাও অন্য মেয়েদের মতোই। তাদের অনেকেই সংসার ও গৃহকর্মে নিপুণা—স্ত্রী ও জননী হিসেবে অনেকেই কর্মশিক্ষিতা মেয়েদের থেকেও কর্তব্যপরায়ণা। সকলেই স্বাধীনচেতা তাও নয়। অনেকেই সাধারণ ঘরোয়া বধূদের মতোই বিনয়ী নম্র।

শুনেছি আমার ঠাকু'মায়ের এক হাঁকে গ্রাম স্তব্ধ হয়ে যেত। যেন কাল বৈশাখীর পূর্বাভাস। তিনি অবশ্য শুধু নিজের নামই নয় বিদ্যাসাগরের চতুর্থ পাঠ পর্যন্ত লেখাপড়া জানতেন। চার গ্রামের লোক তাঁর কাছে বুদ্ধি নিতে আসত। পুজো পার্বণে আড়াইশ লোকের রান্না একাই একরাতে করে ফেলতেন আর পরের দিন গরদের শাড়ি পড়ে যখন পুজোর কাজে বসতেন তখন সবাই সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলাবলি করতেন—স্বয়ং দুর্গাদেবীই কাঠামো থেকে নেমে যেন শিবের পুজোর আয়োজন করছে। রূপ ও গুণ আত্মমর্যাদা বাড়িয়ে তোলে। শ্রদ্ধাভক্তির অঞ্জলি যত যোগ হয় কর্মঠ মানুষ আরও কর্মঠ হয়ে ওঠে।

তাই অনেক প্রফেশনাল মেয়েরাই ঘরে বাইরের কাজকর্মে চতুর হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের যুগে শক্ত কাজতো মেশিনেই চলছে—তাই চাকরি করে অর্থোপার্জন করা ঘরের কাজের চেয়েও লাভজনক ও শান্তির।

এই তনয়াদের দেখে ভেবে চলেন জয়দীপ।

বেশ কয়েকটি মিষ্টি ছেলেমেয়েও এসেছে। খুব ছোটদের বেবিসিটারের তত্ত্বাবধানে রেখেই আসা হয়। বড়দের অনেকে নিয়ে আসে সমবয়সীদের সঙ্গে নতুন বন্ধুত্বের বা দেখা হবার জন্য। তাদের নিজেদের সমাজটাকে দেখান বোঝান। বিদেশে নয় তো তারা নিজেদের জানবে চিনবেই বা কি করে? সব বাবা মা-ই তো চান ছেলেমেয়েরা ভারতীয় ভাবে বড় হোক—ভারতীয় পরিবেশে থাক এবং একান্তই গোপনভাবে ভাবেন অন্ততঃ বিয়েটা যেন

ভারতীয়ের মধ্যে হয়। জাতি ধর্মের এই যে মানুষরচিত আকাশচুম্বী দেয়াল—এ দেয়াল গড়ার ক্ষমতা অনেক মহাপুরুষের ছিল কিন্তু একে ভাঙার ক্ষমতা তিনশকোটি মানুষের এই অ্যাটম হাইড্রোজেন বম্বের যুগেও হয়নি। দিনদিন সে কংক্রিটওয়াল আরও শক্ত পোক্ত হবে—মানুষে মানুষে বিরোধও লেগেই থাকবে। যারা সে দেয়াল তুলেছেন মানুষের ক্ষুদ্র নরম ভীত মনের কাছে তারা হিমালয়ের চেয়েও কঠিন বিশাল। তাই মনের গভীরে ওই আশাটা সকলেরই থাকে সন্তান যেন তার মতোই সহজ পথে জীবন কাটায়। যারা সে ধর্ম বর্ণ সমাজের অন্ধকারকে ভেদ করে গেছে তাদের জ্বালা আরও বেশি—কেননা তারা দলছাড়া নগণ্য আউটকাস্ট।

ছেলেমেয়েরা বেশির ভাগই বাংলা একবিন্দুও জানে না। যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে তখন অন্য কেউ কিছুই বোঝে না। যারা বাংলা কিছুটা বলতে পারে তাদের কথাও যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। অনেকেই বোঝে অবশ্য। বাবা মায়েরা চেষ্টা করেন কেউ কেউ কিন্তু স্থানীয় পড়ার চাপে আর 'পর ভাষা' শেখার ইচ্ছা কারোই নেই। কেউ কেউ মাঝে মাঝেই 'দেশে' নিয়ে যান কণ্ডিশনিং করতে। তাতে অনেক সময় উলটো ফল হয়। ঝকঝকে বালিগঞ্জ থেকে রাজাবাজার বস্তীতে মামাবাড়ি আর কে যেতে চায়। অনেক সময় তফাৎটা তার থেকেও সুদূর।

স্কচ ওয়াটার সত্তর পার্সেন্ট প্রুফ—তার ওপর বারবছর যৌবনটা বাপমায়ের সেলে কাটিয়েছে। অতএব তার দৌরাত্ম্যের সীমা নেই। যার কণ্ঠনালী দিয়ে তিনি কলকল নিঃশব্দ ধ্বনিতে নেমেছেন—উর্বশীর মতো তাকেই সম্মোহিত করে ঘায়েল করেছেন। ঘায়েল যারা হয়েছেন তারা নন্দনকাননে নিজেদের স্থাপিত করে হাওয়ায় ভাসছেন। সবাই আমেজে ভরপুর। দ্রব্যগুণে তারা সব সরল সহজ মানুষ। প্রীতি স্নিগ্ধ হাসির আবির খেলায় চঞ্চল চপল সবাই। তারই মধ্যে বৈষয়িক আলাপ আলোচনাও চলছে। এক কর্নারে রবিশংকরের সেতার ও ধূপকাঠির সৌরভ ভেসে আসছে।

বিবেকানন্দ শ্যামলকে নিয়ে পড়ল। তা দাদা দেশে ফ্ল্যাট নিশ্চয়ই একটা রেখে এসেছেন? শ্যামল অবাক কণ্ঠে বলল, ফ্ল্যাট দিয়ে কি হবে? আর

ফিরব কবে তার নেই ঠিক—তাছাড়া ফ্লাটের আগুন দাম। ও তো কালো টাকা নাহলে কেনা যায় না। মিনিমাম পাঁচ লাখ।

—তা হলেও একটা ফায়ার এক্সিট থাকা উচিৎ। কবে এদেশে কি হয় তা কে বলতে পারে?—জোর দিয়ে বলল বিবেক।

পাশেই মোহন দাস বলে এক ডাক্তার ছিলেন। তার স্ত্রীপরিবার বর্তমানে দেশে। তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি ছোট একটি বাড়ি দেড়কাঠা জমির ওপর করেছি। ভগবানেব কথা ফেলতে নেই। তিনি বলেছেন 'মাটি টাকা টাকা মাটি' অর্থাৎ মাটির দাম সব সময় বাড়ে—অর্থোপার্জন করে প্রথমেই মাটি কিনবি। আমি আঠের বছর আগে এদেশে এসে প্রথমেই রামকৃষ্ণ দেবের উপদেশ পালন করেছিলাম। ঠাকুর সত্যিই ভগবান—তিন হাজারের জমি এখন তিনলাখ দাম। বন্ধুরা জ্ঞানীদের সহজ উপদেশও বোঝে না—ঘুরিয়ে কঠিন অর্থ করে। আবে যে রামকৃষ্ণদেব গল্পের ছলে 'হরি হরি' 'হর হর' বলে গল্পের সৃষ্টি করেছেন তিনি কি আর মেটিরিয়ালিস্ট দুনিয়াকে উড়িয়ে দিয়ে কথা বলবেন। পণ্ডিতরা ধরে নিয়েছেন তিনি বলতে চেয়েছেন 'টাকার মূল্য নেই—মাটিব মতো'। আসলে তা তো নয়। জমি ও মাটিই টাকার উৎপাদনে সাহায্য করে।"

সবাই ব্যাপারটাকে একটু রসিয়ে দেখে হাসল, কেউ কেউ হাতে তালি দিল—অনেকে বুঝলও না তবুও হাসিতে জয়েন করে পুলকিত হলো। গল্পটা ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিল বিবেক সবাইকে। এইভাবেই বিভিন্ন মজার গল্পের মধ্যদিয়ে পার্টি জমে উঠল। শিখ্ কাবাব, চিক্‌লেট, প্রনবল একে একে আসতে লাগল।

অনেক কষ্ট করেই এই উইকএণ্ডটা অফ্ করে নিয়েছিলেন ডাঃ সেন। হঠাৎ ঝন ঝন করে ফোন বেজে উঠল। ফোন 'নেই বজ্রাঘাত। কারও আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বুকটা আঁৎকে ওঠে প্রথমেই। ডাঃ সেনই ফার্স্ট টারগেট—তিনিই ফোনটি ধরলেন। হঠাৎ কথনও সথনও অনকলে না থাকলেও থাকে। অবশ্য 'সান্নি' বলেই শুরু হয়—অর্থাৎ পাতলা কাণ্ড—পরে তাইই মোটা বাঁশ হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলায় উত্তর শুনে সবাই আবার পানআহার ও গ্যাজানোতে মনসংযোগ করল। মহুয়া স্বপ্রশ্ন দৃষ্টিতে উদগ্রীব হয়ে নিষ্পলক ডাগর ডাগর আতপ্ত চোখে তাকিয়েছিল। অসংখ্য ভাবনার ঢেউ একনিমেষে তার মানস পর্দা দিয়ে ভেসে চলল। অসংখ্য প্রশ্ন—কে বা কারা, কেন—ইত্যাদি। শ্যামল সেন হ্যাঁ হ্যাঁ—বলছি—কে?—তার পরই স্তব্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছিল। দূর থেকে মহুয়া একবার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কে—কে ফোন করেছে? শ্যামল হাত নাড়িয়ে জানাল—তেমন কেউ নয়—ইংগিতে বোঝাল—মাইন্ড ইওর বিজনেস। স্বল্প আলোতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখলে বোঝা যেত স্কচ শীতেও শ্যামল ঘামছে। তার মাথা ঝা ঝা করছে—সারাটা দেহ কাঁপছে—অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে কথাগুলো শুনে যাচ্ছে শুধু। মুখখানা রক্তিম হলো ঝলাত করে—পরে ফ্যাকাসে। বুকটার ঢিবঢিব শব্দের গতি বেড়ে গেছে অনেক—পাঁজরার দেয়ালে এমন মাথা ঠুকছে যে বুকটা ব্যথা ব্যথাই করছে। হয়ত সেই মোমেন্টে নিজের বুকের কথা খেয়ালই নেই তার। কথা শুনে হৃদয়ঙ্গম করা ও নিজেকে সংযত রাখার জন্যই তার দেহমন ব্যস্ত হয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছুটছে। একসময় ফোনটি সে রেখে দিল। তারপর পার্টিতে জয়েন করে ইংগিতেই একটা নাম অস্পষ্ট ভাবে মহুয়াকে জানাল—নয়ত তার বুক ধড়ফড়ানি তো কমবে না। 'ইন্দ্রজিত'—অনেক ভেবে নামটা মনে কালেকট করলেন শ্যামল। সে আসতে পারেনি গ্রিম্স্বি থেকে তাই পার্টির শুভেচ্ছা জানাল। 'ওঃ আচ্ছা'—মিষ্টি হাসির বারিষের সাথে উৎকণ্ঠা মিলিয়ে গেল মহুয়ার।

অন্তরের গাঢ়তম কক্ষে তখন তুমুল আলোড়ন চলছে। ক্ষণে ক্ষণেই বিদ্যুতের শকের মতো স্তব্ধ বিহ্বল হয়ে যাচ্ছেন শ্যামল। এমনটি সে কদাচ কল্পনা করেনি। এরকম একটা শুভদিনে মহুয়ার বাবা হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। আজ ফোন করে জানাল—কালই টেলিগ্রাম আসবে। কী ভাবে যে খবরটা মহুয়াকে জানান বার তাইই বুঝে উঠতে পারছেন না শ্যামল। অসুস্থ হলেও একটা কথা ছিল—যাবার গোছগাছের সুযোগ পাওয়া যেত। এই সবে দেশ থেকে আসা মাস ছয়েক আগে। তার ওপর সামাজিক ভাবেও

তাদের বিয়ে হয়নি। বলতে গেলে তাদের বিয়েই হয়নি। সেপারেটেড বাট নট লিগালী ম্যারেড্। ব্যাপারটা অত্যন্ত কমপ্লেক্স। ছেলেটাও সবে জন্মাল। ওই টুকু বাচ্চা নিয়ে নতুন পরিবেশে শীত থেকে গরমে—কী যে হবে কে জানে। শ্যামল যখন অসংখ্য দুশ্চিন্তার প্রশ্নে জরজর তখন একে একে অতিথিরা বিদায় নিল। কপট হাসিটি মুখে ধরে রইলেন শ্যামল।

সে রাতে একাই এসছিলাম শ্যামলের সেলিব্রেশনএ। আমার গৃহিণী জেন আসতে পারেনি। শ্যামলকে বহুবছর চিনি। ওর ফোন ধরার পরেই যে ব্যবহার ও গলার স্বর পালটে গেছে সেটা কেউ না বুঝলেও আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ও যে বার বারই গভীর কোনো চিন্তা থেকে ভেসে উঠছিল তাই আমি লক্ষ-করে আশঙ্কিত হচ্ছিলাম। শ্যামলও আমার অনুসন্ধিৎসু চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপেছিল। ইংগিতটার মানে চেপে যাও পরে বলব। আমার চোখে মনে জিজ্ঞাসার চিহ্নটা কালো মেঘের মতোই থমকে ছিল। আমিও ভেবে চলেছিলাম কী ও কে হতে পারে!

সন্দেহ মহুয়ারও হয়েছিল। যদিও একউত্তরে নিজেকে ঢেকে ফেলেছিল সে পার্টির পরিবেশ দিয়ে কিন্তু শেষ গেস্ট দরজা দিয়ে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, সত্যি বলো তো কে ফোন করেছে? তোমাকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে।

—বোস—বলছি—বলে মহুয়াকে জোর করেই জড়িয়ে ধরে সোফায় বসাল শ্যামল। কিছুক্ষণ আবার ভেবে নিল সে। এধরনের সংবাদ পরিবেশন করা যে কী শক্ত শ্যামল তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। তার ওপর এমন একটা পার্টির পরে। এমনিতেই বুকের মধ্যে আগুন জ্বলছে দেশ থেকে ফেরার পর থেকেই। তার ওপর একটু গোছাতে গোছাতেই এমন ঘটনা।

চুপি চুপি শ্যামল বলল, দেখ আমরা পৃথিবীতে জন্মেছি মানেই ওয়ান ডে আমাদের যেতে হবে। সবাইকেই যেতে হবে। যত বয়স বাড়বে যাবার চান্সও ততই বাড়তে থাকবে। আপনজন গেলে প্রচণ্ড আঘাত পাই আমরা—হঠাৎ কিছু ঘটলে আরও পাই। আমার তরফে সে শক্এর পাট চুকে গেছে। বলে থামল। বুঝতে আর বাকি রইল না। আপনজন কারও মৃত্যু সংবাদ।

মহুয়া অবুঝের মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করল—কী বলতে চাও তুমি ? শ্যামল ব্যথাভরা মুখখানা থমথমে রেখে চেয়েই রইল। যাতে মহুয়াই এগিয়ে যায়—নিজের উত্তর নিজে খোঁজে। অপ্রত্যাশিত আঘাত মহুয়ার বুকে প্রচণ্ডভাবে হানল। 'বাবা' ? রুদ্ধশ্বাস আতংকগ্রস্তের মতো মহুয়ার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। শ্যামল নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে মাথা নত করল। মহুয়া এক নিমেষে যেন দপ করে নিভে গেল। শ্যামলের দুই হাঁটুতে মাথা লুকিয়ে থর থর করে কাঁপতে শুরু করল। শ্যামল মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে যতদূর সম্ভব নরম গলায় সান্ত্বনা দিতে থাকল। আমিও দূর থেকে অজস্র শান্তিজল ছড়াতে লাগলাম। মহুয়া একসময় বেহুশ হয়ে পড়ল। দুজনে তাকে থার্ড বেড রুমে শুইয়ে দিয়ে আমি বসার ঘরেই সারাটা রাত আধো ঘুম আধো জাগরণে কাটালাম। ব্যাচারা শ্যামল ও মহুয়ার এই দুর্ঘটনায় আমার ব্যথারও সীমা রইল না।

পরের দিন ভোর বেলাই শ্যামল নেমে আপোলজি চাইল। চা বানাল। মহুয়া একটু পরেই নেমে লালটুকটুকে গোলাপের কুঁড়ির মতো দুটি চোখ মেলে তাকাল। চোখ দুটো ছোট হয়ে গেছে। মুচকি একটি কান্নাভাঙা হাসি দিয়ে ভাঙা অস্পষ্ট স্বরে বলল, আমাকে যেতেই হবে। আপনার সঙ্গেই ভাবছি চলে যাব লণ্ডন—পারবেন না ব্যবস্থা করতে ? গত রাত্রে মামাকেও ফোন করেছি—তিনি হয়ত আমায় নিয়ে যাবেন—বলল মহুয়া। বাচ্চাটার জন্য বুদ্ধি করে একটা বেবিসিটার মেয়ে জোগাড় করেছিল পার্টির জন্য। তাকেই সারারাত রেখেছিল ছেলেটাকে দেখতে। এই ট্রেইনড বেবি মাইণ্ডাররা খুবই ভাল বাচ্চাদের দেখে। সে ব্যাচারা এখন ভোর বেলা হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

—কী যে বলব আমি নিজেও বুঝে উঠতে পারলাম না। চিন্তা করার ভান করে চুপ করেই রইলাম। প্রব্লেম যাদের সল্ভ শুধু তারাই করতে পারে। তাদের জীবন ও চিন্তাধারা আমার থেকে যে কতদূর তা আমি নিজেও জানি না। তবুও বাঙালির চরিত্র তো—শত যোতেন ন পাল্টায়ীত। অযাচিত জ্ঞান দিতেই আমরা হাই পাই করি—অতএব নিজেকে কণ্ট্রোল করে

আজে বাজে ভনিতা ছাট কাট বাদ দিয়ে বললাম, যাওয়া তো বাবার মৃত্যুতে একান্তই উচিৎ—কিন্তু বাচ্চাটা এত ছোট—সেটাই তো প্রব্লেম।

—প্রব্লেম তো আছেই কিন্তু এসময় না গেলে হোল্ লাইফ রিপেণ্ট করতে হবে। আর আমার মাও নেই। বাবা ছিলেন—আবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল মহুয়া। ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় কি? এসব ক্ষেত্রে সমবেদনা জানাবার ভাষা মুখে এল না। কিছুক্ষণ পর আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিল মহুয়া। সাদাশাড়ি হলে বোধহয় আবিরের ছাপ লাগত মুখ থেকে। আইভরি রংয়ের মহুয়া স্কটদেশে এসে আলতো গোলাপী হয়ে গেছে। চামড়া যেন সেলফেনের পাতলা পর্দা। তার নিচে দিগন্তের রক্তিম ছটা। নাকের ডগাটা টুকটুকে লাল। কান্নাভেজা মহুয়া এক অপরূপ রূপলাবণ্যে উপচে পড়ছে। আমার শ্বেতাঙ্গিনীও অসুন্দরী নয়, তবে ভারতীয় এ মোহিনী রূপ বিশ্বসংসারে বিরল। আমি বোধহয় কালিদাসের আমলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। মহুয়া আবার ব্যথাতুর দৃষ্টি মেলে অস্ফুটে প্রশ্ন করল, কি দেখছেন? সম্বিত ফিরে পেয়ে বললাম, কিছু না—ভাবছিলাম। মহুয়া আমার নিষ্পলক নেত্রে রূপ সাগরে ডুব দিয়ে লুকিয়ে সুধা পান করাটা হয়ত বুঝেছে। সব নারীই সব পুরুষের দৃষ্টি বুঝতে পারে চোখের দিকে তাকিয়ে। একই দুটি চোখ কত ভাবে কতশত জিজ্ঞাসা—কত সহস্র প্রশ্ন করতে পারে। কত কথা বলতে পারে, কত ইংগিত করতে পারে এবং এক এক নিমেষে তা ভাবতে অবাক লাগে। এই তো দুটো চোখ—তার এক একটি যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময়।

সেই কত বছর আগে সদ্য যৌবনে ঠাকুর্দার বকুনি খেয়ে রাগে অভিমানে ভেজা আতপ্ত লাল চোখ দুটো নিয়ে খালটার পাড়ে চালতে গাছটার নিচে বসে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবছিলাম। সুদূর দৃষ্টিতে স্থান ছিল না—ছিল কাল—সময়—ভবিষ্যৎ। ছিল ক্রোধ অপমান অভিমান। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় ফেল। কত রকম দৃষ্টি নিয়ে চোখ মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিলাম। কতক্ষণ কে জানে। হঠাৎ খস খস শব্দ পেলাম। কারও পদশব্দ। মুখ ঘুরিয়েও দেখলাম না। অপমান অভিমানে 'ছাতি যাওত ফাটিয়া'।

তখনই কচুড়ি পানার মধ্যে থেকে ডাহুক ডাহুকী ছুটে গেল। মজা এল চোখে—কৌতুক এল মনে। ভুলে গেছি সে পায়ের চাপের মচমচ শব্দ। পেছন থেকে চোখ টিপে ধরেছিল কেউ। আঁৎকে উঠেছিলাম। কিন্তু নরম শীতল হাতের ছোঁয়ায় চোখদুটো জুড়িয়ে যাচ্ছিল। মনে হয়েছিল ঠাকুমা ম্যালেরিয়া জ্বরে পদ্মদিঘির ঠাণ্ডা জলের পটি লাগিয়ে দিচ্ছে কপালে। বেশিক্ষণ হলে আরামে ঘুমিয়েই পড়তাম। হাত টেনে ছাড়ালাম না বলে অপর পক্ষ যেন রণে হেরে গেল। হাতদুটো আলগা হলো। বুঝলাম অভিমানিনী হরিণী এবার পালাবে। তখন ঝপ করে ওর হাতটা ধরে ফেলেছিলাম। ও ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল সেদিন। কিন্তু নিউটনের তো তত্ত্ব সাধারণ জীবনেও অসাধারণ ভাবে প্রযোজিত। এভরি অ্যাকশন ইত্যাদি। তখন আমার চোখের দৃষ্টি ছিল ভিন্ন। নিজে আহত পশু—তাই অনাহতকে আহত করার জন্যই বর্বর মনটা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। চালতে গাছের নিচে—। ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে তখন বিদায়ী সূর্যের আলতো সোনার আস্রে পড়লেও তা শুধু চোখকে ধাঁধায়। নিজের মনের গুপ্ত ব্যথা কখন নির্দোষ এক সুদর্শনা কিশোরীর দেহে প্রতিহিংসার মতো উদ্গত হয়ে উঠল। বাজপাখি সন্তানের করুণ কর্কশ ক্ষুধার্ত চিৎকারে বিভ্রান্ত হয়ে যেমন শিকার করে সুতীক্ষ্ণ ধারাল নখ দিয়ে। আমার প্রাণের বিদ্রোহ নখগুলোও তেমনই ছিন্ন ভিন্ন রক্তাপ্লুত করেছিল তাকে। ঘটনার আকস্মিকতায়—আমার উদ্ধত তীব্র তুণগতির কাছে এক সদ্য প্রস্ফুটিতা ফুল তছনছ হয়ে গিয়েছিল। করুণ কাতর স্বরে সে মিনতি করেছিল হয়ত, কিন্তু সে দুর্দমনীয় সৃষ্টির শক্তির কাছে সে দাঁড়াতে পারেনি। একসময় সে আত্মসমর্পণ করে থর থর করে কেঁপেছিল। চোখে তার জল ছিল। মুখে তার ব্যথা ছিল। দুটো চোখে ছিল আতঙ্কিত বিস্ময়। আমি এমনটি করতে পারব এ যেন তার কাছে অকল্পনীয় অবিশ্বাস্য ছিল। অবাক চোখে অনেকক্ষণ সে চেয়ে রইল আমার দিকে। সে দুটো চোখ এখনও ভেসে বেড়ায় আমার মানসচক্ষে। পরে মনে হয়েছে ওই চোখের ভাষা ছিল—যেন নিজের সাঁতার না জানা প্রিয়াকে চুম্বন করতে করতে জোর করে নৌকো থেকে নদীতে ফেলে দিয়েছি—একবার সে ভেসে উঠে বিস্মিত উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসাভরা

চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিল। সে তো কবে-কতদিন আগে। তার পর সব ভুলে গেছি। হঠাৎ কখনও মনে পড়লেও তা খ্‌বই আবছা—খ্‌বই অর্থহীন। যৌবনের সামান্য ব্যাভিচার। দ্‌ষ্ট ছেলের দৌরাত্ম্য। অমন কাচের গ্লাস তো কতই ভাঙ্গি। কোন ভোমরা কোন ফুলের কলিকে প্রথম ফুটিয়েছে ব্রহ্মাণ্ড তার হদিশ রাখে নাকি? আজ ওই দ্‌টো চোখ—সম্প্‌র্ণ ভিন্ন পরিবেশে আমার মনে পড়ল হঠাৎ। কোনো সম্পর্ক বা সামঞ্জস্য নেই। আসলে চিন্তা কল্পনা এরা ঠিক পর পর রিলে সিনেমার ফিল্মের মতো সাজানো থাকে না। কখন যে কোনটা মানসপর্দায় ভেসে আসে—অনেক সময় তার কোনো য্‌ক্তিও থাকে না। আঁকা ছবি—লেখাকাব্য স্থির—ব্রহ্মাণ্ড প্রতি ম্‌হ্‌র্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। ছবি—ছবিই, গল্প গল্পই। একটি নিমেষ মাত্র।

মোটাম্‌টি ঠিক হলো মহ্‌য়া একাই বাচ্চা নিয়ে যাবে। শ্যামলের ঠিক এসময় যাওয়া সম্ভব নয়। ছ্‌টি নেই, তেমন অর্থ নেই, সর্বোপরি তার যাবার প্রয়োজনও তেমন নেই। কান্নাজড়ানো—শোকে অভিভূত মহ্‌য়া চটপট রেডি হয়ে গেল। লণ্ডন পর্যন্ত আমারও পৌঁছে দেবার ভার পড়ল। ফোনে ব্যবস্থা করে সে ভার আমি নিলাম। আমি নির্বাক দর্শক। কিন্তু নিজেকে তাদের সাহায্যে কাজে না লাগিয়ে পারলাম না। ওটা আমার হবি বোধহয়। লিফ্‌ট দেয়াটা। অনেক চেষ্টা তদ্বির করে শ্যামলও পরের দিনটা 'অফ' করে নিল। আমার গাড়িতে যাবে—ফিরবে ব্রিটিশ রেলে। পথের সঙ্গী পেলাম সেটা আমার সৌভাগ্য নিশ্চয়ই। যদিও রোদনে ভরা তাদের বসন্ত।

সেই রাতেই লণ্ডন পৌঁছ্‌লাম। মামার অতিথেয়তার ত্র্‌টি ছিল না। কিন্ত্‌ একদিনেই তিনি টিকিটেরও ব্যবস্থা করেছেন। পরের দিন ভোরেই ফ্লাইট। ওইটুকু শিশ্‌র জন্য আমার হা-হ্‌তাশের অন্ত ছিল না। ব্যাচারাকে এর মধ্যেই কেমন শ্‌কনো দেখাচ্ছিল। তাই বললাম, আর যাই কর ওর বেবিফুড ও ড্রিংক যে করেই হোক কিনে নিয়ে যেও। 'আরে কলকাতায় হাজার হাজার বাচ্চা হচ্ছে—তারা কি বেঁচে নেই?' 'তা আছে—তবে ও এস এম এ খায়—দেখেতো সেটা পাওয়া যাবে না, অনেক সময় আম্‌লও আউট অফ মার্কেট হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ কালোবাজারে পাওয়া যায় না এমন বস্ত্‌ নেই।' বলেছিলাম আমি।

শেষ পর্যন্ত হিথ্রোতে যাবার পথেই সে সব কেনা হলো। আমিই তুলে দিলাম তাদের প্লেনে—তখন বেলা বারটা হবে। শ্যামল তখন ধরে প্রাণ নেই এমন অবস্থা। তবুও নিজেকে সংযত রেখে বলল, ভালয় ভালয় ফিরে এলে হয়।

আমি একটু সহজ হবার জন্য বললাম, আবার স্বামীর ঘরে আটকে না যায়—শ্যামল থমকে গেল। মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। মুখটা শুকনো হয়ে গেল এক নিমেষে। আমি পিঠ চাপড়ে একটা খিস্তি ঝেড়ে বললাম, ইয়ার্কি মারলাম।—

শ্যামল গম্ভীর ছলছল চোখে বলল, ওই ইয়ার্কিই যে আমার রাবণ বধ ধনুক। এমন প্যাঁচে আটকে গেছি—লাইফটাই একটা কেমন হয়ে গেল। এখন বাচ্চাটা হতে তাও যেন প্রাণ পাচ্ছি। অগোছাল জীবনটাকে গুছিয়ে নেবার একটা সেন্ট্রাল পয়েন্ট পেয়েছি—ভাবনার মধ্যে ডুবে গেল শ্যামল।

আমি বললাম, সবার জীবনই সরলরেখায় চলে না—সেটাই সৃষ্টির ধর্ম। তুই আমিই তো নতুনভাবে নতুন জগৎ গড়ে তুলব। গতানুগতিক স্রোতধারা আমরাই পালটাব। আমার স্ত্রী বিলেতী—তোর স্ত্রী দ্বিতীয়া—এগুলো না মেনে নিতে পারলে আমাদের সমাজ থমকে যাবে। পরিবর্তন পরিবর্ধন না হলে পৃথিবীতো ওই মধ্য যুগেই থমকে যেত।

—তার জন্য আমার রিপেন্ট নেই। কিন্তু ভাগ্যের পরিবেশে যাকে ও ধোকা দিয়ে অভিনয়ের ছলে বিয়ে করেছিল সে যে আমার ছোটবেলার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু—সেটাই তো ট্র্যাজেডি।—বিক্ষোভের সঙ্গে বলল শ্যামল।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে জানালাম, সে ও তো তোর ভাল লাগত এমন একটা মেয়েকে কাছে টেনেছিল। কি যেন নাম তুই বলেছিলি—

—সুলেখা—আমার কথাটাকে এগিয়ে নিয়ে বলল শ্যামল, কিন্তু সেটা ফাড়ং জানতো না। সে যদি ঘুনাক্ষরেও জানত আমার সুলেখার ওপর দুর্বলতা আছে তাহলে ওপথ দিয়েও ও চলত না। ফাড়ং অন্য জাতের মানুষ। ওই বয়সেও ফাড়ংকে আমাদের 'শ্রীকান্তের ইন্দ্রের' মতো মনে হত। ওর প্রাণটা ছিল বিরাট। সাধারণ মানুষ হলেও ওর মধ্যে অসাধারণ পার্সনালিটি ও ত্যাগ ছিল।

থামল শ্যামল। তারপর দ্বিধাভরা গলায় ইংরেজীতে বলল, আমি আশা করি ও আমার কোনো ক্ষতি করবে না। শুনলাম ও নাকি এখন বেশ বড় ব্যবসায়ী। দেখা করে আসার সুযোগ আমি পাইনি—তবে ওর ওপর শ্রদ্ধা ভালবাসা আজও আমার অটুট আছে। কিন্তু বুঝতেই পারছিস—আমি—আই হ্যাড নো চয়েস।—দীর্ঘশ্বাসে আত্মবিলাপ ছড়িয়ে পড়ল এম ফোর মটরওয়ের ওপর। করুণ ব্যাকুল স্বর প্রতিধ্বনিত হয়েছিল বাতাসের তরঙ্গে। অসহায় গভীর তীক্ষ্ণ অনুশোচনা জড়িত গলায় বলল, আই ডোণ্ট রিয়ালি নো—আমার শেষগতি কোথায়। আমি সেই ক্ষুদিরাম সুভাষের দলের মানুষ নয়—আমি বৈপ্লবিক প্রাণ নিয়ে জন্মাইনি। আমি অতি সাধারণ গতিই পছন্দ করি। অথচ আমার কাঁধেই শতাব্দী পালটাবার ক্রুশ চাপল। জানি না এই ক্রুশই হয়ত আমার ক্রুশিফাই হবার জন্য তৈরি।

ওর প্রচণ্ড ঊর্মিমালায় উদভ্রান্ত নাবিক বুকে আমি আর ঝড় তুললাম না। চুপ করে থেকেই ওকে একসময় ট্রেনে তুলে দিলাম। গত ছসাত মাস যে কী করে কেটেছে ফাড়িংদার অর্থাৎ রমণী মোহনের তা শুধু তিনিই জানেন। আগাছায় ভরা জমিও মানুষ অন্যকে দিয়ে দিতে পারে না। কেউ ছলে বলে কৌশলে আত্মসাত করার চেস্টা করলেও মামলা মকদ্দমা ঝগড়া বিরোধ এমনকি খুন খারাবিও হয়ে যেতে পারে। যা বাড়িতে নিজের কাছে ছিল তার নিজের ভাবে তা অব্যবহৃত হলেও তার অমন করে চলে যাওয়াটাকে রমণীমোহন মেনে নিতে পারেননি। বরং ওই চলে যাবার পর থেকেই তিনি উদভ্রান্ত ও বিভ্রান্ত হয়ে ভারতময় ছুটে বেড়ালেন। যে সুলেখাকে খুঁজে পেয়ে সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিল—সেই সুলেখার সাথেও দেখা করল ছ' মাস পরে।

বন্ধু মারফৎ ও লোকের মাধ্যমে তিনি প্রতিটি পদক্ষেপ না হলেও মহুয়ার বেশির ভাগ খবরই রাখতেন। এমন কি তার ভবানীপুরের বাপের বাড়ির খবরও প্রায়ই কানে আসত। মহুয়ার পিতৃবিয়োগের খবরটা সেদিনই তার কাছে এসেছিল এবং খবর পেয়ে অনেকদিন পরে আবার শ্বশুর বাড়িতে এসেছিলেন। কর্তব্যপরায়ণ জামাই হিসেবে তাতে সুখ্যাতি বেড়েছিল। বাড়ির প্রায় সকলেই তার অনেকদিন আগে থেকেই রমণীমহুয়ার বিয়ে-দুর্ঘটনার

খবর জানতো। তাই অবাক হয়েছিল তাঁর উপস্থিতিতে।

রমণীমোহন পাত্র সহজ নয়। অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তিনি আজ পাহাড়ের ওপর উঠেছেন—সেয়ে বেয়ে। সিঁড়িহীন সে পাহাড় খুবই দুর্গম ও খাড়াই ছিল। অনেকঘাটের জল খেয়ে এই কয়েকমাস তিনি নিজেকে তৈরি করেছেন মহুয়ার সাথে লড়তে। ঘরোয়া ঝগড়া বিরোধ তিনি জানেন না—তাতে সময় নষ্ট হয় অথচ কাজ হয় না সেটাই তার ধারণা। উকিলের পরামর্শও নিয়েছেন। নিজে ব্যারিস্টারও ফিট করেছেন। কিন্তু সময়টা রেখেছেন নিজের হাতে। অস্ত্রে না মারতে পারলে পলিসিতে যাতে ঘায়েল করতে পারেন তার জন্যই অপেক্ষা।

শ্বশুর মশাইর মৃতদেহের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি সে কথাই ভাবছিলেন। আর ভাবছিলেন ব্যাচারা শ্বশুর ও নিজের ভাগ্যের কথা। ভাবছিলেন মহুয়াকে শিক্ষা দেবার অস্ত্রশস্ত্রের কথা। মহুয়ার দাদাও ডাক্তার—জেনারেল প্রাকটিস করেন। দু বোনেরই বিয়ে হয়েছে কলকাতার বাইরে। বৌদি হাউস ওয়াইফ। অত্যন্ত হাসিখুশি ভাল মানুষ। মহুয়া সম্বন্ধে দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না তাদের। অতিসুন্দরী—অনেক গুণের মালিক তার ওপর ডাক্তার। এত বোঝা মেয়েরা বইতে সইতে পারে না। তাই অনেকের জীবনই ছার খার হয়ে যায়! শুধু রূপসী হলে কমবয়সেই বিয়ে হয়ে যায় যাদের তারা তো ঘর সংসারের ধোঁয়ায় ময়লা হয়ে নুয়ে পড়ে। শিক্ষিতা অথচ সুন্দরী নয়···তাদের বোঝাটাও তেমন নয়। কিন্তু সুন্দরী মিশুকে গুণবতী হলে চরিত্রবতী হওয়া—পাহাড়ের ওপরে ধরা ছোঁয়ার বাইরে না থাকলে সমাজ তাকে ক্ষতবিক্ষত করে নিংড়ে নেবে। প্রতিদিন শত শত মানুষের রঞ্জন দৃষ্টির ঝাঁঝ, শত শত যুবকের উৎসুক কটাক্ষ, দুনিয়ার সাবধান বাণী অনেকের তোষামোদ, তার ওপর মান অভিমান, জোর জবরদস্তি তো আছেই। এ তো সৃষ্টির স্বাভাবিক উগ্রতা। মহুয়ার ক্ষেত্রেও এর অনেকই প্রযোজ্য। তাই বাবার চিন্তা, দাদার শাসন, বৌদির তীর্যক কৌতুক ছিল ঘরে—আর বাইরে দুনিয়ার বন্ধুদের হাতছানি।

—কিন্তু সে আমার জীবনটা নিয়ে খেলতে গেল কেন? তাই বারবার

ভেবে চলেন রমণী মোহন। তার পরই হঠাৎ তিনি ছুটলেন। মনে হলো পেয়েছেন হাতিয়ার। এই সুযোগ। ব্যারিস্টার নিমাই ভট্টাচার্য, লালবাজারের পুলিস অফিসার কালিপদ মুখার্জী ও সবশেষে সুলেখা সেন।

অমন উস্কখুস্ক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ফড়িংদাকে দেখামাত্র বুকটা ছাঁৎ করে উঠেছিল সুলেখার। আফিস ছুটি হতে খুব আর দেরী ছিল না। ফাইল থেকে মুখ তুলে তাকান মাত্র দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল সুলেখার। 'তুমি?' অবিশ্বাস্য ভাবেই অস্ফুটে ঠোঁট নাড়ল সুলেখা। রমণী মোহনের চেহারা ঝড়োকাকের মতো না হলেও তার স্বাভাবিক দুর্বার গতি যেন প্রচণ্ড শীতে জমে বরফ হয়ে গেছে। না কি নিজের ঝড়েই নিজের ডানা মটকে গেছে। ম্লান কপট হাসি টেনে বললেন, হ্যাঁ আমি। একটু কথা ছিল।—বলার মধ্যে অনুরোধ ছাড়া রমণী মোহনের ব্যক্তিত্বের চিহ্নও ছিল না।

—বোসো—একটু প্লিজ—বলে উঠল সুলেখা। পাশের ঘরে গিয়েই আবার ফিরে এল। চা-এর কথা বলে এল। রমণীমোহন কেন এতদিন আসেননি তা নিয়ে অনেক ভেবেছে সুলেখা। শেষ পর্যন্ত ভেবেছে ভালই হয়েছে। শ্যামলদা বিলেত গিয়ে লম্বা একখানা চিঠি দিয়েছিলেন—হেয়ালী কথা সব। অনেক মাপও চেয়েছেন। বিলেতি ভদ্রতা। কিন্তু উত্তর চাননি—ঠিকানাও দেননি। সুলেখা মাসখানেক দেহে মনে ফাইট করেছে। এক সময় আবার মনটাকে গুটিয়ে নিয়েছে। পড়া গানশেখা এসব নিয়েই ব্যস্ত ছিল। তার ওপর মাঝে মাঝে শর্মিষ্ঠাকে তদারক করা। অর্থাৎ ঢিল পড়ে উছলে ওঠা পানা পুকুরের জল ও পানা একটু রণিত হয়ে আবার স্তব্ধ ও মৌন হয়ে নিজের মধ্যেই ডুব দিল। হঠাৎ সেই ফড়িংদার অকস্মাৎ আগমনে চমকে উঠল। বুকে শপাং করে যেন বিদ্যুৎ চাবুকের ঘা লাগল। নিজেকে সামলে নিয়ে সৌজন্যমূলক হাসল একবার। মিষ্টি করেই জিজ্ঞেস করল—এক কাপ চা খাও। তোমাকে ভীষণ টায়ার্ড মনে হচ্ছে। কোন অঘটন কিছু?

—না—নিতান্তই পার্সন্যাল—মাথা নাড়িয়ে রমণী মোহন বললেন।

—মনটায় উৎকণ্ঠার পাখা ঝাপটা মারছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে

রইল সুলেখা কিছুক্ষণ। রমণী মোহন মুখ চেপে গম্ভীরভাবেই বসে রইলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্তের মতো। সহজ অ্যাটমসফিয়ার আনার জন্য সুলেখা বলল, পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি আমার গার্জিয়ান, দাদা এবং আমাদের বড়বাবু মিস্টার নরেন্দ্রনাথ রায়।

—আমি খুব ভালভাবেই চিনি রমণীবাবুকে—হেসে পান চিবোতে চিবোতে বললেন নরেনবাবু। পানের পিকটা একটু দূরে একটা নর্দমার গোড়ায় ফেলে বললেন, উনি এর আগেও দু'একবার এসেছেন আমার এখানে—কেন তুমি দেখনি আগে? অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন নরেনবাবু।

—হ্যাঁ, ওনাকে আগে দেখেছি—তবে এ অফিসে দেখলেও চিনতে পারিনি।

—চিনতে পারনি মানে—তুমি কি তারও আগে থেকে ওনাকে চিনতে নাকি? জিজ্ঞেস করলেন নরেনবাবু কৌতূহলী হয়ে।

হ্যাঁ—অনেক ছোটবেলা চিনতাম। তারপর হঠাৎ এখানেই আর একদিন চিনে ফেললাম—দুষ্টুমিভরা ছেলেমানুষি ভাবে বলল সুলেখা। জানাব উৎসাহ বেড়ে গেল নরেনবাবুর। তিনি কাছে এসে বললেন, কই আমাকে আগে বলোনি তো? আমি তো রমণীবাবুকে বেশ কয়েক বছর ধরেই চিনি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেই সব খবর পেতে।

—তখন ওনার ভাল নামটা জানতাম না যে। তাছাড়া হঠাৎ এমন ভাব-গম্ভীর মানুষকে কী করে ফড়িংদা বলে ডাকি? তামাসা করল সুলেখা।

—ফড়িংদা? হাহা করে হেসে উঠলেন নরেনবাবু, এমন গণ্যমান্য পুরুষকে তুমি বাপু ওই ছোটবয়সের নাম ধরে ডেকো না। স্যরি মিস্টার পাল, কিছু মনে করবেন না। একটু হাস্যকৌতুক করলাম।

—নানা—মনে করার কি আছে। আমার বাবা মা গ্রামের লোক, ওই নামেই ডাকতেন এবং এখনও অনেকে ওই নামেই ডাকে।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিটা রমণী মোহনের মুখের ওপর ফেলে রেখেই সিগারেট ধরালেন নরেনবাবু। দেশলাইয়ের কাঠিটা ডানে বাঁয়ে নাড়াতে নাড়াতে সিগারেটের প্রথম লম্ব ধোঁয়াটা ছেড়ে নিজেই একটু হাসলেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুলেখা সেই হাসির অর্থ খুঁজতে চেষ্টা করছিল। নরেনবাবু হাসিমুখে বললেন,

আমার ডাক নাম শুনলে আপনি আঁৎকে উঠবেন—হাসবেন তো বটেই। বলে থামলেন। হাসিটি মুখেই লেগে রইল। আবার শুরু করলেন, আমার নাম ছিল কল্কে। তারও একটা কারণ পরে জেনেছিলাম। দাদুই নামটা দিয়েছিলেন।

—কি সেটা? বাব্বাঃ আর নাম খুঁজে পেল না দাদু আপনার? হেসে বলল সুলেখা।

আমি জন্মেছিলাম এক অজ গাঁয়ে। মামাবাড়িতে। আমাদের নিয়ম ছিল আতুড়ঘরে মা ও বাচ্চা দশদিন কাটাত। অনেক সময় ভাল ঘর হলে হয়ত আরও বেশি। দাই সে সময়টা মাকে সাহায্য করতেন ও আমাকে দেখতেন। তা তিনদিন হবেই হঠাৎ দাদু তার কল্কে খুঁজে না পেয়ে চেঁচামেচি হাঁকডাক শুরু করেছেন। সবে নাকি তামাকটা সেজে দিয়ে গেছে অশ্বিনী। দাদু বোধহয় কয়েক মিনিটের জন্য কোথাও গিয়েছিলেন। এসে দেখলেন কল্কে হাওয়া। বেশ কিছুক্ষণ কল্কে না পেয়ে দুতিনজনে খুঁজতে শুরু করল। দাদু সব ভুলে তার নতুন দাদুর মুখখানি দেখার জন্য উৎসুক হয়ে আতুড় ঘরের দরজায় এসে হাঁক দিলেন। কইরে দেখি আবার একটু দাদুকে। তারও ঘরে ঢোকা নিষেধ। হঠাৎ একটু ধোঁয়া চোখে পড়তেই চেঁচিয়ে উঠলেন ভয়ে—হয়ত ভেবেছেন আগুন লেগেছে। এই ধোঁয়া কিসের ওখানে মা তখন চান করতে গেছেন। কল্কে হাতে অহল্যা দাই লজ্জায় মরে যায় প্রায়। বিশাল ঘোমটা টেনে দাদুর হাতে কল্কেটা দিয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে কোনো রকম বলে ফেললেন, খোকাবাবু—

—খোকাবাবু আমার কল্কি থেকে তামুক খাচ্ছিল? চারদিকে হাসির হুল্লোর পড়ে গেল। কল্কে বাবু, কল্কি চোর—যে যা খুশি নামকরণ করে বসল। অহল্যা তার অপমান থেকে পরিত্রাণ তো পেলই—দাদু তাকে আলাদা একটা কল্কেও নাকি কিনে দিয়েছিলেন। পরে ব্যাপারটা উঠে গিয়ে মামাবাড়ির নামই হয়ে গেল কল্কে। এখন অবশ্য সবাই সেটা ভুলে গেছে।

চা খাওয়া শেষ হতেই সুলেখা বলল, নরেনবাবু—আমি তাহলে ওনার সাথে যাচ্ছি। কালকে দেখা হবে।—রমণী মোহনও নমস্কার জানালেন

নরেনবাবুকে।

সুলেখার বুকটা একটু ঢিব ঢিব শুরু করছে। দেহেও কেমন একটা শিহরণ বয়ে গেল—ফাড়িংদাকে দেখলে ও কেমন একটা সজল জলজ হয়ে পড়ে। গাটা ছেড়ে ছেড়ে দেয়। মনটা ভিজে ভিজে যায়। বিনা কারণে লাজুক হয়ে ওঠে। নিজেকে কেমন দুর্বল আইডেনটিটিহীন মনে হয়। শ্মশান হাসপাতাল পুলিস-স্টেশন এয়ার পোর্ট ইত্যাদি জায়গাগুলো মানুষকে উলঙ্গ করে শিশু করে ফেলে। অর্থাৎ যাদের কখনও সখনও যেতে হয়। ডোম ডাক্তার পুলিস তাদের কথা আলাদা। হয়ত আদালতেও তাই। ঠিক তেমনি কোনো কোনো পুরুষের সান্নিধ্যে এলেই কোনো কোনো রমণী তার পার্থিব ও সামাজিক আবরণকে ভুলে গিয়ে ধরিত্রীর মতো হয়ে পড়ে। সে তখন শুধু মৃত্তিকার পাত্র বিশেষ। সেখানে দম্ভ গর্ব ঔদ্ধত্য আপনত্ব সব জড়ত্বে পরিণত হয়। মুখে লালা আসে, চোখে জল আসে, বসন স্খলিত হতে চায়। আতপ্ত বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ বুজে আসে—বিম্বাধর শুড় শুড় করে, শরীর ম্যাজ ম্যাজ করে—ফর্সা রং আবির হয়ে ওঠে। রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায়। কখন সে নিজের মধ্যে ঢুকে অস্থির হয়ে পড়ে।

ততখানি অসংখ্য মানুষের ভীড়ে হওয়া সম্ভব নয়। চারদিকের দড়ির টানে চোখ খোলা থাকে, মন আচ্ছন্ন থাকে, কপট সভ্যতার আবরণে দেহটা জড়ান থাকে। সুলেখা স্বাভাবিক ছিল। মনটা অস্থির হয়ে উঠছিল দেহটা অনুর্বণিত হচ্ছিল বারম্বার। ভাবেভাষায় ভরা দুটো কালো টানা চোখের মণি ঘুরিয়ে দেখছিল বলিষ্ঠ পুরুষ রমণী মোহনকে। যাকে দেখছে সে আজ আলাদা কেউ। উদাস—আনমনা—বিবাগী।

—তোমার হাতে সময় আছে একটু? ভেজা গলার অনুরোধ কানে অবিশ্বাস্য মনে হলো। এমন গলায় এমন পুরুষের কথা।

—হ্যাঁ—ঘণ্টা দুয়েক নো প্রব্লেম। চল কোথায় যাবে। সাড়ে সাতটার মধ্যে আমার ফিরতেই হবে। পম্মব সব ব্যবস্থা সে পর্যন্ত ঠিক করা আছে—বলল সুলেখা।

গ্রাণ্ড হোটেলের নিচে এক কোয়ায়েট এয়ার কণ্ডিশন রেস্তোরাঁয় দুজনে

গিয়ে বসল। ততক্ষণ ধরে দুজনে কথা নেই। শুধু গম্ভীর উদ্বিগ্ন চোখের দৃষ্টি বিনিময় মাত্র। সুলেখার বুকে হাতুড়ি পেটাচ্ছিল। অনুরাগ থাকলেও আতংকের ছায়াও ছিল। এই পুরুষ মানুষটা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে—সেটাই ভয়। দুনিয়ার সব কিছু জয় করে সে সাধারণ বাঙালী কর্তব্যপরায়ণা ভীরু রমণীর মতোই জীবন কাটাচ্ছিল। হঠাৎ আসা এই ঝড়ের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে ফেলতে হলো একদিন রাত্রে। এটা যে কেন হয় তা বোঝে না সুলেখা। মানুষের এত শক্তি—এত ক্ষমতা—এত আত্মগর্ব হঠাৎ এক নিমেষে কারও কাছে ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। আসলে মানুষ বুঝি অতি দুর্বল, সেতার মাত্র। যে বাজাতে জানে তার কাছে ক্ষণেকেই মূর্ছা যায়। তেমনি কোনো পুরুষের কাছে অত্যন্ত দাম্ভিক সুন্দরীও খেলার ডলি হয়ে যেতে পারে। তবে সে খেলোয়াড়কে পুতুলের দুর্বল সুতোগুলোকে জানতে হবে আর সেই পুতুলেরও সেই খেলোয়াড়ের থেকে অনল শিখা উদ্ভাবন করতে হবে। সবাই সবার গুরু হতে পারে না—শিষ্যও হতে পারে না। এই দুর্লভ যোগাযোগ হওয়াও সহজ নয়। নয়ত সব দম্পতিই মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত দুনিয়ায়। এত অবিচার, ব্যাভিচার, নষ্ট ভ্রষ্টার সৃষ্টি হত না। এত মান অভিমান ও ঘর ভাঙ্গা বন্যা হয় শুধু জিগ্—ছ—(JIG SAW PUZZLE) পাজ্‌লে ভুল জায়গায় ভুল টুকরোটা বসাবার জন্য গদাধরের টুকরোর সাথে নরেনের টুকরো না যোগ হয়ে টাটার টুকরোটি যোগ হলে কি হত কে জানে? দুজনেই প্রাণপণ চেষ্টায় আবেগ সংবরণ করে রেখেছিল। উত্তেজনা-উদ্বিগ্নতা ও আশা নিরাশার তরঙ্গমালা ভেতরে ভেতরে বয়েল হচ্ছিল। রমণীবাবু আদ্যোপান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিবেচনা করে সাজিয়ে নিচ্ছিলেন আপন মনে। কতটা কীভাবে তার জীবন ইতিহাস তিনি উপস্থাপন করবেন সুলেখার কাছে—যাতে সহানুভূতি পেয়ে তার কার্যোদ্ধার হতে পারে। সুলেখা ভাবছিল অন্য কিছু। হয়ত রমণী মোহন কোন বিপদে পড়েছে—অথবা তাকে…।

অত সুন্দর সুসজ্জিত শীতল ও বিভিন্ন হাউস প্লান্টে ঘেরা রেস্তোরাঁয় বসে দুজনেই দুজনার দিকে তাকিয়ে ঘামছিল। আশা আকাঙ্ক্ষা আবেগ

অনুরাগ একধারে আর একধারে জিঘাংসার উন্মত্ত আলোড়ন। সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী চিন্তাধারায় ডুব দিয়ে আন্দোলিত হচ্ছিল অত কাছের দুটো হৃদয়। সময় কম তাই ভনিতা করেন নি রমণীমোহন। সুলেখার দিক থেকে চোখের তারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে বললেন, আমি তোমার কাছে মাপ চাইছি সুলেখা প্রথমেই। নিজের স্বার্থের দ্বন্দ্বে তোমাকে সাহায্য করার জন্য ডেকে এনেছি। তোমার থেকে আপনমানুষ আমার আর কেউ আছে সেটা ভাবতে পারছি না। আর কাজটা এমনই যা অন্য কাউকে দেয়া যায় না।—কণ্ঠ কেঁপে উঠেছিল রমণীমোহনের।

—ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো? রসিকতার সময় নয় তবুও স্মিতহাস্যে বলল সুলেখা।

—না ছাই ফেলতে নয়—ছেলে ধরতে—গম্ভীরভাবেই বললেন রমণী মোহন।

—ছেলে ধরতে? কার ছেলে? অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সুলেখা। চায়ে চুমুক দিয়ে রমণীমোহন বললেন, সম্ভবতঃ আমার—

—সম্ভবত তোমার? এ কি তামাসা রসিকতায় ভরা কথা শুনছে সুলেখা—সে ভাবেই প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে।

—তবে শোন আমার কথা। সংক্ষেপেই বলছি—যতটা সম্ভব কাটছাট করে সংক্ষেপে নিজের জীবন—ভাগ্য—বর্তমান অবস্থা সবকিছুই বর্ণনা করলেন রমণী মোহন। তার বিবাহিতা স্ত্রী—সে বিলেত পালিয়েছে—তার ছেলে হয়েছে ইত্যাদি। রমণী মোহনের গলায় অসহায় বোধের গভীরতা ছিল। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল দুজনে। সভ্য দেশের শিক্ষিত ভদ্র সমাজেও কত বর্বরতা লুকিয়ে থাকতে পারে। সুখী আপাতদৃষ্টিতে হলেও মনের নিচে কত আগুন জ্বলছে কত লোকের।

—তা আমাকে কি করতে হবে? প্রশ্ন করল সুলেখা।

—আমার এই কাঁচ ছেলেটি আসছে—তাকে এনে তোমার হাতে তুলে দিতে চাই কয়েক মাসের জন্য—কেস মিটে গেলে আমি নিয়ে নেব বা তার মার হাতে তুলে দেব।

—তাতে তোমার কি লাভ হবে ? উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করল সুলেখা।

—হয়রানি করা—শিক্ষা দেয়া। সে প্রেগনেন্ট ছিল তা আমাকে জানায় নি। সে আর একজনের সাথে স্বামীস্ত্রীর মতো থাকছিল সেটা কি আমাকে বলা তার কর্তব্য ছিল না ? তার কি উচিৎ ছিল না তার অনেক আগেই আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া ? আমি তো জোর করে তাকে বেঁধে রাখিনি। সে ছিল ডাক্তার—আমাকে সে ঠকিয়েছিল তাতেও আমি কিছু বলিনি এবং উল্টে তার সত্যবাদিতাকে শ্রদ্ধা করে তাকে ছবির মতোই রেখেছি বাড়িতে। সে সুযোগ পেয়ে আলাদা সমাজে পালালো—আমাকে তার জন্য অপমান ভার সইতে হচ্ছে। আমি তাকে শিক্ষা দিতে চাই—তবে ক্ষতি করতে চাই না। ভগ্ন ব্যথিত ভাবে বললেন রমণী মোহন। মুখে তার প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে। সুলেখা ভেবে যাচ্ছিল এ আবার কি বিপদের মধ্যে বিনাকারণে জড়িয়ে পড়ছে সে। অন্ততঃ তাকে যে জীবনসঙ্গিনী করার প্রোপোজাল দেয় নি সেটায় স্বস্তি পাচ্ছে। আর ব্যথাও বাজল বেচারা রমণী মোহনের দুর্ভাগ্যের কথা জেনে। অমন শক্তিমান অবাধ্য সিংহের মতো পুরুষের ভেতরটা এত বছর ধরে জ্বলছিল—এ যেন অবিশ্বাস্য।

—তা মহুয়া পালিয়েছিল কার সাথে ? ভাবতে ভাবতেই নমনা প্রশ্ন করল সুলেখা।

—শুনেছি ডাক্তার শ্যামল কান্তি সেন নামে বিলেত ফেরৎ এক ডাক্তারের সাথে। ওরা এক কলেজে পড়ত ও প্রেম ছিল। শ্যামল বিয়ে না করেই বিলেত গেছে। সে হয়ত মহুয়াকে ভালবাসতই না। তখনই কেন মহুয়া তার সাথে চলে যায় নি জানি না। তাকে আঘাত করার জন্যই হয়ত আমাকে বিয়ে করেছিল। সে ফিরে আসা মাত্র—আর তাকে ছাড়েনি। এখানে হয়ত ভয় ছিল থাকার তাই পালিয়ে বিলেত। ও [illegible] সে চার মাসের প্রেগনেন্ট। তাই অফিসিয়ালী সে আমার ছেলে। এ ব্যাপারে আমার ব্যারিস্টারের সাথে কথা বলাই আছে। তুমি যদি প্লিজ আমাকে একটু সাহায্য কর···সুলেখার হাত ধরে ফেলল রমণী মোহন। সুলেখার বুকটায় তার অনেক আগে থেকেই তোলপাড় হচ্ছে। মাথায় ঝা ঝা করে বাজছে ওই নামটা শ্যামল কান্তি

সেন। হঠাৎ খেয়াল হলো এক গ্রামের দুই বন্ধু হয়েও কী করে একজন আর একজনের খবর রাখে না। পরে মনে পড়ল ফড়িংদা হারিয়েছিল বম্বেতে তখন শ্যামলদা ডাক্তারী পড়ছে—আর ফড়িংদা যখন কলকাতায় জমিয়ে বসেছে শ্যামলদা তখন বিলেত। অতএব দুজনের ছাড়াছাড়ি লম্বাদিনের। জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের স্রোতে দুজনের কেউ আর কাছাকাছি আসেনি। চমক্ ভেঙে ভাবনার জাল ভেদ করে বেরিয়ে এল সুলেখার মনটা।

রমণী মোহন প্রশ্ন করলেন মিনতি করার মতোই, কি বল, তুমি আসবে সাহায্য করতে আমাকে? তোমার অফিস ছুটির ব্যবস্থা, তোমার খরচ খরচা সব আমি ব্যবস্থা করব। মহুয়ার কাছ থেকে ছেলেটিকে এনে তোমার কাছে দেব। শুধু ছেলেটাকে তুমি দু'এক মাস কাছে রাখ। মায়ের পক্ষে দুএক মাস সন্তান কাছে না থাকাই তো যথেষ্ট শাস্তি। ওটুকু কষ্ট ওর মুখে আমি দেখতে চাই। আমার বিরুদ্ধে বিনা কারণে যা করেছে—তার জন্য তাকেও শাস্তি পেতে হবে।

—সেটা কি ভগবানের ওপর ছেড়ে দিলেই হত না? শাস্তি দেবার মালিক তো আমরা নয়—সুলেখা বুঝি শান্ত করতে চাইল রমণী মোহনকে।

—চুরি করলে পুলিশ বুঝি ভগবানের ওপর ছেড়ে দেয়? থানায় তিন দিন প্রয়োজন হলে আরও বেশি হাজতে থাকতে হয় না? তারপর বিচার—তাতে জেল হলে—প্রিজনে—দৃঢ় কণ্ঠে বোঝালেন রমণী মোহন।

—কিন্তু ছোট দুধের বাচ্চাকে ম্যানেজ করা সোজা নয়। তার ওপর সে হয়ত বিলেতের দুধ খেতে অভ্যস্ত। হয়ত মায়ের বুকের দুধ খাচ্ছে। তুমি বরং মা ও বাচ্চা দুজনকেই ধরে এক জায়গায় রেখে কিছু একটা কর। নয়ত এটা অমানুষিক ব্যাপার। তুমি বুঝছো না বাচ্চাটা ডল পুতুল নয়।

বোঝাবার চেষ্টা করল সুলেখা। ব্যাপারটা যে সহজ নয় তা ভালভাবেই সে বুঝতে পারছে। আবার ডাঃ শ্যামল সেনের কথাও বিদ্যুতের মতো শক মারছে বুকে। সে আর একটু হলে শ্যামলদার খাঁচায়ও বন্দী হতে পারতো। তখন আফশোসের শেষ থাকত না। তবে শেষের দিকে মনে হয়েছিল শ্যামলদা কোনভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন জড়িয়ে পড়ছে। হয়ত—হয়ত—সবই হয়ত।

শ্যামলদার নিজের মুখে ঘটনা না শুনলে তার কতটুকুই বা কল্পনা দিয়ে ভরাট করা যায়। অনেক শূন্য স্থানে প্রশ্ন চিহ্নই ঝুলছে। কিন্তু রমণী মোহন অর্থাৎ ফাড়ুংদার প্রোপোজালটা খুব মোলায়েম মনে হচ্ছে না। বেশ কিছু-ক্ষণ ভেবে সুলেখা বলল, তুমি যে করেই হোক মা ও ছেলেকে তোমার বাড়িতে তুলে নিয়ে এস। এবার দেখ মা কি করেন। তার মধ্যে হাইকোর্টের ইনজাংশন বার কর যাতে সে রায়ের আগে ছেলেকে বিলেতে না নিয়ে যেতে পারে। ছেলের ওপর তোমার অধিকার আছে—তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে হয়ত ছেলেকে বিলেত নিতে পারবে না। যদি তোমার বাড়ি ছেড়ে মা অর্থাৎ মহুয়া নিজের অপমানে রাগে ক্ষোভে চলে যায়—তাহলে ছেলেকে আমি দেখব। তখন তার সাথে বেবি ফুড বা বিলেতী জিনিসপত্রও থাকবে। আর যে মা তার বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ায় সে তো ছেড়ে যেতে পারবেই না—সেখানে আমাকে প্রয়োজনও হবে না—জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে আত্মতৃপ্তি নিয়ে নিজেই থামল সুলেখা।

কথাগুলো রমণী মোহনের মনে ধরেছে। শুধু ছেলেকে চুরি করলে যে এত রকম প্রব্লেম আসতে পারে তা ভাবেনি সে। সিনেমায় তো সে সব প্রব্লেম থাকে না। বাস্তব ও গল্প যে ভিন্ন তা বুঝলেন রমণী মোহন। এবার প্ল্যান তাহলে সব পাল্টে মাও ছেলেকে—দুজনকেই বাড়িতে তুলতে হবে। ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ভেবে চলল।

—বেশ তাই হবে। সাকসেসফুল হবে কি না জানি না—তবে আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট—ভিলেইনের মতো কণ্ঠস্বরে বললেন রমণী মোহন। চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল। কিন্তু সে গলায় ব্যথার সিক্ততাও ছিল। রেগে মানুষ নিজের চুল ছেঁড়ে—হাসে আবার কাঁদে। প্রতিহিংসার ক্রোধের নিচে চাপা ব্যথাটা শব্দহীন ভাবে জ্বলছে। তার আঁচ পেয়েছে সুলেখা। তাই সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তুমি শান্ত হও, যা করবে ভেবে চিন্তে কর। নিজের জ্বালা মেটাতে কারও ঘরে আগুন লাগিও না—

—বাঃ তুমি আমায় জ্বালিয়ে ছাড়খার করে দিয়ে নন্দনকাননে ফুর্তি করবে আর আমি পাষাণ হয়ে পড়ে থাকব—সে যুগ চলে গেছে সুলেখা। কেউ

আঘাত করলে আগে আরও জোরে আঘাত হান—পরে কে'দে পাড়ার মানুষ জড়ো কর। নয়তো সুবিচার পাবে না। ওই জহরলাল কাশ্মীরটা পুরো নিয়ে যদি ইউ এন ও তে যেত তাহলে কোনদিন পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ হত না। ভারতও অনেক উন্নত হত অনেক বছর আগে। সে সব থাক। আমার বহুদিনের ঈপ্সিত সুযোগ এসছে তাকে ছুঁড়ে ফেলা যায় না। এই সুযোগ ওকে শিক্ষা দেয়ার—আমি দেব—দৃঢ়কণ্ঠে বললেন।

—বেশ—তুমি যা ভাল বুঝবে কর—এটা তোমার জীবন। তবে আমাকে প্রয়োজন হলে জানিও, খুব ঝঞ্ঝাট ও আইনের বাইরে কাজ না হলে আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য করব—বিনীত কণ্ঠে সুলেখা বলল।

—চল—তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি—নিজেকে সংযত করে সহজভাবে বললেন রমণী মোহন।

—চল। তবে আমায় সব জানিও কিন্তু—

—নিশ্চয়ই জানাব।

—দু'জনে বাইরে বেরিয়ে এল। অনেক ট্যাক্সির ভীড়। সুলেখা বলল, তোমার হাতে অনেক কাজ—তুমি বরং সে সব ঠিক কর—আমি একটা ট্যাক্সি নিয়েই ফিরছি—

—বেশ—তাই যাও—সুলেখার পিঠ চাপড়ে বিদায় নিলেন ফড়িংদা।

প্ল্যানটা পাল্টে যাওয়ায় সমস্যা আরও বেড়ে গেল। বাঘের বাচ্চা চুরি করা আর বাঘিনীসুদ্ধ ঘরে তোলা খুব সহজ নয়। হাতে সময় তো একটা দিন। শ্যামল কান্তি সেনের সঙ্গে নতুন ঘর বসিয়েছে মহুয়া বিলেতে তা আর কেউ না জানলেও তার বাড়ির লোক নিশ্চয়ই জানে। এ সময় নতুন করে শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে গেলেও সন্দেহ হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। হঠাৎ মনে পড়ল মহুয়ার কাকার মেয়ে নূপুরের কথা। নূপুরের স্বামী ব্যবসায়ী এবং এখনও রমণীবাবুর সঙ্গে হৃদ্যতা আছে। ব্যবসার ব্যাপারে

প্রায়ই যাতায়াত হয়। নূপুর হাউস ওয়াইফ দুটি বাচ্চাই বেশ বড় হয়ে গেছে। স্বামী ভবেশ চৌধুরী কারো সাতে পাঁচে থাবেন না। ভদ্র ও সৎ ব্যবসা করেন।

রমণী মোহন এলেন ভবেশবাবুর বাড়িতে। এভাবে সন্ধের পর স্বয়ং রমণীবাবু তার দরজায় আঘাত করবেন এ দেখে অবাক হলেন ভবেশবাবু। জ্যাঠামশাইর মৃত্যু সংবাদ পেয়েছে নূপুর। একবার ঘুরেও এসেছে সেখান থেকে। ভবেশবাবু কাজকর্মের ভিড় ঠেলে আর এগুতে পারেননি।

সংক্ষেপে ভবেশবাবুকে রমণী মোহন সবই জানালেন। তার মনের ইচ্ছাটাও ব্যক্ত করলেন। প্রথমটা আচমকা হোঁচট খেলেও টাল সামলে নিয়ে ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখলেন ও বুঝলেন।—আপনার স্ত্রী আপনার সন্তান নিয়ে পালিয়ে গেলে আপনি কি করতেন বলুন? প্রশ্ন করলেন রমণীবাবু।

—আমি? স্ত্রীর দিকে একগাল হেসে বললেন, বউকে পাগলা গারদে ভর্তি করে দিতুম।

—বেশ আমার বাড়িটাই সেই গারদ—তার নিজেরই বাড়ি সেটা এখনও কেননা আমরা ডিভোর্স'ড্ তো নয়। বোঝাবার চেষ্টা করলেন রমণীবাবু।

—তা আমরা কি করতে পারি? চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করল নূপুর।

—তোমাদের কাজ তাদের এয়ার পোর্ট থেকে তুলে আমার বাড়িতে নিয়ে আসা। বাস—এইটুকুই। আর তা করতে হলে তার বাড়িতে ফোনে জানিয়ে দেয়া যে এই কর্মব্যস্ততায় তোমরাই এ কাজটা করবে। দাদা বরং অন্য দিকটা দেখুন।

—কবে কখন এয়ার পোর্টে যেতে হবে? প্রশ্ন করলেন ভবেশবাবু। তিনি সমস্ত ব্যাপারটা ঝালিয়ে নিতে লাগলেন। খুব সহজ তো নয়।

—তা আপনাদের আমি জানাব। তবে মউএর বাড়ি ফোন করেও জেনে নিতে পারেন। যদি মউ আমাদের আপনার ওখানে না নিয়ে যেতে বলে—আর্থৎ সে যদি যেতে না চায়?

—তবু তাকে আনতে হবে। বলবে আমি অসুস্থ—অথবা বলবে, সে কি! স্বামীর সঙ্গে দেখা করবি না এতদিন পরে এসেছিস। কেননা তোমরা

অন্যের মাধ্যমে শুনলেও তোমরা তো আর জান না যে সত্যি সে পালিয়েছে। ভাবটা এমন করতে হবে যে তোমরা কিছুই জান না।···বুঝিয়ে গেলেন রমণী মোহন।

—কিন্তু ভবিষ্যতে তো সে ঠিকই জানবে। গম্ভীর গলায় বললেন ভবেশবাবু।

—আমার ওপর আপনাদের একটু দরদ থাকা উচিৎ নয় কি? যে মেয়ে এমন ভাবে উটকো হয়ে যেতে পারে—তার কি একটু শাস্তি পাওয়া উচিৎ নয়?

—কি শাস্তি?

—এই মাস তিনেক নতুন স্বামী ছেড়ে পুরনো বন্ধুর কাছে থাকা। সেটাই যথেষ্ট মানসিক শাস্তি। শুধু কি জেলেই মানুষের শাস্তি হয়? যারা জেলে আছে তারা তো সুখেই আছে। অনেকের মধ্যে হাসিখুশি ভাবে একই জীবন-যাত্রায় জীবন কাটাচ্ছে। জেলের বাইরে যারা আছে তাদের অনেকের শাস্তি অনেক বেশি। যেমন গত পাঁচ বছর আমি নিজের ফাঁসির দড়িটি নিয়ে নিজেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। স্বয়ং ভগবান যীশুরও এতদিন ক্রুশ টানতে হয়নি। এ কী কম শাস্তি। এমন অসংখ্য মানুষের জীবন ধিক ধিক করে জ্বলছে শুধু অন্য মানুষদের জন্য। পৃথিবীতে সবসময় জনআগুন জ্বলছে ফরেস্ট ফায়ারের মতো—সবাই সবাইকে জ্বলতে সাহায্য করছি। ওই জ্বলতে জ্বলতে শুরু আর জ্বলে বা ঢলে পড়ে শেষ। বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ মুছে নিলেন রমণীবাবু। গলাটাও তার ধরে এসেছে।

আজ ফাঁড়ুদা ওরফে রমণী মোহন পালের বাড়িতে পার্টি। আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই। যে-সব বন্ধু বান্ধবরা ও ব্যবসা মহলের বন্ধু ও রমণী-বাবুর পার্সন্যাল লাইফ কমই জানেন নিমন্ত্রিত বেশির ভাগ তারাই। সবাইকে জানিয়েছেন তার ছেলে হবার জন্যই পার্টি। গত বার তের দিন রমণীবাবু বাড়ি থেকেই আপিস চালিয়েছেন। ব্যবসার কো-পার্টনার ও ম্যানেজার

শম্ভুদাস গড়াই সব ব্যাপার ফোনেই জানিয়েছেন।

যত শক্ত হবার কথা ভেবেছিল রমণী মোহন, আদৌ তা হয়নি। এয়ার পোর্টে তিনি নিজেই গিয়েছিলেন। দূরে দাঁড়িয়েছিলেন ভবেশবাবু ও নূপুর। সেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স। আশ্চর্য তাদের কাছেও আসতে হয়নি। চোখের ইংগিতে তাদের চলে যেতে বলে রমণী মোহনই ছেলে ও মহুয়াকে নিয়ে তার বাড়িতে নিজের গাড়িতে চলে এল। শুধু একটু হাসি কয়েকটি মিষ্টি কথা, শ্বশুর মশাইর গঙ্গাপ্রাপ্তিতে দুঃখ প্রকাশ ও সর্বোপরি কেউ না আসতে পারায় তাকে কাজকর্ম ফেলে চলে আসতে হয়েছে সেই অনুযোগ। মহুয়া রমণী মোহনের আসল রূপ কখনই দেখার সুযোগ পায়নি। ভেবেছে গোবেচারা সরল সুবোধ রমণী মোহনের কিছুই গায় লাগে না। ব্যথাকষ্ট সুখদুঃখ রাগ অনুরাগ মান অভিমান এসব তো এ মানুষটার মধ্যে দেখেনি কখনও মহুয়া। মহুয়া মনে ভেবেছে যে একই বাড়িতে অযাচিত ঝুলের মতো পাঁচবছর ঝুলেছে— হঠাৎ তাকে নিয়ে টানাটানি করবে মালিক তা হতেই পারে না। আবার ভেবেছে হয়ত এ মানুষটা জানেই না সে কেন কার কাছে বিলেত গেছে। কিন্তু সুলেখার কোলে বাচ্চাটাকে দিতেই ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল বুকটা হঠাৎ। কিন্তু রমণী মোহন বলেছেন এ আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় —বাচ্চাটাকে দেখাশোনায় সাহায্য করবেন বলে অনুরোধ করে নিয়ে এসেছি।

পিতৃবিয়োগের ব্যথায় তখন মুহ্যমান ছিল মহুয়া। সেই আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু চিন্তা করার সুযোগ ছিল তার মধ্যে বিশেষ দুশ্চিন্তার মেঘ চোখে পড়েনি। বিস্মিত ভাবটাও দমদমের হইহুল্লোড়ের মধ্যে মূর্ছা গেল। বোধহয় মনে মনে একটু অনুকম্পা ও লজ্জাই হলো বেচারা প্রাক্তন স্বামীর কথা ভেবে। স্কটল্যাণ্ডে কয়েকমাস থেকেই মহুয়ার ধবধবে রং রক্তাভ আবীর ঢালা হয়েছে। প্রথম বাচ্চার পর রমণীরা নাকি আরও রমণীয় হয়ে ওঠেন। তখন বুঝি স্বভাব লাজুকতার আড়ষ্ট ভাবটা মিলিয়ে যায়। মহুয়া মরুভূমির যৌবনভরা রোদের মতোই খাঁ খাঁ করছিল। তেমন করে দেখতে পেলে নিঃশব্দ দহন হয়। দুচার জন তেমন পুরুষ ছাড়া কেউ দেখছিল না অবশ্য। মহুয়ার বেদনাতুর আরক্তিম চোখদুটোতে তার ব্যথা থাকলেও দর্শকের কাছে মারণাস্ত্র। একসাইজ

কাস্টমস হেলথ পুলিস করেও রমণীমোহন ভাবছিলেন 'মা দুর্গার ওই দশহাতের দশঅস্ত্রের অর্থ কি ? পার্থিব সিংহ, সর্প ইত্যাদি থাকতেও এক মাকে যুদ্ধে নামান হলো কেন ? অসুর কি এতই শক্তিশালী যে স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবও সেখানে গেলেন না। কই অসুরকে তো মনে হয় না সে হেরে গিয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এ কোন শক্তি মা দুর্গার—অসুরই বা কি ? ভুল ব্যাখ্যা বুঝি এল তার মনে। তার মনে হলো পুরুষের পৌরুষ ওই অসুর আর ধরিত্রীর বা প্রকৃতির অস্ত্র ও মা দুর্গার হাতের দশঅস্ত্র। পুরুষ আর প্রকৃতির এই যুদ্ধ হয়ত সৃষ্টির কল্পনা। মহুয়ার দৃষ্টি, তার চলন বলন ভাবভঙ্গি এ সবই যেন এক একখানি মারণাস্ত্র। কোনোদিন এভাবে তিনি দেখেননি মহুয়াকে, এভাবে কখনও ভাবেননি। সে সব ভাবনা জলাঞ্জলি দিয়ে ভেতরের আগুনের ঢাকনা বন্ধ রেখে মিষ্টি মধুর প্রেমজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাল আছ তো ?"

—ওখানে মন্দ কাটবে কেন—বাবার জন্য···। কেঁদে উঠেছে মহুয়া। পেছনের সিটে মহুয়া ও সুলেখা। ছেলেকে বোতলের দুধ খাওয়াচ্ছিল। —দুঃখ কর না মউ—বাবা মা কারোরই থাকেন না। হয়ত শেষ সময় দেখতে পেলে না সেটাই বুকে বাজছে।

অনেকদিন এত মোলায়েম কণ্ঠের স্নেহজড়ানো কথা শোনেনি মহুয়া। আসলে 'আলালের ঘরের দুলালী—মাটিতেই তার পা পড়েনি'—তাই বাস্তব কী তাই সে জানে না। গানে কবিতায় সিনেমায় উপন্যাসে ভেসে চলেছে। বাবা দাদার উপদেশাবলি গীতার মতোই বৃদ্ধ বয়সের জন্য রেখেছিল। তারা যেন সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র পাঠ করতেন। কান দিয়ে ঢুকলেই মস্তিষ্কে সব পেঁছায় না। লস অ্যাঞ্জেলিসের ব্যস্ত রাস্তার ধারে নয়ত শত লক্ষ মানুষ সারারাত পুলিস আর ফায়ার ইঞ্জিনের সাইরেনের মধ্যে ঘুমোয় কী করে ? মহুয়া সেই ভাবেই আপনমনে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে কখন পথ হারিয়ে গেছে। চারদিকের কল্পনাজালে বিভ্রান্ত হয়ে একসময়ের ভালবাসাটাকেই বড় করে দেখেছে। চলার পথে মানুষ কতই স্বখাত পুকুরে ডুব দেয় আবার প্রাণপণ চেষ্টায় বেঁচে ৱতে নতুন করে চলতে থাকে বাস্তবের সাথে হাত মিলিয়ে। তা

না পারলে অনেকেরই সলিলসমাধি ঘটে। কিন্তু কে বোঝাবে মহুয়াকে। ও মশালে হাত দিলে হাত পোড়ে প্রান যায়—তার থেকে তফাতে থেকে যতটুকু রূপ রস গন্ধ চোখের জিহ্বায় পাওয়া যায় তাই ভাল—ভেবেছে যুবককুল। মেয়েরা ঈর্ষাহিংসা যারা করেছে—নিজেরা জ্বলেছে। যারা করেনি তারা পার্সোন্যাল ব্যাপারটায় ইণ্টারফেয়ার করত না। সব মিলিয়ে একক ভেলায় ভেসেছে মহুয়া তন্ময় হয়ে। সেদিন ঘুনাক্ষরে আঁচ করতে পারলে কি ভারতের মাটিতে পা ফেলত সে? এ বড় কাঠিন দেশ। মশামাছি—অসংখ্য জীবজন্তু অসুখ বিসুখ ব্যথা দুঃখ দারিদ্র্য সব জয় করে বেঁচে থাকতে হয়। কোনো মানুষ সহজ নেই এখানে। যে সহজ তার আবাশ নেই। সবাইর এখানে অনেক হাত—অনেক পা—অনেক মাথা—অনেক চোখ। তাই তুমি সহজ হলেও রমণী মোহন খুব সহজ নয়।

—কি হলো, এখানে কেন—আমি বাড়ি যাব তো। ড্রাইভ এ গাড়ি ঢুকতেই আর্ত চিৎকারের মতো বলে উঠেছিল মহুয়া।

—নিশ্চয়ই যাবে, অত দূরের জার্নি করে এসছ একটু বিশ্রাম নিয়ে যাও। করুণা বিগলিত কণ্ঠে বললেন রমণীমোহন। মহুয়া এবার যেন একটু সম্বিত ফিরে পেল। ততক্ষণে সুলেখা ছেলেকে নিয়ে মোটামুটি ছুটেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। 'বাবাঃ যা রোদ, ছেলেটার মাথায় না লাগে' যেতে যেতে বলল সুলেখা। রমণী মোহন তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে সরল বালকের মতোই বললেন, এটা কি তোমার বাড়ি নয়?

—না—গম্ভীর হয়ে উঠল মহুয়া।

—রাগ করছ কেন মউ? এ বাড়িতে তুমি আমার স্ত্রী হয়ে পাঁচ বছর কাটিয়েছ আর নয় এই ছুটিটা কাটালে—তাতে আমারও সম্মান বাঁচবে আর তোমারও কোন ক্ষতি হবে না।—শান্তভাবেই বোঝাতে চাইলেন রমণী মোহন।

—না আমাকে বাড়ি পেঁাছে দিন।—কঠিন স্বরে বলল মহুয়া।

—দেব বাড়ি পেঁাছে। আমি কি তোমাকে কোনোদিন এ বাড়িতে আটকে রেখেছি? চিরদিনই তো তুমি স্বাধীন ভাবে থেকেছ। একটু অন্ততঃ

পরিষ্কার হয়ে নাও। তোমার বাড়িতে মানুষ গিজগিজ করছে। এখানে বাচ্চাটার বিশ্রাম হবে। ওখানে গেলে প্রচণ্ড কষ্ট হবে।—স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে করুণা ধরে না।

মুখখানা পাষাণ হয়ে গেল মহুয়ার।

—আপনার কোনো দুরভিসন্ধি আছে মনে হচ্ছে—সে বলে ফেলল। তার বুকটা ধড়ফড় করছে তখন। সন্দেহের উৎকণ্ঠায় মনের আকাশ ঢেকে যাচ্ছে।

—আমার কোনোও দুরভিসন্ধি নেই। আমার কথা শোন। যদি না শোন তবে নিজেই কষ্ট পাবে। গাড়ি থেকে নেমে এস—বলে বেরিয়ে পড়লেন রমণী মোহন। ততক্ষণে বাড়ির কর্মচারী তিনজন ও মালি ছুটে এল। —এই মালগুলো নামিয়ে মেম সাহেবের ঘরে রেখে দে।

হুকুম করে ভেতরে ঢুকে গেলেন। মহুয়া তখনও গাড়ির মধ্যে।

লম্বা জার্নির পরিশ্রমে সময়ের হঠাৎ পরিবর্তনে মহুয়া ক্লান্ত ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলসাল তার সমস্ত দেহ জুড়ে। একটা প্রশ্নচিহ্ন ফাঁসির দড়ির মতো তার চোখের সামনে ঝপাং করে পড়ল। 'আমি কি বন্দী? কিন্তু কেন?' মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। তবুও নিজেকে সান্ত্বনা দিতে দিতে নামল। ভাবল, না ট্র্যাপ নাও হতে পারে। তবুও মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। উপায় নেই। ছেলে ও যাবতীয় মালপত্র ভেতরে চলে গেছে। এমনকি ভ্যানিটি ব্যাগটাও। ধীর পদক্ষেপে নিজের ঘরে ঢুকে সে আরও বিস্মিত হয়ে গেল। বিলেত যাবার সময় যে সব পোষাক পরিচ্ছদ প্রসাধন নিজের বাড়িতে রেখে গিয়েছিল তা সবই আগের মতো করে সাজান। বেড়েছে ছেলের কোট ও ছেলের অফুরন্ত খেলনা। মাথাটা বুঝি আবার খারাপ হবে। ভেবে মাথাটা দুহাত দিয়ে ধরল মহুয়া। সে ঘরে কোট থাকলেও ছেলে নেই। 'বাবু' চিৎকার করে উঠল মহুয়া।

—মউ, ছেলে এ ঘরে আছে, তোমার কোনো চিন্তা নেই।

পাশের ঘর থেকে জানাল সুলেখা। মহুয়া পাশের ছোট বেডরুমে ঢুকে আরও অবাক। সেখানে সুলেখার খাট ইত্যাদি ও সেঘরেও আর একটি কোট

সাজান রয়েছে।

—বাবু—নাম দিয়েছ বুঝি? বাঃ খুব মিষ্টি নাম। ওকে আমিই দেখব—তোমার যতদিন কাজকর্ম শেষ না হয়। তুমি চান করে খেয়ে একটু বিশ্রাম কর—আমারও বাচ্চা হয়েছে একসময়। তোমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কতদিন পরে স্বামীর ঘরে ফিরে এসেছ। যতই শোক বিয়োগ ব্যথা থাক—স্বামীর বুকে মাথা রাখলে সব হাল্কা হয়ে যায়।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। যজ্ঞের আগুন জ্বলছে মহুয়ার বুকে—তার মধ্যে গব্যঘৃত। দেহের সমস্ত রক্তবিন্দু বুঝি জমে যাচ্ছিল মহুয়ার। ব্যাপারটা বুঝল সুলেখা। ভেতরে তার ঘৃণা উপচে পড়ছে। আবার দরদও হচ্ছে বেচারা চিতাবাঘিনী মানুষ খেলেও—গর্তে পড়ে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে।

সুলেখা গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মহুয়ার দিকে। ধীরে ধীরে মনে হলো মহুয়ার সমস্ত শরীরটা স্ফীত হয়ে উঠছে। দৃষ্টি কেমন বিবাগী উদাসীন অথচ জ্বলন্ত। সুলেখা মহুয়ার মনের এসরেণু দেখতে পাচ্ছিল দৃষ্টির কিরণে। আবার অনুরোধ করে বলল, তুমি যাও—তৈরি হয়ে নাও, বাপের বাড়ির সবাই উদগ্রীব হয়ে আছে—

মহুয়া জবাব দিল না। বেশ কিছুক্ষণ রিং-এর পাগলা মোষের মতো স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার নিজের ঘরে এসে চুপ করে বসে রইল মহুয়া। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর মহুয়া যেন পাথর হয়ে গেছে নিজেই বুঝতে পারছে সে যেন কেমন আলাদা হয়ে যাচ্ছে সবকিছু থেকে। তার মাথায় চিন্তাগুলো ঢুকে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে—তার উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। এ যেন থিয়েটার দেখছে সে। সে যেন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে। কোনো কিছুর কোনো অর্থই তার বন্ধ ব্রেনে ঢুকছে না। ভয়ে তার প্রাণ শুকিয়ে গেল। নিজে ডাক্তার—তার মা স্কিজোফ্রেনিয়াতেই পাগলা গারদে মারা গেছেন। অতি আপন আত্মীয় ছাড়া তা কেউ জানত না। বহুদিন আগেকার সে কথা আজ অনেকের ভুলেও মনে পড়ে না। মহুয়ার নিজেরও ডিপ্রেশনের জন্য দুবার চিকিৎসা হয়েছে। একবার ডাক্তারি পড়তে

আর একবার বিয়ের পরেই। সেই ভয় আরও পেয়ে বসল মহুয়াকে।

নিজেকে জোর করে টেনে তুলে বাথরুমে নিয়ে গেল মহুয়া। কিন্তু এ শরীর যেন তার নয়—এ যেন সে নয়। এ ক্ষণকালের তোলপাড়েই তার মনে হলো সে ছিন্নভিন্ন হয়ে শেষ হয়ে গেছে। মনের কোনো কনসেনট্রেশন নেই। কিছুই ভাববার ক্ষমতা নেই। শাওয়ারের জলটাও যেন নিজের দেহে পড়ছে না। সমস্ত দেহমন পাগল পাগল করছে। অবশ দেহটাকে ধুয়ে মুছে শীতল ও পরিচ্ছন্ন করল। ঘরে এসে হঠাৎ নজরে পড়ল তার ও রমণী মোহনের বড় বড় দুখানি ছবি ঝলমল করছে।

—কই গো মউ—রেডি তো—চল, চট করে তোমাদের বাড়ি ঘুরে আসি। কী মিষ্টি মোলায়েম গলা। চমকে উঠল মহুয়া। মৌ—তাকে তো কখনও কিছু বলে সম্বোধন করেনি রমণী মোহন। চোখ কান সবই বিট্রে করছে আজ। এ কি স্টেজ রে বাবা। নিজেও কত থিয়েটার করেছে সে—কিন্তু এমন অস্বাভাবিক অভিনয় তো কানে বাজেনি কোনোদিন।

রেডি হয়ে বেরিয়ে এল মহুয়া। "বাবু"—বলে অক্রতেই রমণী মোহন বাধা দিল।

—লক্ষ্মীটি ওইটুকু ছোট্ট, এই পড়ন্ত রোদে—এই ধুলোভরা কলকাতায় —তাছাড়া এত লম্বা জার্নির পর—ও আজ থাক—কালকে ওকে নিয়ে যাবে।

কাতর হয়ে বললেন রমণী মোহন।

সুদূরের এক দৃষ্টি মেলে তাকাল মহুয়া। কই রমণী মোহনের মুখে কোনো অভিনয়ের চিহ্নও নেই। সরল সহজ কপটতাহীন।

—চল—দেরী কর না লক্ষ্মীটি। একটু ও ব্যাচারাকে বিশ্রাম নিতে দাও। আজ চট করে ঘুরে আসি। কাল বরং একটু বেশি সময় থাকা যাবে। তাছাড়া চারদিনে তোমাকেও কাজকর্ম করতে হবে—তার বাজার যোগার সবই তো করতে হবে। চল।

মহুয়ার হাত ধরে ফেলল রমণী মোহন। হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতেই কৌতুক স্বরে নিচু গলায় রমণীবাবু বললেন, অনেক দিন পরে দেখা তো— লোভ সামলাতে পারিনি। বাড়িতে লোকজন আছে তাদের সামনে ঝগড়া

বিরোধ করতে নেই। এই কয়েকটা দিন একটু নয় সহ্য করলে, আমিও তো পাঁচবছর করেছি, তাই না? অনেক সময় অভিনয় করেই মানুষকে জীবনটা কাটিয়ে দিতে হয়। ভাল না লাগলেই যদি ছাড়াছাড়ি হওয়াটা উচিৎ হত তাহলে দুনিয়ার ডিকশনারি থেকে ম্যারেজ, অর্ধাঙ্গিনী, দম্পতি এসব বহুযুগ আগেই উঠে যেত। সব মানুষকেই ভালো অভিনেতা হতে হয়—নয়ত জীবনে সে আমার মতোই পরাজিত। তাকে জ্বলেপুড়ে ছারখার হতে হয়। নয়ত দুর্বাদলের একটি হয়ে কোনোরকম বেঁচে থাকতে হয়। প্লিজ—এই কয়েকটা সপ্তাহ আমাকে অপমান করে ছোট কর না।

ব্যথাভরা দুটো চোখ মেলে চেয়ে রইলেন রমণী মোহন। হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল মহুয়া। এ কোন রমণী মোহন? এ কে কথা বলছে? মুখে কিছু না বলে বেরিয়ে এল মহুয়া।

পথে চলতে চলতে প্রেম উছলে পড়ল রমণী মোহনের। এত প্রেম এত বছর কোথায় কোন মেরুতে জমা ছিল মহুয়া তার হদিশ খুঁজছিল। অসারতার আবরণ তার খসে পড়েছিল। শহর কলকাতায় কাব্য এমন উপচে পড়ে তা কি সে স্কটল্যাণ্ডের জমাট বরফের নিচে ভুলে গিয়েছিল। এখানে খুঁটের গায়ে ভাগ্যরেখার চিহ্ন রোদে ঝলসায়। এখানের ফুটপথে অসংখ্য পুষ্পশয্যার সৃষ্টি হয় প্রতি রাত্রে। এখানকার ডাস্টবিনে খাদ্য প্রাণ ও ভিটামিনের অভাব নেই। এক পেনিতে রাধিকার ফোলান ফুঁচকার মধ্যে পটেটো ও অমৃত রূপ সুধার মতো শালপাতার ওপর পড়ে। এ রসেভরা রসগোল্লা শহর কলকাতা। এখানে মানুষ বিজানু জীবাণু ম্লাই সব অতিপ্রেমে জড়াজড়ি করে আদিম সৃষ্টির রূপভোগ ও রসাস্বাদন করে। প্রেমের বন্যায় তূর্ণ গতিতে ভাসিয়ে নেয় রমণী মোহন। মহুয়া জানলার দিকে তাকিয়ে রুদ্ধশ্বাসব্যথা হজম করে। 'কতদিন তোমায় দেখিনি। এমন সুন্দর ছেলেটা হলো তাও তুমি জানালে না। বড় কষ্ট হচ্ছে মৌ'। অথচ মুখে ব্যথা ছাড়া অন্য চিহ্নও নেই। একি প্রতিহিংসা? পরিহাস? না আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে ভাবে মহুয়া। এবার উপায়? শ্যামলকে কি জানাব? তার তো আসা অসম্ভব। কে বাঁচাবে আমাকে এই অদৃশ্য শব্দহীন দহন থেকে? কে বিশ্বাস করবে?

অন্যের অট্টহাসিতে যে আমিই পাগল হয়ে যাব। 'পাগল'—তাই তো হয়েছিলাম দুবার—মাও তো…আর ভাবতে পারে না মহুয়া। বিস্ফারিত নির্নিমেষ চোখে বারবার সে দেখছিল রমণী মোহনকে। এমন করে পাঁচবছরেও সে তার বিবাহিত স্বামীকে চেয়ে দেখেনি।

রমণী মোহনের আনন্দের সীমা ছিল না। নেকড়ে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত করেছে অদৃশ্য নখ ও দাঁত দিয়ে। সেই নেকড়ে এখন তারই খাচার বন্দী ফুলে ফুলে ওঠা মার্জার। "বাঃ—দারুণ আরাম। কতদিন পরে তোমার কাছে পেলাম।" মধুর হাসির উচ্ছলতায় অবাক হয়ে তাকাল মহুয়া।

মামার আগে রংটা পালটাল রমণী মোহন। মুখটা গম্ভীর করে বলল, মনে থাকে যেন—এই কলকাতায় কয়েক সপ্তাহ তুমি অভিনয় করতে এসেছ। নিজের ও তোমার ছেলের মঙ্গল যদি চাও—ঝামেলায় যদি পড়তে না চাও তবে অভিনয় করে যাবে—যে তুমি এখনও আমার অত্যন্ত প্রিয় ও ফেইথফুল ওয়াইফ। ভয় দেখাচ্ছি না—অনুরোধ করছি। আর যদি নিজের ক্ষতি নিজে চাও তবে যা খুশি করো।

এবার মহুয়া-দেখেছিল প্রতিহিংসার জলজলে দুটো চোখ। অপমানে, অভিমানে, রাগে ক্ষোভে ব্যথায় দুশ্চিন্তায় তার দেহ কেঁপে উঠেছিল।

—'আমি কোনো ক্ষতি করব না তোমার—তুমিও তার চেষ্টা করো না। এখনও তুমি লিগ্যালি আমার স্ত্রী। ছেলেও আমার—স্মিত হাসি দিয়ে ক্রুর চোখে তাকাল রমণী মোহন। আঁৎকে উঠেছিল মহুয়া। অস্ফুটে তাচ্ছিল্য পূর্ণ স্বরে মুখ থেকে বেরিয়ে এল, তোমার ছেলে?

—হ্যাঁ আমার। তুমি যখন স্কটল্যান্ডে আমায় ছেড়ে পালিয়ে গেলে তখন তুমি চারমাসের অন্তঃসত্ত্বা। সন্তান তো হিন্দুভারতে স্বামীরই হয়। তা নইলে কি আমার সাথে আগেই তোমার সেপারেটেড হওয়ার কথা নয়? সমাজ সংস্কার ধর্ম মনুষ্যত্ব এ যাদের গোল্লায় যায়—তাদের বিচারের জন্য আইন আছে। কোর্ট কাছারি করার ইচ্ছা আমার নেই। ব্যবসায়ী—কোনোরকম ব্যবসা করে অন্ন জুটছে। অ্যাডভার্স পাবলিসিটি হলে ব্যবসা উড়ে যাবে—বৌ ভাগিয়ে খেতে হবে।

টকটকে গলিত লোহা মহুয়া—শীতের নায়গ্রার মতো স্তব্ধ। কোনোরকম তির তির করে জীবন প্রবাহ চলছে। ভেতরে ভিসুভিয়াস তোলপাড় করলেও—কিসের অভাবে তার উদ্গিরণ মৃতের মতো ফ্রোজেন হয়ে আছে। জীবনমৃত্যুর মাঝখানে মহুয়া একটা প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি মেলে থমকে রইল।

—"এস—ডার্লিং—ডাকলেন রমণী মোহন।"

মহুয়া উদাসভাবেই নিজের বাড়িতে ঢুকল। নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে রইল অনেকক্ষণ। সবাই ভাবল পিতৃবিয়োগে শকড্। কিন্তু সব মিলিয়ে মহুয়া তখন জড় পদার্থ হয়ে গেছে। অনেকের অনেক প্রশ্নেও সে মূক বধির। রমণীমোহনের খেলার জলপুতুলটি যেন। আর রমণীমোহনের কথার ফোয়ারায় সবই মানিয়ে গেল। প্রতি কথায় বউয়ের ওপর করুণা—তীব্র ভালবাসা—স্নেহ অভিমান, রাগ অনুরাগ কিছু একটা মিশিয়ে ছিল। সবাই অনুসন্ধিৎসু ও অবাক হয়েছিল স্বামীস্ত্রীর এই নতুন অসম্ভব মিলনে। কেউ কেউ সুখী হয়েছে। কেউ ভেবেছে ছেলে হওয়ায় এই আনন্দ। 'বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত কী আর মনের মিল হয়।' কে একজন বলে বসলেন।

অভিনয় বাস্তবকেও বাস্তবিক করে তোলে—সুন্দর করে, পরিস্ফুট করে তোলে। কিন্তু মহুয়ার বুকে সে কপটতার প্রতিটি বিন্দু স্ফুলিঙ্গের মতো বিঁধছিল। তার চামড়ায় ক্ষণে ক্ষণে ছ্যাকা লাগছিল জ্বলন্ত শিকের অজানা ভয়ে শিউড়ে উঠেছে মাঝে মাঝে। কিন্তু এতক্ষণ পরে সে বুঝেছিল রমণী মোহনের চলন্ত ড্রামায় তাকেও চলন্ত হয়ে উঠতে হবে নয়ত মাথাঘুরে থুবরে পড়বে। কিন্তু কিভাবে কেন এই ঘূর্ণির মধ্যে তাকে ঝাঁপ দিতে হবে তা বুঝে উঠতে পারল না মহুয়া।

রাত দশটা নাগাদ রমণীবাবু ও মহুয়া ফিরে এল। আসার পুরোপথটাও ভালবাসার প্রস্ফুটিত ফুলে ভরিয়ে দিলেন রমণীবাবু। কয়েকবার মহুয়ার হাতও ধরেছেন। মৌ বলে সম্বোধনও করেছেন। নির্বাক—বার বার বিস্ময়ের ঝড়—মহুয়া হতবিহ্বল। চুপ। দরজায় পুলিস ডিউটি দেখে আঁৎকে উঠেছিল মহুয়া, পুলিস? কেন—কি ব্যাপার?

—বাঃ আমার ছেলেকে পাহাড়া দেবে না? তোমার চোখে আমি সাধারণ

স্বামী কিন্তু আমার ছেলে তো অসাধারণ তাই না? এ কলকাতা শহর—বিশ্বাস কি? যদি বিলেতি শিশু চুরি হয়ে যায়? তাই সরকার পুলিস গার্ড দিয়েছে।

মহুয়াকে নামিয়ে দিয়ে সুলেখাকে ডেকে পাঠালেন রমণী মোহন। সুলেখা বাচ্চার সব মহুয়াকে বুঝিয়ে দিয়ে বলল, আজ যাই ভাই—আবার কালকে তোমাকে সাহায্য করতে আসব। আমার মেয়েটা মায়ের জন্য ছটফট করছে এখন।

—আপনাকে আসতে হবে না—আমার বাচ্চা আমিই দেখব।···ঝাঁঝিয়ে উঠল মহুয়া। এতক্ষণের আগুন সে বুঝি নেভাতে চাইছে।

হেসে উঠল সুলেখা। বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, তুমি এই কটা দিনের জন্য কলকাতা এসেছ—নিজে ডাক্তার—তুমি এই ন্যাপি নিয়ে পড়ে থাকবে নাকি সারাটা দিন। তা হয় না বোন। তোমাকে সাহায্য করব আমি। চেয়ে দেখ ছেলেটার দিকে কি সুন্দর, ঘুমুচ্ছে। এই শহরে ওদের নিয়ে ছুটতে নেই—অসুখ করবে। কথা না শুনলে নিজেই কষ্ট পাবে।"

সুলেখা যেন প্রফেশনাল বেবি-সিটার। সুলেখার খারাপ লাগছে মনে কিন্তু উপায় নেই। ফাড়ুদার বুক ছুঁয়ে শপথ করেছে সে বেবিসিটার ছাড়া কিছু নয়। সুলেখার রাগও ছিল শ্যামলদার ওপর আবার ভালবাসাও ছিল। তাই ছেলেকে নিজের ছেলের মতোই যত্ন করতে তার বাধেনি। আবার মহুয়া একটু কষ্ট পেয়ে বাস্তব জগৎটাকে চিনুক—অন্যের ব্যথা বেদনাকে উপলব্ধি করুক তাও চেয়েছে। তবুও মনের গভীরে মহুয়ার জন্য একটা করুণা সে ফিল করছে।

সুলেখাকে পৌঁছে দিয়ে এলেন রমণী মোহন নিজেই। ড্রাইভার তার ম্যানেজারের গাড়ি চালাচ্ছে। রমণীবাবুর ছুটি। সে তার নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত। অনেক সময় অনেক মানুষের তাই হয়। দশ পনেরো বছর একটানা জীবনের ঘানি ঘোরাবার পর হঠাৎ থমকে নিজের ও নিজের সংসারের দিকে দৃষ্টি মেলে তাকায়। প্রতিদিন শতবার দেখেও যা দেখেনি তাই দেখতে পায়। ছেলে মেয়ে স্ত্রী—ঠিক সে যেমনটি দেখে এসেছিল ঠিক কেন

তেমনটি নয়। সবকিছু এ'কে বে'কে গেছে। কারও বা সম্বিত হয় কোনো অঘটনে। হয়ত ছেলে পরীক্ষায় ফেল নয়ত হঠাৎ চোখে পড়ল অত্যন্ত বিশ্বস্ত স্ত্রী পরপুরুষের সাথে আত্মতৃপ্তিতে ঝাপাচ্ছে। তখন বুঝতে পারে নিজে যে তপস্যায় মত্ত হয়ে ছিল তা ভুল—ভুল ভুল। তখন কারও কারও নতুন করে সাজাবার সময় থাকে—কারও টু লেট। যার টু লেট্—সে স্বভাব উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। দুনিয়া! রমণী মোহনেরও সম্বিত ফিরেছিল মহুয়া চলে যাবার পর।

সুলেখাকে পে'ৗছে দিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল রমণী মোহন। শিষ দিতে দিতে কত গান গেয়েছে। বার বার ছেলেটাকে দেখতে গেছে। 'ভারি সুন্দর হয়েছে ছেলেটা কিন্তু। আচ্ছা দেখ মুখটা ঠিক আমার বাবার মতো।' হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারেনি মহুয়া। মনে ভেবেছে—কোনোদিন একসাথে শোওনি—কি করে ছেলেটা তোমার বাপের মতো হয়? তাহলে কি তোমার বাপের সাথে শুয়েছি আমি? সে তো পরপারে গেছেন বিয়েরও আগে। মুখে কিছু বলেনি মহুয়া।

রমণী মোহন হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে চিকেনের ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে মহুয়ার ঘরের চেয়ারে বসে বলল, হিন্দু ধর্ম বলে ধর্মানুষ্ঠান করে বিয়ে হলে এক সাথে না শুলেও পিতাপ্রপিতামহদের আত্মা নতুন করে ফিরে আসতে পারে। আমি তোমার সাথে এক বিছানায় না শুলেও—যার সাথে তুমি শুয়েছ তার মাধ্যমে আমারই পিতৃপুরুষের আত্মা আমার সন্তান হয়ে আসতে পারে। তা যদি না হত তা হলে এই যে ব্রাহ্মণের সন্তানেরা—তারা কি সবাই তার বাপের সন্তান নাকি? কিন্তু অব্রাহ্মাণ ও দ্রাবিরের দ্বারা সন্তান হলেও ওই ব্রাহ্মণের আত্মাই ফিরে আসে। যেমন ধর—একটু চিন্তা করলেন রমণী মোহন। আমার উনুনটা খারাপ হয়ে গেছে—তাই খাবারটা এক মেথরের উনুনে গরম করে আনলাম।

রমণী মোহনের যুক্তিহীন প্রলাপ শুনে মহুয়ারই পাগল হবার যোগার। কিন্তু সেও পাগলের মতো বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। রমণী মোহন বলে গেল। যুক্তিপূর্ণ যুক্তিহীন অসংখ্য কথা বলে গেল। একসময়

দ্বজনেই ক্লান্ত হয়ে যে যার নিজের ঘরে শ্বয়ে পড়ল। মহ্বয়ার কিছ্ব বলার মতো শক্তি ছিল না।

মেয়ের ওসবের প্বজো শ্রাদ্ধ ইত্যাদির কোনো ত্রুটি হলো না। রমণী মোহনের কর্তব্য ও স্বশৃঙ্খলাতে কোথাও খ্বঁত ছিল না। সে যেন নতুনভাবে নিজের জীবনটাকে গ্বছিয়ে নিয়েছে। যতই তাকে দেখে ততই অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখে যায় মহ্বয়া। ক্ষণে ক্ষণে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্ন ভেসে আসে। মনের এক দ্বিষ্টিতে যখন সে ভাবে এ অভিনয়—বলির আগে চান করিয়ে সাজিয়ে গ্বজিয়ে ফুলের মালা পরিয়ে কপালে সি'দ্বরের টিপ দিয়ে সবাইকে উৎফুল্ল করে পাঠাটি যেমন যত্ন করে নিয়ে আসে—এ যেন সেই মহোৎসবের ধ্বম পড়ে গেছে। এরপরে হয়ত বলবে তোমার শেষ ইচ্ছেটা এবার জানাবার সময় হয়েছে।

আবার অন্তকরণের গভীর থেকে একটা অপমান ও অন্বশোচনার লজ্জিত গ্লানি টি বি র্বগীর রক্তের মতোই ঝলাৎ করে বেরিয়ে এসে আতংকে চমকে দেয়। রমণী মোহনের বিশেষ কোনো ভাবের পরিবর্তন নেই। আগে কথা বলতেন না আর এখন কথা বন্ধ হয় না। দেখা হলেই তারাবাতির মতো হাসি ঠিকরে পড়ে আর তুবড়ির মতো স্নিগ্ধ আগ্বনের ফোয়ারা বেরিয়ে আসে। তার মধ্যে প্রাণের আতপ্ততা থাকে মনের সৌন্দর্য থাকে কিন্তু তা যেন আরও জ্বালিয়ে দেয় মহ্বয়ার সর্বাঙ্গ। হঠাৎ চোখাচুখি হলে মহ্বয়া দেখতে পায় ও চোখে, ঈগলের তীব্র তীক্ষ্ণ রঞ্জন রশ্মির গভীর ছটা। ও দ্বিষ্টিতে কঠিন মৃত্যুর ভয়াবহতা। কিন্তু এক নিমেষে সে দ্বিষ্ট পাল্টে গিয়ে বিগলিত জাহ্নবীর কর্বণা ধারা বইতে থাকে।

কথায় কথায় রমণীবাব্ব বলেন, ডি এক্স্ টি—অর্থাৎ গভীর রঞ্জনরশ্মি যেমন প্রড়িয়ে ফেলতে পারে দ্বনিয়াটাকে নিঃশব্দে অদ্বশ্যভাবে তেমনি ঠিকমতো প্রয়োগে ডেভীল ক্যান্সার সারান যায়। ব্যাধি এনে ব্যাধিকে ভাল করা যায় না—রোগ হলে তার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়—তারপর সেই স্বমধ্বর হাসি। কত গল্প, কত কথা। অবাক হয় মহ্বয়া—এ মান্বষটার মধ্যে এত খ্বঁটিনাটি জমা ছিল? অনেক কষ্টে নিজেকে স্বাভাবিক রেখে মহ্বয়া জিজ্ঞেস করেছে,

আমি কি তোমার নজর বন্দী ?

—ছিঃ স্বামীকে ওভাবে বলতে নেই। স্বামী-স্ত্রী কি শুধু নজর-বন্দী হয় ! তারা আমৃত্যু সর্বক্ষেত্রেই একজন আর একজনের সঙ্গে বাঁধা। বর্ণ পরিচয়ের বর্ণমালা যেমন লাঠি সোঠা তরোয়ালের ছবি নয় তারা যোগ হয়ে হয়ে গ্রন্থের বিদ্যার সৃষ্টি হয় তেমনি একজন আর একজনের সাথের বন্ধনগুলো পরাধীনতার রজ্জু নয়—ভালবাসার গ্রন্থি। অসংখ্য ভালবাসার জড়াজড়ি দিয়ে এক দম্পতি কৃতার্থ হয়। সে বন্ধনে কখনও সখনও ব্যথাও লাগে না তা নয়—কিন্তু ওই ব্যথাই মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেয় তার পরিচয়। ঝিমেটাও একটা ব্যথা, সন্তান হতেও ব্যথা—ব্যথা স্মরণ করায় আমরা বেঁচে আছি—এটা চলন্ত জীবন। যেখানে ব্যাথা নেই—কলহ নেই—ভালবাসার গান নেই সেখানে প্রাণ সুপ্ত। তুমি নজরবন্দী নও—তুমি আমি দুজনেই মুক্ত তবে একে অন্যের ছায়া নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বিয়ের রাত থেকেই তো তাই। তুমি তোমার ও আমার অর্ধেক আর আমি আমার তোমার অর্ধেক। বিশ্বাস যারা করে না—তাদের ওই বন্ধনে ব্যথা বাজে, তাদের ওই শাস্ত্রের 'আ' কার 'ই' কারগুলো সর্বক্ষণ যন্ত্রণা দেয়। লম্বা বক্তৃতার নিচে মহুয়ার কথা হারিয়ে গিয়েছিল।

মহুয়া কিছু বললেই দীর্ঘ লেকচার শুরু হয় রমণী মোহনে'। যতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে মহুয়া আর ততই তীব্র আশঙ্কাও উৎকণ্ঠার ঝড় বয়ে চলে তার বুকের মধ্যে।

কর্তব্যে ত্রুটি নেই রমণী মোহনের। নাম ঠিকানা নিয়ে একটা নয় দুটো টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন ডাঃ শ্যামল সেনকে। অত্যন্ত ভালভাবে পেঁৗছেছে—মা বাচ্চা ভাল আছে। খুব ব্যস্ত—চিঠি যেতে দেরী হবে ইত্যাদি। পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য নিবারণ সেগুলো মহুয়াকে দেখিয়ে পোস্টাপিসে গিয়ে পাঠিয়েছে।

এক একটি দিন যাচ্ছে আর মহুয়ার ভেতরে আগুনের দহন ততই বাড়ছে। সর্বক্ষণই ভীত আতংকিত দুটো চোখ এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়। সীমন্ত ভয়ান্ত উত্তেজনায় ছটফট করে। অত সুন্দর সুসজ্জিত সবুজে ঘেরা বাড়ি,

অত মিষ্টি মধুর মানুষজন সবই মনে হয় প্রেতনৃত্য। সবই বিদ্রূপ পরিহাস চারদিকে। এক ভয়ঙ্কর অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর বিভীষীকা তাকে যেন গ্রাস করতে বসেছে। অথচ কোথাও বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা দুরভিসন্ধির চিহ্নও সে খুঁজে পাচ্ছে না। রমণী মোহনের ভোরের আলোর মতো উচ্ছ্বাসের ফোয়ারা তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

সে ভাবেই শ্রাদ্ধ শান্তি—বাজার হাট সব শেষ হলো। ছেলেকে নিয়ে কোথাও যেতে দেয়নি রমণী মোহন। তার স্নেহস্নিগ্ধ আতপ্ত কোমল অনুরোধের কাছে বার বার হেরে গেছে মহুয়া। 'এটা বিলেত নয়——কলকাতা। এখানে অন্তত তিনমাস বয়স না হলে মন্দিরেও নিয়ে যাওয়া উচিৎ নয়। তুমি নিজে ডাক্তার—তুমি দেখতে পাচ্ছ না কী রোদ, নোংড়া, মশা, মাছি—ধোঁয়া। দেখছ না কমরেডদের অবাঞ্ছিত দেহস্রাবে সারাটা কলকাতা পঙ্কিল। খোলা নর্দমা, আণ্ডার গ্রাউণ্ডের ধুলো। একদিন বেরোলে এমন অসুখ হবে—আর ভাল নাও হতে পারে। তুমি নিজেই তো জান এখানে পেরিন্যাটাল ডেথ্, ইনফ্যাণ্ট মর্টালিটি কত হাই। তাও মরবিডিটির তো কোন স্ট্যাটিসটিকসই নেই। এখানে বেঁচে থাকাটাই বড় কথা। প্লিজ—নিজের সুখের জন্য ওকে কষ্ট দিও না। আমরা বরং এই কাজ হয়ে যাবার পর সবাইকে একদিন ডাকব তারা বরং এসে এখানে দেখে যাবে—আশীর্বাদ করে যাবে। মহুয়া বাধা দিতে পারে নি। এ অকাট্য যুক্তির কাছে সে হার মেনেছে। থমকে দাঁড়িয়ে ভেবেছে। কিন্তু পরক্ষণেই রমণী মোহনের কঠিন পুরুষালি হাতখানা হাত ধরে নয় কাঁধ ধরে তাকে গাড়ির কাছে পরম আদরে বোঝাতে বোঝাতে নিয়ে গেছে। দূর থেকে পরিচারকরা সুখী হয়েছে। সুলেখা দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো তার কর্তব্য করে গেছে।

অস্বস্তিতে ছটফট করেছে মহুয়া। তবুও রমণী মোহন পার্টির আয়োজন করেছেন। প্রায় শ দেড়েক মানুষ হবে। তোড়জোড়—সাজ সাজ রব। ক্যাটারিং-এর ব্যবস্থা—ড্রিংকস—সবই ম্যাজিকের মতো হলো। গাড়িতে করেও বড় শ্যালক ও আপন আত্মীয়দের আনা হলো। ধুমধাম—প্রেজেন্ট—

আশীর্বাদ—এমনকি আতশ বাজিও পোড়ানো হলো। তার সাথে সামান্য পুজো আচ্চারও ব্যবস্থা হলো।

সার্কাসের বাঘিনীর মতো তার কর্তব্য সম্পাদন করে যাচ্ছিল মহুয়া। কিন্তু কেউ সন্দেহ করে গভীর দৃষ্টি ফেললে দেখতে পেত সে ভেতরে উন্মাদিনী হয়ে বসে আছে। এমন সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র যে হতে পারে বাস্তবে তা ভেবেই সে স্থবির হয়ে রইল। অথচ নিজেরই আর একটা মন বলছে হয়ত রমণী মোহন জানেই না সে কোথায় কি করেছে ও করছে। কিন্তু ছেলেটা তার নয় তাও কি সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু কিভাবে যে কী করবে বা বলবে সে বুদ্ধি তার মাথায় কিছুতেই আসছে না। একথা না বলা যায় না সহ্য যায়। তাই মনে মনে ঠিক করল চুপ করে থেকে কোনোরকমে প্লেনে উঠতে পারলে আর তাকে কে পায়।

পার্টির শুরুতে দীর্ঘ বক্তৃতায় রমণী মোহন তা স্ত্রীর প্রশংসাবাণী ফুলের মতোই ছড়িয়ে দিলেন। তার অতি আকাঙ্ক্ষিত পুত্রের জন্য তার আনন্দ বিগলিত চোখ থেকে জলও পড়ল। কেউ বুঝল না সে অশ্রু তার দুর্ভাগ্যের ব্যথাই বহন করেছে। শুধু সুলেখা ও মহুয়া অবাক হয়ে চেয়ে রইল এই নিপুণ শিল্পির সুকল্পিত সুকৌশলে সুগঠিত অভিনয় ও সুচারু রূপে তার প্রেসেনটেশন। তার মতো ভাগ্যবান শহর কলকাতায় কমই হয় ক জনার ভাগ্যে এমন বিদুষী সুভগা স্বামী অন্তপ্রাণা অর্ধাঙ্গিনী জোটে। রূপে গুণে বুদ্ধিতে এমন স্ত্রী তামাম দুনিয়ায় বিরল। আজ সে ছেলে পেয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আজ তার বড় সুখের দিন। সবার সামনে তার বলতে লজ্জা নেই এমন গুণী স্ত্রী প্রতি বাঙালীর ঘরে ঘরে থাকলে বাংলা আজ ভালাস হয়ে যেত। আমরা উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করতাম।

হতাশ ক্রুদ্ধ মার্জারের মতো ফুলে ফুলে উঠেছিল মহুয়া। এমন ভাবে শত শত ভীমরুলের সুতীক্ষ্ণ হুল তাকে বিদ্ধ করবে—এমনভাবে বিছার কামড়ে সমস্ত দেহটা জ্বলবে—এমন করে তার মনটাকে ক্ষত বিক্ষত করতে পারে কেউ তা সে কল্পনাও করতে পারে নি। ছেলেটার মুখ চেয়ে ও শ্যামলের কথা ভেবে সে চেঁচিয়ে ওঠেনি অনেকক্ষণ। একসময় সে আর নিজেকে সংবরণ

করতে পারল না।

মহুয়া পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল। হাতের কাছে কি ছিল তা ছুঁড়ে মারল। উন্মাদের মতো হাসি কান্না শুরু করল। সুলেখা আদর করতে করতে দোতলার ঘরে নিয়ে গেল। রমণী মোহনও সবাইকে বোঝাল। বাবার মৃত্যু, বিলেত থেকে ছোট বাচ্চা নিয়ে আসা—রাতে ঘুম নেই। তাছাড়া নিজে ডাক্তার—এত কী সহ্য হয়। আদুরে মেয়ে বাবার। জনতা বুঝল—অস্বাভাবিক কিছুই নয়। কিন্তু দাদা জানতেন মহুয়ার এমনটি হয়েছিল আগে। যদিও রমণী মোহন তার কিছুই জানতেন না।

মহুয়ার দাদা সৌমিত্র—নিজে ডাক্তার। খুব সহজ চোখে তিনি দেখলেন না ব্যাপারটা। কখনও এসব রোগী এমন হতে পারে যে নিজে সুইসাইড তো করতেই পারে তার সাথে স্বামী সন্তানকেও মার্ডার করতে পারে। গোপনে রমণীবাবুকে নিচু গলায় সেটা বোঝালেন সৌমিত্র। রমণীবাবু গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্তের মতো সায় দিয়ে বললেন, তাহলে শুধু ওকে আপনি বাড়ি নিয়ে যান। ছেলে এখানেই থাক। সুলেখা নয় কয়েকটা রাত এখানে থাকবে। ওর মেয়ে পদ্মকেও নিয়ে আসতে বলব। কোনো অসুবিধা হবে না।”

তাই ঠিক হলো। দাদা গাড়ি থেকে একটা লারগ্যাকটিল এনে মহুয়াকে বুঝিয়ে ইঞ্জেকশন দিয়ে গাড়িতে তুলে নিল। পার্টি তখন প্রায় শেষ। সবাই বিদায় নিল ম্লান মুখে। এত জমাট পার্টির এভাবে শেষ হবে তা কেউ আশা করেনি। তবুও শুভেচ্ছাবাণীর অভাব হয়নি।

সুলেখাকে সেই রাতটা রমণী মোহনের বাড়িতেই কাটাতে হলো। রমণী মোহনের সাফল্যমণ্ডিত অপরিমেয় আনন্দের উচ্ছ্বাসে তারও বুকে বেদনা মূর্ছনা বেজে উঠেছিল। শিক্ষা দিতে গিয়ে নবজাত শিশুর মাকে পাগল করে দেয়াটা অত্যধিক মনে হলো তার। অজানা ভয়ে তার বুকটাও কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু রমণীমোহনের দুর্বার উল্লাসের স্রোতে সব কিছু জলাঞ্জলি দিতে হলো ভোর রাতে। কখন তার কাঁকুরা তার পাশে এসে

দুয়ে আতপ্ত নিশ্বাস ফেলছিল তার ঘাড়ে অনেকক্ষণ সে খেয়াল ছিল না তার। দীর্ঘ দগ্ধ দিনের পরিশ্রমের পর বাবুয়াকে খাইয়ে ন্যাপি চেঞ্জ করে ক্লান্ত দেহটা ঘুমিয়েই পড়েছিল এই রঙ্গরসিকতা ও শেষপর্যন্ত কঠোর করুণ নাটকের কথা ভাবতে ভাবতে, যখন স্বপ্নাবিষ্টের মতো অনুভব করার চেষ্টা করছে পাশের মানুষটাকে তখন রমণীমোহনের চোখের জলে তার গাল ভিজে গেছে। ফড়িংদার কান্না সে আগেও দেখেনি তা নয়। এই বলিষ্ঠ পুরুষটা যা চায় তা না পেলে চোখ থেকে জল গড়ায়। ওই পাথরের থেকে দুই এক বিন্দু জল গড়াবার পর সে যেন মরিয়া হয়ে ওঠে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপত্তি জানায়নি সুলেখা—বরং আঁচল টেনে চোখ মুছিয়ে দিয়েছে ফড়িংদার। প্রচণ্ড বিজয়ের উল্লাসে ফড়িংদার চোখ জলে ভেসে গিয়েছিল। তা বুঝেছে সুলেখা। অস্ফুট স্বরে—উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাপূর্ণ স্বরে প্রশ্নকরেছিল, মহুয়া ভাল হয়ে যাবে তো?

—হুঁ—শব্দ করে সুলেখাকে নিবিড় আলিঙ্গনে নিষ্পেষিত করেছে ফড়িংদা। আত্মরক্ষার চেষ্টা করে লাভ নেই তা জানে সুলেখা। ভোর পর্যন্ত ভালবাসার বিরতিহীন অগ্নিবাণবৃষ্টিতে তছনচ হয়ে গেল ফড়িংদার পুটুরাণী।

মহুয়াকে এত সহজে শিক্ষা দেয়া যাবে তা ভাবেনি রমণীমোহন। এভাবে চট করে বিকল হয়ে যাবে মহুয়াকে এত ঠুনকো ভাবেননি তিনি। তার পেছনের ইতিহাসে যে পাগল হওয়া আছে তা কে জানতো। কিন্তু দাদা সৌমিত্র সে কথাটা জানাল রমণী মোহনকে।

বাবুয়াকে মাঝখানে রেখে রমণী মোহন সুলেখার আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। পদ্ম কয়েকদিন মামাবাড়ি ও কয়েকদিন নরেনবাবুর বাড়িতে থাকার পর গরমের ছুটি পড়ে গেল। সুলেখা তাকে পাঠিয়ে দিল শিলিগুড়িতে তার ছোট মাসীর বাড়িতে। বহুদিন ধরেই মাসি মেসো তাদের যেতে বলেছে—হয়ে ওঠেনি। রমণী মোহনের বাড়িতে পদ্মকে রাখার ইচ্ছা হল না সুলেখার সেই মুহূর্তে। ফড়িংদা অর্থাৎ রমণী মোহনই তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন প্রথম পর্যন্ত।

সপ্তাহ খানেক পরে সুলেখার ঘনসংবদ্ধ-আতপ্ত কোমল বুকে মাথা রেখে তার ফাড়ংধা বিয়ের প্রস্তাব তোলে অত্যন্ত সন্তর্পণে। সুলেখা কথার ভাবা যেন বুঝেও বোঝেনি প্রথম দিকে। পরে বলেছে, তা হয় না।

—কেন হয় না সুলেখা?—প্রশ্ন করেছেন রমণী মোহন, আমি তোমাকে সেই ছোটবেলা থেকে ভালবাসি। এভাবে একটা ছাড়া ছাড়া সম্পর্ক থাকলে সমাজের দৃষ্টিতে তা স্বাস্থ্যকর নয়। তাতে তোমার নারীত্বের অপমান করা হয়। আমার খারাপ লাগে—।

—খারাপ লাগার কি আছে? দুজন যখন দুজনকে ভালবাসি ওই রেজিস্ট্রী করাটাই কি বড় কথা। আগে প্রব্লেম সব সল্ভ হোক তারপরে ভাবব।

—কিন্তু তোমার কি মনে হয় না আমরা অসামাজিক ভাবে মেলামেশা করছি? অবাক ভাবেই প্রশ্ন করেছেন রমণী মোহন।

—আমার স্বামী মারা যাবার পর সমাজ কি দিয়েছে আমাকে? কেউ তো হাত বাড়িয়ে বলে নি এস আমার সাথে। 'বরং বিধবা কে বিয়ে?' শুনে আঁতকে উঠেছে। যুবতী বিধবাকে লুকিয়ে কিছু করা যায়—তার দিকে লালসার ঘন দৃষ্টি মেলে ইংগিত জানান যায়—তার যৌবনটা তাকে পুড়িয়ে ছারখার করছে ভেবে অনুশোচনা জানান যায় কিন্তু 'বিয়ে করব' বলা যায় না। তুমি যে হাত বাড়িয়ে আমাকে সম্মানের আসনে বসাতে চাইছ—তাই আমার অনেক। যদি সময় হয় কোনোদিন নিশ্চয়ই নিজেকে সম্মানিত করব। দেহটাই সব নয়—দেহের দেবতা যদি পরিতৃপ্ত থাকে ওই বাইরের আড়ম্বরের কী মূল্য বল? মহুয়ার সাথেওতো তোমার হিন্দু যজ্ঞ করেই বিয়ে হয়েছিল। বলেছে সুলেখা।

সুলেখার ওপর শ্রদ্ধা ও বিস্ময় রমণী মোহনের হৃদয়ে প্লাবন বইয়ে দেয়। এখন সুযোগ পেয়েও সুলেখা তা অতি সন্তর্পণে মনের কুঠুরিতেই বন্ধ করে রাখল। অকস্মাৎ প্রবল আবেগে সুলেখাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রমণী মোহন কেঁদে ফেলেছিল। এই বাংলার দুই প্রায় একই বয়সী যুবতী কত তফাৎ, সে ভাবে। উত্তেজনার আতিশয্যে উদভ্রান্তের মতো আদরে ভরিয়ে দিয়েছে তার মনের দেবীকে। কঠিন দৃঢ় স্বরে বাষ্পাচ্ছন্ন আবেগে বলেছে, তুমি আমার

অর্ধাঙ্গিনী নও—তুমি আমার পূর্ণাঙ্গিনী। আমি এক টুকরো কালিগণ্ডকীর পাথর—তুমি আমার মন্দির সুলেখা। বল তোমার বিশাল বিরাট মন্দিরে আমাকে স্থান দেবে? সিরিয়াস হয়ে বলেছিলেন রমণী মোহন।

সুলেখা পরিহাসে বিজয়িনীর হাসি টেনে অস্ফুট স্বরে বলেছিল, এ মন্দিরে অত বড় বিরাট শক্তি ধরবে না—কোনারকের মতো হয়ত ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

—না সুলেখা তা হবে না। যদি তাই হত তা হলে দুজনের এমন করে মিলন হবার সুযোগ আসত না। যে বয়সে মিলন হলে সেই প্রলয় ভাঙন হত আমরা সেই অবাধ্য কাব্যের রক্তিম বিপ্লবের পথ পেরিয়ে এসেছি। এখন বন্ধুত্বে ও প্রাণের টানের বয়স।

রমণী মোহনের চওড়া উজ্জ্বল ললাটে ঢেউ থমকে ছিল।

—তোমার ভালবাসার গতি দেখে তো তা মনে হয় না। বরং পাহাড়ি নদীর থেকে এর আবেগে ও চঞ্চলতা যে আরও দুর্বার—রসিয়ে বলল সুলেখা।

—বহুদিন গতিপথে বাঁধা ছিল। সেই বাঁধা হঠাৎ সরে গেছে—তাই এ প্লাবন।

—কিন্তু কতদিন এ প্লাবন থাকবে তা তো তুমি জান না। বিয়ের আগে আমি যা বিয়ের পরে তা আমি নাও থাকতে পারি। তাছাড় বিধবা বিয়ে করে সমাজের প্রতিষ্ঠা তোমার নষ্ট হতে পারে—একটু ব্যথাভরা স্বরে বলল সুলেখা।

—না সুলেখা—সংস্কার আচ্ছন্ন মন নিয়ে পড়ে থাকলে আমরাই পিছিয়ে থাকব। আর প্রতিষ্ঠা স্ত্রী বা সমাজের ওপর নির্ভর করে না। ওটা সম্পূর্ণই নিজের।

সুলেখার ঘনকালো আয়ত চোখের কোল বেয়ে জল নেমেছিল। রমণী মোহনের কণ্ঠস্বরও ভিজে গিয়েছিল। ভাঙা গলায় সান্ত্বনা দিয়েছিল—আশা ভরসা ও নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন তুলে ধরেছিল।

আমি সারা জীবন অপেক্ষা করব তোমার জন্য। একদিন নিশ্চয়ই তোমার সময় আসবে 'সু'। তুমি সঙ্কোচ করো না। মুখ ফুটে না বল অন্তত

আভাসে জানিও।—বিহ্বল দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিল সুলেখা। চোখে অশ্রু ছাড়া ভাষা ছিল না। ভাবছিল—এ মিথ্যা স্বপ্নের অযাচিত বাসাটে যা আছে তাও যেন না হারায়। আর রমণী মোহন সুলেখার নিস্পৃহ আবেগহীনতায় ব্যথা বোধ করল মনে মনে। আবার সান্ত্বনাও দিল নিজেকে—সুলেখার মেয়েটি বড় হচ্ছে। তারও সমাজ সংস্কার ইচ্ছা অনিচ্ছা আছে। ভালবেসে রাতের অন্ধকারে কাউকে সুখী করা যায় কিন্তু তার গায়ে কাদা লেপা যায় না। তা দুপক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সুলেখা রমণী মোহনকে ডাঃ শ্যামল কান্তি সেনের পরিচয়টি ইচ্ছা করেই জানায়নি। পাছে রমণী মোহন আরও আঘাত পায় অথবা এমন প্রতিহিংসায় জ্বলে ওঠে যে ব্যাপারটা আরও কঠোর ও কঠিন হয়ে পড়ে। পালান স্ত্রীকে শিক্ষা দেয়া এক কথা আর রাম রাবণে যুদ্ধ আর এক। শ্যামল সেন তারও বন্ধুর মতোই। ঘটনাচক্রে তাকে স্বর্ণলতায় না জড়ালে সেও হয়ত প্রোপোজ করত সুলেখাকে। রমণীরা তো লতার মতোই—কেউ ফুলে ফুলে গাছের শোভা বাড়িয়ে দেয় আর কেউ বা স্বর্ণলতার মতো সোনার মুকুট হয়ে ঝলমল করে আবার একসময় সমস্ত গাছটাকে শুষে নিয়ে নয়ত ছায়ায় ঢেকে মেরে ফেলে।

বাড়ি ফিরে অনেকদিন পর হঠাৎ শ্যামল কান্তি সেনের লম্বা এক চিঠি হাতে পেল সুলেখা। সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে মহুয়ার আসা, তার স্বামীর হঠাৎ আতিথেয়তা ও সন্তানকে জোর করে আটকে রাখা এবং শেষ পর্যন্ত মহুয়ার অসুস্থতার কথা। যদি দয়া করে সুলেখা সাহায্য করে। তার নিজের এ যুদ্ধে যোগদানের কোনো ইচ্ছাই নেই—উপায়ও নেই। ইত্যাদি।

তিন সপ্তাহ পুরে পদ্ম ফিরে এল। সুলেখার আর ছুটি নেয়াও অসম্ভব। তাই বেবি মাইন্ডার রাখতে হলো রমণী মোহনকে। ব্যাপারটা খুব নিরাপদ নয়। তার নিজের পক্ষেই প্রতিটি দিন ব্যবসা ও কাজকর্ম ছেড়ে থাকা সম্ভব নয়। সুলেখা পরিষ্কার উপদেশ দিল, শিক্ষা যা হবার হয়েছে এবার ছেড়ে দাও।—

—ছেড়ে তো দিয়েইছি—গম্ভীর গলায় বলে রমণী মোহন।

—ছেলে মায়ের কাছে দিয়ে দাও। ওটুকু ছেলে মা ছাড়া থাকা ঠিক নয়—বিনয় করে বলেছে সুলেখা।

—পাগল মায়ের হাতে অতটুকু শিশু তুলে দেয়ার থেকে গঙ্গায় ফেলে দেয়া বরং ভাল—ক্রুদ্ধ হয়েই বলেছে রমণী মোহন।

—তা হলে কি করবে ?—জিজ্ঞাসু সন্দেহের দৃষ্টি চেয়ে বলল সুলেখা।

—ওর বাবার কাছে দেব। বুকের পাটা নিয়ে এসে দাঁড়াক—তাকে তুলে দেব। প্রতিহিংসা না অভিমান বোঝা যায় নি তার কথায়।

সুলেখা যুক্তি দিতে পারেনি। চুপ করে থাকার পর বলেছে, যা ভাল বোঝ কর। কোর্টের অর্ডার আনিয়েছেন রমণী মোহন। মা ভাল না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চা বাবার অর্থাৎ রমণী মোহনের কাছেই থাকবে। শুধু তাই নয়—ডিভোর্স না হওয়া পর্যন্ত ছেলেকে ভারতের বাইরে মা নিয়ে যেতে পারবে না। মেডিকেল সার্টিফিকেট, পাস্ট মেডিকেল হিস্ট্রি, কতমাস অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন বিলেত যাত্রা—কোনো ডকুমেণ্টেরই অভাব হয়নি। ক্লিন কাট স্ট্রেট্ ফরওয়ার্ড কেস। তার বিপক্ষেও কেউ নেই। পুলিস রিপোর্ট রমণী মোহনের পক্ষে।

কাগজের ফটো কপি বাবুয়ার মামার কাছে পাঠান হলো। তার মারফৎ শ্যামল সেনের কাছে। তার মাথায় বজ্রাঘাত। অযাচিত পাপের ফল--। কী করবে তা ভাবার সুযোগ কোথায়। তার ওপর সে জানে ফড়িংদাকে। তার বিরুদ্ধে লড়ার শক্তি তার নেই। দোষও ফড়িংদার নয়। সে নিজে হলেও হয়ত এই প্যাঁচে ফেলত পাষাণ স্ত্রীকে।

দু তিন দিন পাগলের মতো দুশ্চিন্তায় ছটফট করে সলিসিটরের সঙ্গে পরামর্শ করে শ্যামল এই আমি নামক বস্তুটির দরজায় ধর্ণা দিল। দুজনে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আদ্যোপান্ত ঘটনা বিন্যাস করে ইনফারেন্স ড্র করলাম—মহুয়া চলে আসুক। এ ছাড়া অন্য গত্যন্তর নেই। বেঁচে বর্তে থাকলে বাচ্চা অনেক হবে, সুযোগ এলে বাবুয়াকেও ফিরিয়ে আনা যাবে। অন্য কেউ বেশিদিন 'কাকের বাচ্চা কোকিলের ঘরে' (অথবা উল্টোটা) পালন করবে না।

শ্যামল সেনের অমন উস্কখুস্ক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চেহারা কখনও দেখিনি। ভাগ্যের চক্রান্তে মানুষ যে কেমন সিংহ থেকে মেষ হয়ে যায় তা দেখে আমার মনে হলো আমি এই বিদেশি পরিবেশে মোটামুটি মধ্যম ভাবে ভালই আছি। শ্যামলের সব কথাই সে আমায় বলেছিল। আমি নির্বাক দর্শক ও কখনও জ্ঞান দেয়া শ্রোতা হয়েই ছিলাম।

মহুয়া এল। আমিই তাকে এয়ার পোর্টে রিসিভ করলাম। ব্যাচারা শ্যামল কিছুতেই ডিউটি চেঞ্জ করতে পারল না। আমরা বিলেতে সবাই ওই ন্যাশনাল হেলথ-সার্ভিসের চেন বাঁধা কুকুর। আর ওই চেনের তালার চাবি নিজের হাতে থাকা সত্ত্বেও তা সব সময় খুলে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। এই প্রফেশনটাই ওরকম। ডাক্তারবাবু রুগীর কয়েদী—রুগী ডাক্তারবাবুর হৃৎপিণ্ডের লোহিত কণিকা। আর এই হেলথ সার্ভিস এমন ব্রহ্মাণ্ডের মতো নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে সীমিত যে স্বয়ং হিটলার সাহেবও এখানে পুত্তলিকা মাত্র।

সে যাই হোক—মহুয়াকে খুশিতেই তুলতে এসেছিলাম। জান পাচান কম দিনের হলেও ওর সঙ্গে আমি প্রেমে পড়েছিলাম। ঠিক হিরোর প্রেম নয় স্নেহও নয়—নিতান্তই কলিগ ও বন্ধুর প্রেম। চলতে বলতে গানে কাব্যে ডাক্তারীতে আতিথেয়তায়—সর্বোপরি অমন আপন ভাব পাওয়া দুর্লভ। এক পলকে মনে হয়েছে মহুয়া আর আমি জমজ ভাইবোন। সেকথা বলার সাহস কখনও হয়নি। সে মিসিসিপি মিশৌরী হলে আমি নিতান্তই নীলগিরি। পৃথিবীর এপার ওপর। কিন্তু প্রথম দিনের তার 'দাদা' ডাকটি আমার মনে হয়েছিল সাহারার বুকে শ্রাবণ ধারা। তাই বুঝি হয়। সহস্র মানুষের মধ্যে কেন কে জানে একজনের একটা 'ডাক' কানে মনে প্রাণে ব্রেইনে সিলমোহর হয়ে থাকে আজীবন। দাদা—অমন করে ওই ছোট মিষ্টি শ্রদ্ধাভক্তি অনুরাগ ভালবাসা মিশ্রিত ডাক কখনও শুনেছি কিনা মনে নেই। তক্ষুনি—ডাক্তার তো! মনে হয়েছিল জন্মাবার আগেই যেন ওই ডাকটা শোনা। তাহলে কি হতে পারে? টুইনস? আর ভাবিনি—বাঁজও নি। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের নরম শিলাখণ্ডে মহুয়া নামটা লেখা হয়েছিল।

কিন্তু এ কোন মহুয়া ? ট্রলি ঠেলে হিথ্রো থেকে বেরিয়ে সে ডাকটা সে দিয়েছিল। কিন্তু সে ঝর্ণাধারা তো এ নয়। কোথায় হরিদ্বারের উচ্ছল চপল জলরাশি আর কোথায় কালীগঙ্গা! উপমা অসংখ্য—তা থাক। মনে হলো ক্যান্সারের রুগী ডি একস টি পেয়ে মেদ মজ্জা রক্ত সব শুকিয়ে গেছে—চুল পাতলা হয়ে গেছে—মুখে মৃত্যুর অকরুণ বিভীষিকা। সত্যি কথা বলতে কি, আমি চিনতে পারিনি। সন্দেহ মনে ওর পাসপোর্টটাও চাইলাম দেখতে। কত লোক মিথ্যা করে ঢোকে হিথ্রোর দরজা দিয়ে। অনেক দীর্ঘ মাইক্রো-স্কোপিক দৃষ্টি দিয়ে দেখার পর আমার ব্যথার সীমা রইল না। এই ভারত ? এই আমার কলকাতা ? সেখান থেকে ফিরেছে মহুয়া এইভাবে। দোষ ভারত বা কলকাতার নয়। পরে ভাবলাম তেল চকচকে অপ্সরার তো অভাব নেই শহর কলকাতায়। এ ভাগ্য নিয়তির করুণ পরিহাস। এখানেও তো কত মানুষ ষোল স্টোন থেকে মানসিক রোগে বা অন্য অসুস্থতায় ছয় স্টোন হয়ে খাবি খাচ্ছে। কষ্টে বুকটা ভিজে গিয়েছিল—ব্যথা করছিল। বলিনি কিছু। যতক্ষণ মহুয়া কলকাতায় ছিল ওই উপস্থিতিটাই রমণী মোহনকে শক্তি যোগাচ্ছিল। যেদিন শুনল মহুয়ার দাদা নতুন পাসপোর্ট করিয়ে মহুয়াকে বিলেতে চালান দিয়েছেন সেদিন তারও মাথা ঘুরে গেল। শিশুটি তার নয়। যদি বাই চান্স কিছু হয় তবে দফা শেষ। অনুতাপ অনুশোচনার শেষ থাকবে না। সুলেখা সে আশাঙ্কা বার বার জানিয়েছে। জিনিস চুরি করা, বড় কাউকে জেলে বন্দি করা আর মায়ের কাছ থেকে সন্তান ছিন্ন করা আলাদা। সে মায়ের যতই দোষ থাক—শিশু তারই। তার কোলে থেকে কিছু হলে তা ভাগ্য, কিন্তু কোলছাড়া সন্তানের কিছু হলে ভগবানও মাফ করবে না। টনক নড়ল রমণী মোহনের। ভয়ে উৎকুণ্ঠায় সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। চোখে ঘুম নেই—সর্বক্ষণই সে বাচ্চার শ্বাস প্রশ্বাস ও হৃদপিণ্ডের ধকধক শুনে যাচ্ছে। এমন চলতে থাকলে সে নিজেই যে পাগল হয়ে যাবে।

মহুয়ার দাদা সৌমিত্রকে ফোন করেও সুরাহা হলো না! নিজের কাঁধে বাচ্চার ভার নিতে সে নারাজ। স্বাভাবিক। সেও তখন রেগে বম্ব হয়ে আছে। সুলেখা ছাড়া আর গতি কি ? সুলেখার ওই একই উপদেশ, যার

বাচ্চা তাকে ফিরিয়ে দাও। তার মানে বিলেত যাত্রা? আমি ব্যাটাছেলে এ ছেলেকে নিয়ে কি করে যাব? তাহলে তুমিও সাথে চল।

তাতে আমার আপত্তি নেই—বলল সুলেখা।

একটানা একঘেয়ে পরাজিত জীবনের বোঝা টেনে টেনে সুলেখাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। লুকিয়ে সুদূরের যে আলোটুকু অন্ধকার দূর করছিল সমাজ সংস্কারের কলুষতায় তাও পাপ মনে হত। তাই তার মনটাও চাইছিল নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের আলোটুকু দেখতে। পরশ করতে সেই মুক্ত সূর্যের আলো, স্বাধীন বাতাস।

বিদেশ দেখতে আমার খুব ইচ্ছে। তবে পদ্মকে না নিয়ে যাব না আমি—সুলেখা বলেছিল। পদ্ম তার মেয়েই নয়, এত দিনের বেঁচে থাকার আলো। কয়েক সপ্তাহে সব ব্যবস্থাই হলো। লণ্ডন—প্যারিস—রোম ইত্যাদি।

বাবুয়া রিচিং হিথ্রো এয়ার পোর্ট অন, অ্যাট ইন···এয়ার লাইনস। টেলিগ্রাম এল শ্যামলের কাছে, মহুয়া ফেরার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে। টেলিগ্রাম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবেধন নীলমণি—শ্যামলের অতি বিশ্বস্ত আমি ফোন পেলাম। শ্যামলের আনন্দ ধরে না। আমাকে ধন্যবাদের ঠ্যালায় অন্ধকার করে দিল। সেই কলেজের কাঁচাপাকা খিস্তির ফুলঝুড়ি ব্রিটিশ টেলিকমও জ্যাম করে দেবার অবস্থা। ওগুলো ভালবাসা ও একাত্মবোধের জ্বলন্ত প্রমাণ। তারপর একই অনুরোধ জেনিফার ও আমার ওপর ভার। মহুয়া তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেনি। চিকিৎসা চলছে কিন্তু ছেলের চিন্তায় এখনও পাগল। তাকে এয়ার পোর্টে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। মেনে নিলাম।

কে আসবে কী ভাবে আসবে কিছুই জানি না। তখন কলকাতার ঘটনা-গুলোও আমার কিছুই জানা ছিল না। যেটুকু মহুয়ার অস্বাভাবিক অসুস্থ কণ্ঠ থেকে বেরিয়েছিল তাতে রমণী মোহনের ধূর্ত্ততা ও ছেলেকে ধরে রাখা

ছাড়া তেমন কিছু ছিল না। তার চেহারার হাল দেখেও ওর বেশি জানার ইচ্ছেই হয়নি। তবে এমনটি ঘটতে পারে তা আন্দাজ করেছিলাম। সে মতো শ্যামলও মহুয়াকে ওয়ার্নিংও দিয়েছিলাম। কিন্তু পিতৃ বিয়োগের কুয়াশায় মহুয়ার সে কল্পনা মানসপটে বাস্তব আকারে ধরা দেয়নি। মহুয়ার ওই হালত দেখে সে প্রসঙ্গ আর তুলিনি।

আমি নিজেও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হিসেবে আত্মতৃপ্তি পেয়েছিলাম। পঞ্জিকাতে আমার রাশিতে ওই কথাটা প্রতি বছরই ছাপা হয়। শুধু দুঃখ নিজের ভবিষ্যৎটা কখনই দেখতে পাইনি। ছেলেকে ফিরিয়ে দেয়াটাও যে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল তাতে আরও খুশি হয়েছিলাম। তাই হিথ্রো যাবার প্রবল ইচ্ছাটাকে চেপে রাখতে পারলাম না সে রাতেও। যদিও হয়ত না গেলেও চলত।

সকালে ফোনে জানাল হিথ্রো যেতে হবে, রাত্রে আবার ফোন, তোকে না গেলেও চলবে। মহুয়া ছেলে ফিরে আসছে শুনে ভালর বদলে আরও খারাপ হয়েছে। তার ধারণা সঙ্গে রমণী মোহনও আসতে পারে। তাকে দেখলে ও নাকি হার্টফেল করবে ইত্যাদি। সে কান্না আর উন্মাদনা এত বেড়ে গেছে যে সাইকিএট্রিক কনসালটেন্ট ওকে ভর্তি করেছে হাসপাতালে। শরীর খুবই খারাপ—প্রায় উন্মাদ অবস্থা। তাই শ্যামল এক নার্সকে নি- নিজেই এয়ার পোর্টে আসবে। আমাকে না গেলেও চলবে। তবুও জোর করেই আমি বললাম, না, না, আমার অফ্ আছে, আমি যাবই। আমি না থাকলে তোরও মনটা ছটফট করবে। অন্ততঃ ইজি অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট হবে আমি থাকলে।

—বেশ—অফ থাকলে চলে আসিস তবে জেনিকে আনতে হবে না। ও ব্যাচারেকে কষ্ট দিতে চাই না—

হিথ্রো এয়ার পোর্ট—আবার বার বার। আমার মনে হয় বিলেতের প্রবাসী বাঙ্গালীরা যতবার হিথ্রো যাতায়াত করে—সারা ব্রিটেনের গোড়া লোকরা মিলেও তা করেনা। প্রায় প্রতি ফ্যামিলি দুবছরে একবার এই মন্দির হয়ে কালিমার মন্দির কলিকাতায় যায় আবার ফেরে। তার ওপর তাদের

আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের যাতায়াত তো আছেই। অন্যান্য বড় ষ্টেশনের মত এই সহর হিথ্রোতেও কত শত ঘটনা দুর্ঘটনা প্রতিনিয়ত চলছে। তিনটি টার্মিন্যাল বর্ত্তমান 'সুতানটি, গোবিন্দপুর কলকাতার' মতই ব্যস্ত উদভ্রান্ত। দুনিয়ার মানুষের মুখ দেখা যায় একটি দৃষ্টিতে। সবাই ব্যাস্ত—জীবনের চলার পথের তল্পিতল্পা বগলদাবা করে সবাই ছুটছে। অফুরন্ত নাটকের শুরু মধ্যাঙ্ক ও শেষ। অফুরন্ত নাটক চলতে চলতে মাঝপথে হিথ্রোতে ফিউজও হয়ে যাচ্ছে। কত আনন্দ ব্যথা সুখ দুঃখের শুরু ও শেষ। ভাবতেও অবাক লাগে। শ্যামলকে খুঁজতে খুঁজতেই এই কথাগুলো ভাবছিলাম।

শ্যামলের উৎকণ্ঠার ঢেউ আমার বুকেও আছড়ে পড়ছিল। ওর জীবন-বৃত্তান্ত ও বর্তমান ঘটনাপ্রবাহের সাথে আমিও অঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িয়ে পড়েছি। তাই ওর বর্ত্তমান জীবনের প্রতিটি ঘাত প্রতিঘাতে আমার মনেও সহানুভূতির ব্যথা বাজে। স্বদেশে অসংখ্য প্রব্লেমের মধ্যে, বহু আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের আবেষ্টনে থাকলে একজনের কষ্ট ব্যথার ঢেউ খুব একটা হয়ত লাগে না। বিদেশে সহজ সরল জীবনে বৈচিত্রের অভাব আছে। অন্যের সামান্য কষ্ট দুঃখও বম্বশেলের মত বুকে লাগে। তা নিয়ে ভাবনার যথেষ্ট সময় থাকে বলে তার অনুরনন ঘুমের মধ্যেও মাথায় বাজে। সে চিন্তা আরও গভীর ভাবে দাগ কাটে। বেশির ভাগ সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনাই স্বাভাবিক দৈনন্দিন গতানুগতিক জীবন যাত্রার অঙ্গবিশেষ। তা নিয়ে ভাবনা চিন্তার ছোট ছোট তরঙ্গ জলেই শেষ হয়ে যায়, হৃদপিণ্ডের পাড়ে ধাক্কা মারে না।

একসময় ফ্লাইট—অ্যারাইভাল ডিক্লেয়ার হোল। ইলেকট্রনিক বোর্ডে ঝপ্ ঝপ করে নামগুলো ছাপা হয়ে জ্বলজ্বল করতে লাগলো। শ্যামলের বুকটা কী করছিল জানিনা তবে অকারণে আমার বুকটা ঢিব ঢিব করে ব্যথা-ব্যথা করছিল। শ্যামল উদ্বিগ্ন—চঞ্চল হলেও মুখে একটা তৃপ্তির স্মিত হাসিও ধরে রেখেছিল। আমি রহস্যের গন্ধ পাচ্ছিলাম—মনটা উৎসাহিত হচ্ছিল সেই রহস্যের ঢাকনা খুলতে। জিজ্ঞেস করলাম, বাবুয়াকে নিয়ে আসবে কে?

চিন্তিত ভাবেই শ্যামল বলল, কি জানি? মনে হয় এয়ার হোস্টেস দিয়ে পাঠাবে।

—"তা কী করে হয় ? এয়ার হোস্টেসদের বসে আর কাজ নেই—অতটুকু বাচ্চাকে বসে বসে দুধ খাওয়াবে ?

—শ্যামল হেসে রসিকতা করে বলল, ড্যাডি সাথে থাকলে হয়ত খাওয়াত।

আমি সহজ হতে পারলাম না। ভবিষ্যৎবাণী করলাম, আমার মনে হয় সুলেখা আসবে—

আঁৎকে উঠল শ্যামল। এক পা সরে গিয়ে বলল, ভাগ্ শালা—

ঢোক গিলে চিন্তা করল গম্ভীর ভাবে, তার পর বলল, কার ছেলে কে নিয়ে আসবে। এখনি সে খচে বম্ব হয়ে আছে। কিছু না বলে পালিয়ে এসছি—পরে আবার মহুয়াকে সাহায্য করতে চিঠি দিয়েছি। সুলেখার কাছে আমার মত ক্ষীন ছোটলোক দুনিয়ায় নেই। সে কী করে বুঝবে আমার যে ভাগ্যটা কোথায় আমাকে নিয়ে গেছে।

—তাহলে কে নিয়ে আসবে ? শ্যামলকে তাতানোর জন্য তামাসা করেই আমি পয়েন্টটা ধরে রইলাম।

শ্যামলেরও মন স্নায়ুগুলো চর চর করে উঠেছে। ওর মুখটা বেশ চিন্তান্বিত গম্ভীরও কপালে বেশ কয়েকটি ঢেউ থমকে গেছে। ডানদিকের মোটাভুরুটা উঠছে নামছে। বুঝলাম চোখদুটো স্থির থাকলেও মনটা রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যস্ত। আফসোস নিশ্চয়ই হচ্ছিল এটা আগে ভাবেনি কেন ? ও ব্যাচারাকে দোষ দেয়া যায় না। কয়েক মাস ধরে ওর ওপর দিয়ে যে শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক ঝড় ঝঞ্ঝা চলছে তাতে মন বলে ওর আর বোধ হয় বস্তু নেই—ভাবনা আর ফিড করছে না ব্রেনের কম্পুটারে। বহু ভাবনা সজারুর মত একগর্ত্তে ঢুকতে গিয়ে সব জ্যামপ্যাক হয়ে গেছে। ওর বিশ্রামের প্রয়োজন। মানসিক অবসাদ ওর স্নায়ুমণ্ডলিকে অকেজো করে দিয়েছে। এমন সহজ সরল ভাগ্য ও ধর্ম্মভীরু ছেলটার কপালে হঠাৎ এত অশান্তি উদ্বেগ দুশ্চিন্তার ঝড় কেন যে এল কে জানে। দেশে থাকলে হয়ত শনিপুজো দিলে দুষ্টগ্রহের অবসান হোত। অথবা কে জানে পাথর টাথর পরলেও তো শুনেছি উপকার হয়। না হবার কি আছে ? হয়ত পার্টিকুলার

পাথর গায়ে থাকলে দুষ্টগ্রহের অদৃশ্য আলো আর ভাগ্যের দরজায় পড়ে না। তবে হ্যাঁ খরম উল্টোপাল্টা হোলে আবার পঞ্চ পাণ্ডবের নিজেদের মধ্যেও খুনোখুনি হয়ে যেতে পারে। ঠিক ঠিক সময় ঠিক ঠিক পাথর ধারণ না করলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অনিবার্য।

বহু মানুষের মধ্যে নিজেকে খুবই একা মনে হয়। তাই বোধহয় বিভিন্ন ভাবনা এসে জড় হয়। রেলিং-এর বাইরে উসখুস করছি। কার জন্য অপেক্ষা করছি! একটা ছোট শিশুর জন্য-আর অজানা একটি মানুষ যে তাকে নিয়ে আসবে। মনে রঙ বেরঙের ছবি আঁকছি। কতরকম অলটারনেটিভ হতে পারে তাই পারমুটেশন কমবিনেশন করছি। হঠাৎ হাত নাড়াল শ্যামল। ওর মুখে হাসি বিজলির আলোর মতোই ঠিকরে বেরিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল। সারা মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমি ওর মুখেব অভিব্যক্তিটাই দেখলাম। একপলকে অজস্র লোকের মধ্যে ওর মুখটা খুবই কুণ্ঠিত অসহায় কালিলেপা মনে হোল। চোখদুটো ক্ষনেকেই বাষ্পাছন্ন হোল। লজ্জা অপমান রাগ অনুরাগ ব্যথা আনন্দ সব মেলান একটা পাঞ্চ হলেও ব্যথার ভাবটাই যেন বেশি।

আমি ডানে বাঁয়ে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ নজরে পড়ল এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা —মুখে তার একরাশ হাসি—হাতে তার একটি ক্যারিকট। বুঝলাম আমার পঞ্জিকায় লেখা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কথাটা এবারও শ্যামলের কপালে লেগে গেছে। ঝট করে শ্যামলকে এক গুঁতো দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী রে সুলেখা না? -

হ্যাঁ—মাথা নেড়ে চটকরে বলল শ্যামল। ওর 'হ্যাঁ'র নিশ্বাস যেমন স্বস্তি ছিল তেমনই ভয় ও লজ্জাও মেশান ছিল। একটা হ্যাঁ শব্দের মধ্যে যে মনের অত রকমের ভাবের প্রকাশ হতে পারে তা আগে সত্যিই জানতাম না। ভাবলাম কালিগণ্ডকী নদীর ওই কালো একটুকরো পাথর আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তার সিম্বল হতে পারবে না কেন? সাধারণ একটা দীর্ঘনিশ্বাসও একটা মানুষের সমস্ত জীবনের সারাংশ হতে পারে। সে সব যুক্তি তর্ক ব্রেনের আলোহীন পাড়ে ধাক্কাধাক্কি দিয়ে চালান করে মুখে হাসি টেনে আনলাম। নিজেকে সাজ সাজ রব করে সাজালাম। যেমন বুলগানিন ক্রুশ্চভ আসছে ভারত সমৃদ্ধিশালী করতে অতএব ভাঙাপথ রাজপথ করতে হবে বাঁশের তোড়ন

সাজিয়ে। যুক্তিটা মোটেই খাটে না। তবুও কারও আগমন বার্ত্তা এলেই বাড়ি ঘর সাজাতে গেলে ওই কথাই মনে পড়ে। ভগ্ন গরীব কলকাতাকে কত সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল—পরে ভিড়ের ঠ্যালায় গাড়ি ভেঙে যাবার জন্য মহান রাশিয়ান মহাপুরুষদের লালবাজারের ব্রিটিশ তৈরি প্রিজন ভ্যান এ করে গভর্নর হাউসে নিয়ে যাওয়া হল। কয়েকজন রাশিয়ান রিপোর্টারকে জনতা মহান অতিথি ভেবে স্বাগতম জানাল আর বাবা বিশ্বনাথের বাহন একটি ষাঁড় জবা-কুসুম হাউসের সামনে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে ঢুকে পড়ে পাগল হয়ে ছুটল। সেই বুলগানিন বাবাজীর কী যে হোল কে জানে আর ক্রুশ্চেভ মহাশয় বোধহয় সাইবেরিয়ায় কাঠ কাটতে গিয়ে ব্যাঙের খপ্পরে পড়েছে। সে অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক কথা থাক।

সুলেখাকে দেখতে বেশ মিষ্টি। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম! একটু ফাঁকা জায়গায় এসে সে মিষ্টি করে বলল, এই নাও তোমার ছেলে। খুব ভাল--এতটুকু বিরক্ত করেনি—ঠিক তোমার মতো শান্ত।—

কী কথা বলবে তা বুঝি জানে না শ্যামল। দুটো মায়াভরা ভাবে-ভরা ব্যথাভরা চোখে তাকিয়ে রইল সুলেখার দিকে। সে দৃষ্টিতে কত যে গভীর মনের কথা আছে তা তারাই জানে। তবে দুজোড়া চোখ অনেকক্ষণ একত্রীভূত হয়ে বাষ্পাচ্ছন্ন হল। সাহেব মেম হোলে দুজনে অতি দারুণভাবে দুজনকে জড়িয়ে ধরে দুজনের উষ্ণতায় শীতল হত। কিন্তু অরিএন্টাল সংস্কারে দেয়াল ও দৃষ্টিতেই আটকে থাকে।

আমি তাদের ভাবনার কুয়াশায় ফুৎকার দিলাম, নমস্কার—ওয়েলকাম টু ব্রিটেন। চোখ ঘোরাল সুলেখা, নমস্কার—আপনি?

—ও আমার বন্ধু জয়দীপ—সাথে এসেছে—শ্যামল বলল। তারপর অ্যানকে ইংগিতে বাচ্চাটাকে নিয়ে থার্ড টার্মিনালের পাঁচতলায় পার্ক করা গাড়িতে নিয়ে যেতে বলল। পকেট থেকে গাড়ির চাবিটা দিল। অ্যান চাবি ও বাচ্চা নিয়ে চলে গেল।

তুমি চল আমার সঙ্গে, আর কেউ আছে সঙ্গে? জড়িয়ে জড়িয়ে লজ্জাভয় মেশানো গলায় জিজ্ঞেস করল শ্যামল।

—না, তুমি চলে যাও—আমার হোটেল বুক করাই আছে লণ্ডনে—তারপর আবার ফিরে যাব—সুলেখা রহস্য জড়ানো হাসি দিয়ে বলল।

—তা হয় না। অন্ততঃ কয়েকটা দিন আমার বাড়ীতে থেকে যাও—অনুরোধ করল শ্যামল। তার গলায় অসংখ্য দ্বিধার মিশ্রণ। ছাড়তেও পারছে না—রাখতেও ঠিক মন চাইছে না—এমন একটা ভাব।

—চোখের বালি হয়ে? বা অন্য কিছু। তা হয় না শ্যামলদা। আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করলাম। এর বেশি আর চেও না—শ্লেষ ভরা গলায় সুলেখা বলল। মুখে তার স্নিগ্ধ হাসি—তার মধ্যে আত্মগর্ব শিশিরে রোদের মতোই চকচক করছিল। কথায় চলায় আত্মমর্যাদার সীমা ছিল না। টিপিক্যাল মা মাসীর মতো পালিশ করা বনেদি সোনা। ঠুনকো উচ্ছল নয়। দেহের যৌবন আত্মগরিমায় আবদ্ধ। চোখে গাম্ভীর্য্যের চাকচিক্য। কথায় স্নিগ্ধতার পাণ্ডিত্য! ওই অল্পসময়ে আমারই ভাল লেগে গেল। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাষ খাবার মত আমি প্রস্তাব করলাম, আপনি হোটেলে থাকবেন কেন—যে ক'দিন থাকবেন শ্যামলের সঙ্গে থাকার ইচ্ছে না থাকলে বরং আমার বাড়িতে চলুন। যাবার দিন আমি আবার পেঁৗছে দিয়ে যাব। অতদূর থেকে এসেছেন বিলেতটা একটু দেখে যান।

নিজের পুকুর যে ভালবেসেছে তার কাছে সমুদ্র তুচ্ছ। না ভাই, আমি হোটেলেই থাকব। আপনারা যেতে পারেন—হাসির টুকরো মুখে রেখেই সুলেখা চাইছিল আমরা চলে যাই। হঠাৎ আমার মনে হোল—ব্যাপারটা খুব সহজ ঠেকছে না। এর মধ্যে আরও একটু রহস্যের গন্ধ পেলাম আমি। সুলেখাকে এক লহমা দেখলেও ওকে আর একটু সান্নিধ্যে পাবার জন্য আমার ভেতরের মনটা তোলপাড় করছে। হয়তো ওর সম্বন্ধে অত গল্প কথা শুনেছি বলেই। শুনতে শুনতে একটা আকর্ষণ ভেতরে জমে ছিল। সেটাই ইলেকট্রোম্যাগনেট হয়ে আমায় টানছিল। ওর ভারতীয় ব্যক্তিত্বের স্নিগ্ধতায় শান্তিনিকেতনের গন্ধ পাচ্ছিলাম। সুলেখার দুটো চোখের মধ্যে আমি যেন আদি কালের ভারতের রূপ খুঁজে পাচ্ছিলাম। গঙ্গোত্রীর সেই স্রোতই এতকাল করে চলে আসছে ওই রূপের মধ্যে। নেশাগ্রস্তের মত আবার অনুরোধ করলাম।

—আপনি আমার বাড়ীতে চলুন কোন অসুবিধা হবে না। আমার স্ত্রী এদেশী হলেও সে ভারতীয়ের চেয়েও ভারতীয়।—উত্তরের প্রতীক্ষায় চেয়ে রইলাম। এতটা দরদী হবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মানুষের মন—একবার কাউকে চাইলে—না পেলে বড় অপমান ব্যথা বাজে। এবারেও একই উত্তর। আরও মধুঢালা কণ্ঠে বিনয়ের স্রোত দিয়ে বললেন, স্যরি, পরের বারে এসে নিশ্চয়ই থাকব। এবার আমার সময় নেই। আপনারা যান—আমি একটু অপেক্ষা করব আমার আত্মীয়ের জন্য—আপনারা প্লিজ ওয়েট করবেন না। শ্যামলদা—অতছোট বাচ্চা রেখে তুমি দাঁড়িয়ে থেক না—যাও। পরে দেখা হবে।—চোখের পলকে হৈ হৈ করে চলে গেল সুলেখা। ব্যাপারটা অতি নাটকীয় ঠেকল আমার। সুলেখার পশ্চাদ্ধাবন করল আমার চোখ। সে দোতলার ক্যাফেটরিয়ারের দিকে গেল। আমি ঝপ করে শ্যামলকে বিদায় জানিয়ে বললাম, বাস—হ্যাপি—অল ওয়েল—তুই তা হলে যা—আমি এককাপ কফি খেয়ে চলে যাব খন। পৌঁছেই ফোন করিস—

শ্যামল কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভাবল একটু। তারপর বলল, সব যেন কেমন হয়ে গেল, জয়। বেশ আমি যাচ্ছি। কিন্তু সুলেখা এমন ভাবে চলে গেল? আমার ভীষণ খারাপ্ লাগছে।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, সে পরে মাপ চেয়ে ঠিক করা যাবে। তুই ওই ছোট শিশুটাকে ঠাণ্ডায় ফেলে রাখিস না। যা। সাবধানে গাড়ি চালাস। বাই।— চটপট শ্যামলের কাছে বিদায় নিয়ে থার্ড টার্মিন্যালের ক্যাফেটরিয়ায় এলাম। ভাবটা যেন আনমনা নিজের সুখে চলছি—দুনিয়ার হদিশ নেই। আসলে মনপ্রাণও চোখ দিয়ে সুলেখাকে খুঁজছি। ডানে বাঁয়ে ওপরে নিচে চারদিকে চোখের মণিটা টেলিভিসন ক্যামেরার মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে সুলেখাকে। একজায়গায় থমকে গেলাম। কাছে গিয়ে বললাম, আপনি এখানে? ভাবখানা যেন কতদিনের চেনা। সুলেখা মৃদুমিষ্টি হেসে বলল, হ্যাঁ—এই আমার মেয়ে পদ্ম আর এই মিষ্টার পাল।

এবার আমার হার্টফেল করার কথা। কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে দুহাত মাথায় ঠেকিয়ে বললাম, নমস্কার। অযাচিত ভাবে একখানি সিট

দখল করে টেবিলে হাত রেখে তাকিয়ে মিস্টার পালকে ভীষণ ভাবে দেখলাম। মিঃ রমণী মোহন পাল। আপনাকে আমি চিনি। তবুও দৈহিক আলাপ হয়নি। আমার দারুন ইচ্ছা আপনার সাথে আলাপ করার। একটা অনুরোধ যদি রক্ষা করেন—ভীষণ খুশি হবো।

—কী বলুন—শ্রান্ত ভাবেই বললেন রমণীবাবু। তিনিও মাইক্রোস্কোপিক দৃষ্টি দিয়ে আমাকে খুটিয়ে খুটিয়ে পরীক্ষা করছিলেন।

—যে কদিন বিলেতে থাকবেন—আমার বাড়িতে আসুন, থাকুন। হোটেল ক্যান্সেল করতে অসুবিধা হবে না। শ্যামল আমার ক্লাসমেট—ওর কাছে আপনাদের গল্প অনেক শুনেছি। এলে কৃতার্থ হবো। আমি কথা দিচ্ছি শ্যামলকে আমি কিছু জানাবো না। আমার বাচ্চা আছে—এই মেয়ের মতই বয়স একটি মেয়ে—ওরও ভাল লাগবে। ভীষণ ভালমানুষের মত অতি মিষ্টি গলায় বললাম আমি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন রমণীবাবু সুলেখার দিকে। সুলেখা সে প্রশ্নখোদিত দৃষ্টির অর্থ বুঝল। বলল, হ্যাঁ উনি শ্যামলদার বন্ধু, শ্যামলদার সাথেই ছিলেন।

দ্বিধাভরে রমণীবাবু বললেন, আমাদের হোটেল তো বুকড্ সেখানেই যাই আপনি কাল সকালে বরং যোগাযোগ করবেন—এক সময় যাবো আপনার বাড়ীতে। আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম বেশ, কোন হোটেলে যাবেন আপনি?

রমণী মোহন পকেট থেকে কাগজ বার করে বললেন, ক্রাউন হোটেল—নিউসলজে।

—বেশ চলুন—আমিই নামিয়ে দিয়ে যাব—বলে কফিটা শেষ করলাম।

তাতে আপত্তি জানাল না কেউ। মালপত্র ও তাদের তুলে খুব কম কথা-বার্ত্তার মধ্যে তাদের হোটেলে নামিয়ে দিলাম। বুঝলাম তারা শারীরিক ও মানসিক খুবই ক্লান্ত। তাই পরের দিন এসে কথাবার্ত্তা বলব ও আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব তাই বলেই বিদায় নিলাম। লোভ দেখিয়ে ছিলাম, লণ্ডনটা তাদের আমি ঘুরে দেখাব বলে। প্রচণ্ড উৎসাহ না দেখালেও তারা খুশি হয়েছিল। রমনীবাবু অকপটে স্বীকার করলেন তিনি সপ্তাহখানেক ইংল্যাণ্ডে থাকতে পারেন। তারপর প্যারিস, রোম ঘুরে ব্যাক টু ক্যালকাটা। সুলেখার সঙ্গে রমণী মোহনের

এই ঘনিষ্ট পরিচয়ের সংবাদ আমার জানা ছিল না। তবে শ্যামল বলেছিল সুলেখা মারফৎই ফাড়ুংদার পরিচয় ও মহুয়ার সম্পর্ক সে পেয়েছিল।

পরের দিন দুপুর নাগাদ তাদের ম্যাডাম ট্যুসো, পিকাডিলি, ট্রাফলগার স্কোয়ার ঝটপট ঘুরিয়ে দিলাম। তার পরেব দিন ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ম এই করে মোটামুটি তিন দিনের মধ্যে তাদের জালে ফেললাম। বন্ধুত্ব উপচে পড়ল। সরল প্রসারিত বন্ধুত্বের দরবার খুলে গেল। সঙ্কোচ—দ্বিধা ভয় উবে গেল। আমার বাড়ীতে তারা তখন যেচে আসতে পাগল। সত্যি কথা বলতে কী রমনীবাবুর উদার ব্যক্তিত্বে ও সুলেখার অস্বাভাবিক মধুর ব্যবহার আমায় মুগ্ধ করল। জীবনে সব মানুষকে ভাল লাগে না—শত ভালো হলেও নয়। দুটো ভালোলাগার মিশ্রণে একাত্মবোধ কমই হয়। কদাচ একজনের সাথে অল্প মিশলেই ভক্তিতে পায়ে হাত দিতে ইচ্ছে হয়—অনেকের গুণ খুঁচিয়ে খুটিয়ে যুক্তি দিয়ে পেলেও ভক্তির উদ্রেক হয় না। স্নেহ, ভালবাসা মনের সবই তাই।

সে রাত্রে অনেক আলাপ আলোচনা কথাবার্তা হোল। জেনিফারের কফি ইভনিং থাকায় সুবিধা হল আরও। মোটামুটি কলকাতার ঘটনাসম্ভার আমার জানা ও বোঝা হোল। উপদেশ দেবার কিছু ছিল না। তবু শেষ পর্যন্ত বললাম, একটা প্রশ্ন ঝুলিয়ে না গিয়ে বরং ব্যাপারটা মিটমাট করে নেয়াই ভাল। নয়ত এই ক্ষত পচতে পচতে মহুয়া ও শ্যামল দুজনকেই পচিয়ে মেরে ফেলবে। অতটুকু বাচ্চাটার জীবনটা বরবাদ হয়ে যাবে।

—দেয়ার ইজ নাথিং উই ক্যান ডু—দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন রমণীবাবু।

—বেশ আপনিই বলুন আমরা কী করতে পারি? পাল্টা প্রশ্ন করল সুলেখা।

অনেক ভেবে চিন্তে বললাম, একবারটি দেখা করে যান ওদের সাথে। তাহলে মহুয়া বুঝবে ওকে মাপ করেছেন আপনি। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। শিক্ষাও কম হয়নি। হয়ত সুস্থ মস্তিস্কে বুঝবেই না এ জীবনে—কী সে করেছে আর কী শেষ পর্যন্ত হোল। দোষ তো কিছুটা আপনারও

হয়েছে রমণীবাবু।

—তা হয়েছে—প্রথমত স্ত্রী মানেই আমার পোজেসন। বিয়ের রাতে সে কী বলেছে তার জন্য তাকে দূরে সরিয়ে দেয়া আমার উচিৎ হয়নি। আমি সেটুকু তুচ্ছ জ্ঞান করে তাকে বুকে টেনে নিয়ে পুরুষের সমস্ত উজার করে দিলে হয়ত সে বুঝত এ মন্দিরের দেবতাও তার মনপ্রাণ ভরিয়ে দিতে পারে। অমন ছোটখাট প্রেম কার না থাকে? কিন্তু আমার কাছে তখন মহুয়া ছিল বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা। তাই আমার খাদ্য নয় ভেবে গাছের ডালে টাঙিয়ে রেখেছিলাম। দ্বিতীয়ত আমি জানতাম না তার পূর্বেও সাইকিএট্রি প্রব্লেম ছিল। তাহলে তাকে ওভাবে মানসিক আঘাত করতাম না। হয়তো কিছুই করতাম না। তাই ভুলগুলো আমার ইচ্ছাকৃত ঠিক নয়। বাস্তব জ্ঞানের অভাব—ফেলে আসা জীবনের মান অভিমান—থামলেন রমণীমোহন।

ঘটনাগুলোর চুলচেড়া বিচার শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি এজন্যেই যে সেগুলোই আমিও ভাবছিলাম। তাই কথার প্রসঙ্গ টেনেই বললাম, মহুয়ার ক্ষেত্রেও হয়ত তাই। সে ডাক্তারি পড়েছে—উপরন্তু রূপসী —নাচে গানে চমৎকার—সব মিলেয়ে আত্মদেমাক হয়ত তার চোখকে ঝাপসা রেখেছে। কেউ বাহবা দিয়েছে কেউ ঈর্ষা হিংসা করেছে—কেউ দূরে দূরে ফেলেছে, কেউ অভিমানে স্তব্ধ হয়ে অশ্রুপাত করেছে। কেউই হয়ত তাকে বাঁচতে শেখায় নি—

—সেটাই তো জীবনের প্রহসন। ছোটবেলা থেকে আমরা ব্যাকরণ ভূগোল ইতিহাস এই সাধারনের অপ্রয়োজনীয় অনেকাকিছুই পাড়—শিখি কিন্তু জীবনটা কী ভাবে সুন্দর করে গঠন করা যায়—কোনটা করা উচিৎ বা উচিৎ না তা কেউ শেখায় না। অর্থাৎ মানুষের জীবনটা দিনের পর দিন কমপ্লেক্স হচ্ছে কিন্তু সেই একক পথটার কোন নিদর্শক নেই যেমন লক্ষ বছর আগে তুমি চলেছ—আজও তোমার তুমি তেমনই চলবে। দোষ ত্রুটি হলেই অপমান অবিচারের শেষ নেই—কিন্তু দোষটা কেন—কোথায় তা বলার কেউ নেই। তাই পথের কাঁটার ব্যথা সইতেই হবে—রমণীবাবু বললেন।

—হ্যাঁ তা কিছুটা ঠিকই স্বীকার করলাম আমি, তবে সমাজে কিছু কিছু নতুনত্ব আসবেই—নয়ত সংসার নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন আমার ইংরেজ

স্ত্রী-বাচ্চা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। এইভাবে মেলামেশা অসামাজিক কারও মনে হতে পারে। অস্বাভাবিক তো বটেই—তবু এই রকম বৈচিত্র দুনিয়ার সর্বত্র ঘটছে বলেই মানুষের নতুন সমাজ সভ্যতা গড়ে উঠছে। এতেই বরং দেশের উৎকর্ষতা বাড়ে—মানুষের দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়। নয়ত গতানুগতিকতার কাদায় স্তব্ধ হয়ে যেত সব—

সুলেখা বলল, তা হলেও বাঁশকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলেও সে দড়ি ছেড়ে দিলেই আবার সোজা হয়ে যাবে। দু একটা আইসলেটেড্ পরিবর্ত্তন দিয়ে বড়ো কিছু পরিবর্ত্তন আনা যায় না। জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেয়া সহজ—মনের পরিবর্ত্তন আনা খুব শক্ত।

অকাট্য যুক্তিতে হার মানলাম। বুঝলাম, সুলেখা তার ব্যক্তিগত লাইফের ওপর দৃষ্টি মেলেই কথাটা বলেছে। সে দুর্বল পয়েন্টের দিকে আমি ইচ্ছে করেই পা বাড়ালাম না। আবার পুরোনো প্রসঙ্গ টেনে বললাম, চলুন একদিন শ্যামলের বাড়ীতে ঘুরে আসি। থাকতে হবে না আপনাদের। বেড আর ব্রেকফাস্টে উঠে পড়ব স্কটল্যান্ডে। জায়গাটারও নৈসর্গিক সৌন্দর্য আছে। পাহাড় জল সব মিলেমিশে একাকার।

—হ্যাঁ নাম ও প্রশংসা খুব শুনেছি। রবি বার্নের দেশ—কিল্ট ও ব্যাগপাইপের নাচগানে সেল্টরা তো খুবই ফেমাস। তাছাড়া গ্লাসগো এডিনবরার খুব নাম শুনেছি—বললেন রমণীবাবু।

সোৎসাহে উঁচু গলায় সুলেখা বলল, হ্যাঁ লক নেসের মনষ্টারের গল্প পড়েছিলাম একটা বইতে ছিল। চল না—ঘুরেই আসি। ওদের ওখানে এক পলক দেখা করে ঘুরে আসব—সুলেখার চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল যাবার জন্য।

রমণীবাবু নিস্পৃহ ভাব দেখিয়ে বললেন, ওরা আবার কী ভাববে। ব্যবহারটা তো সুষ্টু হয়নি—সম্পর্কটাও তিক্তই বলা চলে। তার জন্য এয়ার পোর্টেই তো আমি দেখা করিনি—পালিয়ে ছিলাম। এখন যাওয়াটা কি ঠিক হবে? ভাবনায় পড়েছেন রমণীবাবু।

আমি উৎসাহ দিয়ে বললাম, আপনার মত উদার চেতা পুরুষের ওই ছোট ছোট চিন্তা শোভা পায় না। আপনি চলুন—মোটামুটি সম্পর্কটা সহজ হবে—

হয়ত মহুয়াও নতুন করে জীবন গোছাতে পারবে। নয়ত ও হয়ত আর ভালই হবে না। আমার তো মনে হয় ওদের সাহায্য করা আপনাদের কর্ত্তব্য। ক্ষমাই মানুষকে বড় ও মহান করে—জ্ঞান দিলাম আমি।

—বেশ ফোন করে দেখুন—ওদের আপত্তি না থাকলে খুব কম সময়ের জন্য একবার ঢু মারতে পারি—সুলেখা যাবার ইচ্ছায় ছটফট করছে বুঝলাম। রমণীবাবুকে পেয়ে অতি সহজেই শ্যামলদাকে ক্ষমা করতে পেরেছে সুলেখা। আমার তাই মনে হোল।

পরের দিন সুলেখা লাউয়ের ডগাটির মত লকলক করছে। কয়েক দিনের বিলেত জীবনে তার দেহলতা তপ্তকাঞ্চন বর্ণ হয়েছে। রূপ যেন আর ধরে না। অন্তত আমার চোখে। পদ্মও তাই—কুঁড়িটি হলেও ভারী মিষ্টি। শরতের শিশিরভেজা পদ্মকলির মতই সরল সুন্দর। রমণীবাবুর আবছা-কালো রোদেপোড়া বাদামি বরণটাও মুছে গিয়ে প্রভাত সূর্যের চাকচিক্য ভরে গেছে। বেশ ইণ্ডিয়ান অ্যারিষ্টোক্রাট ভাবটা ফুটে বেড়িয়েছে। মার্কসস্পেনসারের ঝকঝকে স্যুটটি দিব্যি ফিট করেছে। গ্রামের ডানপিটে ফড়িংদা আর লণ্ডনের নিউ মল্ডেনের ফড়িংদা যেন ফড়িং আর ঈগলে যেমন।

ওদের মন ভরে দেখলাম। বেশ লাগলো। অনেকদিন আমার চোখে এমন মনোহর দৃশ্য দেখিনি। সবই মনের ব্যাপার। হয়ত এমনটিই চেয়েছিলাম দেখতে।

শ্যামলকে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেছিলাম অতি অল্প সময়ের জন্য ঘুমেরে আসব। সারপ্রাইজ একটা ভীষণ দেব—কিন্তু সারপ্রাইজটা বলব না। সঙ্গে আরও তিনজন থাকবে তবে আমার সংসারের নয়। ওটুকু বলেছিলাম পাছে শ্যামল হার্টফেল করে। চিন্তার ভারটা ওর ওপরই ছেড়েছি। একটু রহস্য না থাকলে জীবন কী।

পথে কথাবার্ত্তা আলাপ আলোচনার শেষ ছিল না। রবীন্দ্র সংগীত, সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি থেকে কমন মার্কেট, নিউক্লিয়ার উইপন্, বিলেতে বাঙালি তাছাড়া নিজেদের জীবন সমস্যা তো ছিলই। বাদ, প্রতিবাদ, আলোচনা সমালোচনা বাঙালির মজ্জায় মজ্জায়। নিজের আটায় দলাটি অন্যের

বনস্পতি দিয়ে ভাল করে মেখে নেয়া—তবে না চিন্তার রুটিখানা জমবে। তাই না রকে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা চেঁচামেচি করে গেছি। সব ভাব ভাবনা কল্পনা মিশিয়ে অমৃতকে খাঁটি করেছি।

সবাই অর্দ্ধ ক্লান্ত হয়েই স্কটল্যাণ্ডে পৌছুলাম। স্কটল্যাণ্ড নামটা এমন হিন্দুস্থানের মতই থ্রিফোর্থ সত্য। ওয়ান ফোর্থ স্কটিশ আর নেই। কালো সুতো ঢুকে গেছে সে সাদা সতরঞ্চির বুনোটে!

খুব একটা অগ্রপশ্চাত ভূত ভবিষ্যৎ না ভেবেই স্কটল্যান্ডে শ্যামলের বাড়িতে পেঁাছেছি। পেঁাছেই কিন্তু প্রচণ্ড একটা ভয়ে বুকটা ধরফর করে উঠল। ফিউজ ও ডাইনামাইট তো লাগিয়েছি এবার যে কি একশন হবে তা হিটলার সাহেবও জানেন না। অ্যাটমবম্ব না স্যানডিয়ানের আলোর ফোয়াড়ার মিউজিক হবে তা কে জানে? উদ্বেগ উত্তেজনা উৎকণ্ঠা আতঙ্কে আমি জড় ভরত হয়ে গেলাম। কপাল বেয়ে ঘাম ঝড়ছে—নর্থ সি'র নর্থ ইষ্ট উইণ্ডের শীতল ঝড়ো বাতাসেও আমি শীতল হচ্ছি না। কোন অদৃশ্য রে রঞ্জন রমন না অন্য কে জানে আমার সেলগুলোকে ফাটিয়ে হাইড্রোজেন বম্বের অগ্ন্যুপাদন করছিল দেহের অভ্যন্তরে। আমাদের দেহটা ব্রহ্মাণ্ডের চেয়েও বড়ো। প্রতিক্ষণে অসংখ্য উল্কা বৃষ্টি হচ্ছে আবার নিউট্রন প্রটন ইলেকট্রন হাইড্রোজেন অক্সিজেন বম্বের বিস্ফোরণ ঘটছে। তার মধ্যেই সিন্ধুর স্রোত বইছে আ্যাটলাণ্টিকের হ্যারিক্যান চলছে—ঘুর্নী বত্তা চলছে—কিন্তু কখনও আমরা অনুভব করি—কখনও করি না। যখন মন সাহারায় তখন প্রাণ তৃষ্ণিত হচ্ছে—হাহুতাস—বুঝি প্রাণটা মরুভূমি হয়ে গেছে—ওয়েসিস চোখে পড়ছে না। আবার সুনীল সমুদ্র প্রশান্তে যখন ভাষি তখন সপ্তর্ষির দিকে চেয়ে তন্বি তনুশ্রীর রূপ লাবণ্যে বিভোর হই। কী নেই মশাই এই শরীর ও মনটাতে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব রূপরস গন্ধ—ভালোমন্দ—বাস্তব কল্পনা সৃষ্টিকারী মনুষ্য দেহে মিলিয়ে চার স্কেলে সব ঢেলে দিয়েছেন। যে যেটুকু তার মধ্য থেকে খুঁড়ে নিতে পারে।

কী সব ভাবছিলাম আমি গাড়িটি পার্ক করে। যাত্রীদের মনে কী হচ্ছিল জানি না আমার হৃদয় আটলাণ্টিকের মতই তোলপাড় করছিল। মজা দেখব হয়ত বা ভেবেছিলাম—মজা দেখতে গিয়ে ক্ষুদিরামের ফাঁসীর দড়িটি আমার

সামনে ভেসে উঠল। আমি বললাম, ওই তো বার নম্বর বাড়ি আপনারা নামুন আমি এক্ষুণি আসছি—ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। যাত্রীরা তা আন্দাজ করতে পারে নি। সরল সহজ ভারতীয় মানুষ তো!

অনেক কিছু ভাবাই আমার স্বভাব। তাই ভীত চিন্তিত ও শঙ্কান্বিত হয়ে পড়েছিল আমার মনটা। ওদের দেখে শ্যামলের না হোক মহুয়ার পাগলামো যে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে সেটাই ছিল আমার ভীতি। আর তার প্রতিক্রিয়া অন্য সবার মধ্যেও নিশ্চয়ই অনুরনিত হতে পারে। কোন বীভৎস দৃশ্য বা অবাঞ্ছিত ঘটনা না দেখতে হয় তাই ঠাকুরের কাছে নর্থপোলে ধ্যানমগ্ন হতে চাইছিলাম।

ওরা ভেতরে যেতেই—শ্যামল বেরিয়ে এল। হাসি খুশি ভাবেই এগিয়ে এসে অসংখ্য ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ রেজিষ্টার্ড খিস্তি মেরে বলল, তুই শালা জানাবি তো যে ওঁরা আসছে। আমি ওদের ওপর দোষটা চাপিয়ে দিয়ে বললাম, তাহলে ওরা আসতই না। ওদের ইচ্ছাই ছিল না—জোর করে রাজি করিয়েছি— বলতে বলতে গাড়ি থেকে নেমে চোরের মত গুটিগুটি শ্যামলের পেছন পেছন ঢুকলাম। ভাবটা যেন জার্মানরা বম্ব, মাইন সব পুরে রেখেছে এ বাড়িটায়—আমি ঢোকা মাত্র দরাম ব্যাং করে বিস্ফোরণ—সব টুকরো টুকরো হয়ে ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে।

সমস্ত দেহ মনের শক্তিকে একত্রীভূত করে স্নায়ু কেন্দ্রগুলোকে ঠিক মত সাজিয়ে স্মিত হাস্যে আমি ঢুকলাম। যেন সব রকম প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য আমি তৈরি। পঞ্চবান থেকে আই মি বি এম—সব আমার বগলে বাঁধা। মুখে রবি ঠাকুর থেকে সুকান্ত দরকার হলে জীবনানন্দ বা গোবিন্দদাস ফুটবল টিম প্লাস রিজার্ভস। অর্থাৎ কাব্য দর্শন বিজ্ঞান রনকৌশল সমস্ত উইপনারী সুসজ্জিত শিবাজি মহারাজের মত। দরকার হলে বারুদ আর ঝুড়িতে পালাতে পারলে ধর্মযজ্ঞ।

কিন্তু আমার সব সাগরে ডাম্প করতে হোল। ব্যাচারা কেনেডির মত ভাবলাম রাশিয়ানরা কিউবাতে মিসাইল পাঠাবেই—অতএব হুঙ্কার। কিন্তু ভীরু মার্জ্জার ক্রুশ্চেভ য পলায়তি স জীবতি—মতে বিশ্বাসী হয়ে পড়লেন।

মহুয়ার ভদ্রতার ত্রুটি নেই। তাকে বোঝাই গেল না তার মানসিক অশান্তি বা কোনো রোগ আছে। সে রূপ না থাকলেও—যা ছিল তা নায়াগ্রাকে হার মানায়। ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউসের বেনারসী ও গর্বিত হয়ে হাসছিল। দুটো চোখ যেন কোহিনূর ডায়মণ্ড। হাতগুলো পিয়োর আইভরী। তবে হ্যাঁ লক্ষ্য করে মনে হোল সে মহুয়া নয়। এ যেন ভাসান না দেয়া প্রতিমা। প্রতিমা—হ্যাঁ ও কুমোরটুলির মাটির ঠাকুর—প্রাণ নেই। 'এই ঠাকুরটা কত দাম—ভাগ শালা—এর তো চোখটা বাঁকা—গণেশ, এটা গণেশ না চুঁয়া—আর কার্তিক বানচো' এতো ডোয়াক' অমিতাভ। কেন রাজেশ করতে পারলে না ? শালা—বুড়ো বয়সেও উত্তম ডবকাচ্ছে নয় কালোচুলে তাই বানাতিস। সে কুমোরটুলির কথা থাক। মহুয়াকে প্রাণহীন দেবীই মনে হোল। বুকটা ধরফর করল একটু। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগটা চট করে ধরা শক্ত—একবার হলে আবার হবার আশংকাও থাকে। তাই খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমি শুধু দেখছিলাম।

কেউই আসল কথায় আসছে না। যেন কোনো সল্প পরিচিত অতিথি এসেছে তেমনি ভাব। শুধু শ্যামল গভীর দৃষ্টি মেলে রমণীবাবুকে দেখছিলেন। বুঝলাম দুটো জলস্রোত একটা বাঁধের দুদিকে দাঁড়িয়ে। মিলনের ব্যগ্র প্রতীক্ষা—তবু গ্রহ গ্রহান্তরের ব্যবধান। দৃষ্টির আলোর পরশে দুটো হৃদপিণ্ড অস্থির। মধ্যাবিকর্ষণে সেপারেটেড্। যেন হিলিয়াম গ্যাস ভরা দুটো বেলুন। আমি চেষ্টা করলাম কথার ছুড়ি দিয়ে সে ব্যবধান ঘোচাতে। বললাম, ফড়িংদা আর শ্যামল নাকি একই গ্রামের ছেলে ?

ফড়িংদা অর্থাৎ রমণীবাবু মৃদু হেসে বললেন, সে অনেক দিনের কথা—তা কি ডাঃ সেনের মনে আছে ?—অভিমান উপচে পড়ল তার কথায়।

শ্যামল চেয়ার থেকে উঠে রমণীবাবুর পেছনে দাঁড়িয়ে তার ঘাড়টা জড়িয়ে ধরে বলল, আমি জানতাম না দাদা—আমায় মাপ কর—ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের ঝড় ঝড় ভেঙে পড়া জলধারা নামল দুজনার চোখ থেকে।

ওই জলেই মানুষের আদিজন্ম—ওই জলের মধ্যেই তার দুর্বলতার শেষ। তাই সুখে দুখে রাগে অনুরাগে, মানে অভিমানে যে জলটুকু ব্যাগে পুরে

মানুষ নিয়ে এসেছে ইভলুসনের ইতিহাসে—তাই ঝড়ে পড়ে। ছোট্ট, দুটো ল্যাক্রিম্যাল গ্ল্যান্ড ও দুটো ডাক্ট—তাতেই জীবনের স্রোত বইছে মানুষের।

উচ্ছ্বাসের স্রোতে বাধ দেবার সংযম দুজনারই আছে। অল্প বর্ষায় যেমন প্লাবন আসে পাহাড়িয়া গ্রামে—তেমনই অল্প সময় পরেই শুকিয়ে যায় জলধারা। পুরুষের আত্মপরিচয়ে ওই কয়েক ফোঁটা জলও শক্তি হীনতার পরাজয় বার্তা বহন করে। রক্ত এক জল আর এক। ফাটাফাটি করে লাল রং বার করলে হারলেও তা পুরুষ্যত্ব। তাই এক ঝলক বারিবৃষ্টি বারিক্ষণের পর দুজনেই হেসে আবার বসল।

রমণী মোহন বললেন, আমি তো কিছুতেই রাগ করিনি—হয়ত একটু অভিমান হয়েছিল—তা এখন মুছে গেল। আর মহুয়াকে নামকোআস্তে বিয়ে করলেও ওয়াইফ বা স্ত্রী সে আমার কোনো দিনও হয়নি। ভুল বোঝাবুঝি ভুল করাকরি তো সমাজে থাকবেই। হয়ত একটু অপমান বোধ হয়েছিল—তাও বিলেতের বাতাসে উড়িয়ে দিলাম। তোমরা সুখে ঘর কর তাই কামনা। চোখদুটো আরক্তিম ছলছলে হয়ে উঠেছিল রমণীবাবুর। ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন, তোকে ভালবাসে জানলে পাঁচ ছ বছর আগেই প্লেনে করে দিয়ে যেতাম। তা তো আর জানতাম না। বলেও নি—

মহুয়া বাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। স্বভাব হাসিটা জোর করে টেনে আনল। স্বাস্থ্য এখনও খারাপ। ওষুধ খেয়ে ঝিমু ঝিমু। যেন সবে কোন বড় রোগ থেকে উঠেছে। তবুও একরাস সোনা।

শ্যামল চেঁচিয়ে বলল, শুনছ—তোমার সব মাপ করে দিয়েছেন রমণীদা।

কঠিন অভিমান মাখা কন্ঠে মহুয়া বলল, দোষ তো আমি কিছু করিনি—মাপও চাইনি আমি। বরং ওনারই ভুলগুলোর জন্য মাপ চাওয়া উচিৎ। উনিই আমার সঙ্গে পরিহাসের অভিনয় করেছেন। সে থাক—

—আমি তোমায় চিনতাম না মহুয়া তাই হয়ত ভুল করেছি। চাও তো মাপ আমিই চাইছি। আমি চেয়েছিও তোমার কাছে। ভাল ব্যবহার করাটা অভিনয় নয়। কোনোদিন খারাপ ব্যবহার তো আমি করিনি। নরম সুরে বললেন রমণীবাবু।

—সেটাও দোষ। খারাপ ভাবলে তেমনই ব্যবহার করতে হয়। তবেই মানুষ তার দোষ বুঝতে পারে। চুপ করে দূরে সরে থাকাটাও অন্যায় করা। যার শাসন করা শিক্ষা দেয়া ভুল ধরিয়ে দেয়া কর্ত্তব্য সে তা না করলেও কর্ত্তব্যে অবহেলা করা হয়। তার দোষীর চেয়ে কম নয়। আমি দোষ অন্যায় হয়ত করে গেছি—আর দুনিয়ার জনতা তাকে বাহবা দিয়েছে—নয় মাথা নত করে হজম করেছে—ঝাঁঝাল গলায় বলল মহুয়া। ওর কাছে এতটা কঠিন জবাব আমি আশা করিনি। মিষ্টত্ব ছাড়া ওর কণ্ঠে গড়লের প্রকাশ দেখে বিস্মিত হলাম।

—হ্যাঁ আমার দোষ হয়ে গেছে। আমি পৃথিবীটা অন্য দৃষ্টিতে দেখতাম। সবারই দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। আমার জীবনে তোমাকে পাওয়া ছিল চাঁদ হাতে পাওয়া। আর আমার কলুষিত দৃষ্টিতে সে চাঁদ রুপোর থালার মত ঝকঝকে। হঠাৎ সেখানে একথাবা ছাই দেখে শিশুর মতোই আৎকে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম। ভাবিনি ওটা ছাই নয়—চাঁদকে শক্ত করার কালো লোহা। কিন্তু তা বলে অবমাননাও করিনি। শ্রদ্ধা দিয়ে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেই রেখেছিলাম। হয়ত মনে আশা ছিল—যদিও ক্ষীণ-যে সে দেবী হয়ত মুখতুলে তাকাবে। সে সব কথা বরং থাক। আমাদের এবার উঠতে হবে। সময় খুব কম। কলকাতা এলে বরং কথা হবে। ছেলেটাকে একবার দেখে যাই—। তারপরই রমণীবাবু উঠলেন। তার স্বাভাবিক গলায় হাঁক দিলেন, শ্যামল—তোমার ছেলেকে খুব যত্নে রেখেছি। মনের অলক্ষে হয়ত ভালোও বেসেছি। এবার গিয়ে বাড়িটা খুব ফাঁকা লাগবে। আংকেল বড় হলে বল এই দুষ্ট মানুষটার হাতেও সে দুধের বোতল খেয়েছে। তবে ভালমন্দে মিশে বড় হলেই ভাল—একটানা সোনা হলে অলংকার হয় না—ভেঙ্গে যায়। আঙ্কেলের খাঁদে দেখছে ও খুব শক্ত পোক্ত হবে—ব্যথাজড়ানো কথাগুলোতে সেন্টিমেন্টের অভাব ছিল না। প্রত্যেকের চোখই বাষ্পাচ্ছন্ন। শ্যামল চোখের ইশারায় চুপ থাকতে বলল মহুয়াকে। মহুয়া দুটো কাব্যেভরা ভাসাভাসা চোখমেলে চেয়ে রইল।

সুলেখাকে পাশের ঘরে ইশারায় ডেকে নিয়ে গেল শ্যামল। মিনিট দুয়েক

পরেই বাচ্চাটার ঘরে সবাই জমা হল। হাসি ঠাট্টা রগর কৌতুক করল সবাই। বাচ্চাটা রমণী মোহন ও সুলেখাকে দেখে আনন্দে হাত পা ছুড়েই আবার কাঁদতে শুরু করল। বোধহয় কোলে উঠবে। সুলেখা কোলে তুলতেই চুপ করে গেল। রমণী বাবু আদর করলেন খুব। কার মত চোখ—কার মত নাক ইত্যাদি। রমণী মোহন রসিকতা করে বলল, হিন্দু মতে যার ঔরসেই সন্তান হোক না কেন—পদবীটা বাবারই হয়। যেমন পঞ্চ পাণ্ডবের। শ্যামলের কানে কানে বলল, ডিভোর্সের ব্যাপারটা পাকাকরে নিও—

শ্যামল শুধু মাথা নাড়ল। তার পর বলল, তুমি একটা বিয়ে করে নিও—এসব অভিমান বুকে চেপে থেকনা—

—আমি চাইলেই কী হয়—হয় না। এ বয়সের দোয়াজ বরে চট করে মেয়ে দিতে চায় না। পাড়ার ছেলেরাও জানলে পেটাবে। ব্যাটা বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে। সে যুগ নেই যে দুটো রাজলক্ষ্মীও পেলাম আবার দুটো ছাগলও পেলাম। এখন ছাগল জুটলেও বাঈজী জুটবে না—শেষ সময়ের রসিকতায় সবাই উৎফুল্লই হল। গুমোট ভাবটা কেটে গিয়ে ফ্রেশ হল ওয়েদারটা। কিন্তু মহুয়া কি খণ্ড সিঁদুরে মেঘ হয়ে আটকে রইল চৈত্রের বিকেলে।

আমরা অনেক দ্বিধাজড়িত ভাবেই বেরিয়ে এলাম। তখন বিকেল নেমেছে। বুঝলাম শ্যামলকে বিরাট খোলা মাঠের মধ্যে কালবৈশাখীর তুফান হাতে ধরিয়ে দিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। এর পর যে কী হবে জানিনা। তবে ঝড়ে ভেঙ্গে গিয়েও যদি শান্ত হয় এক সময় তা ভালো। নয়ত উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আতংক ও ব্যথার বিভীষিকা নিয়েই ওদের জীবন কাটত। এখন হয়ত অনেক সহজ হয়ে উঠবে ওদের মন। সে অস্থির অস্বস্তি আর থাকবে না।

শ্যামল বার বার বলেছিল ওর বাড়িতে দুএকদিন থাকতে। চুপিচুপি ডেকে ওকে বুঝিয়েছি—অনেক কষ্টে ধরে এনেছি—এটাই যথেষ্ট। সম্পর্কটা সহজ হলে পরে আত্মীয়তার সাঁকো বাঁধতে অসুবিধা হবে না। শ্যামল আমার সামনে বেশ কিছুক্ষণ অঝোরে চোখের জল ফেলেছিল। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি—সহজ হবার চেষ্টা কর।